

CUK-401948-78-29407

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা



ত্রৈমা সিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ়

১০৮০

78

পত্রিকাধিকার

শ্রীগৌরানন্দগোপাল সেনগুপ্ত



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড

কলিকাতা-৬

“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সূচনাকালে তাকে দেখিয়াছি। তখন নব-নিঃসৃত নিৰ্ব্বের মত সে ছিল ক্ষীণ ধাবা, বনস্পতির প্রসাদ ছায়ায় তাহার প্রবাহ বহিত। অবশেষে একদা পূর্ণতা লাভ করিয়া নিজের ঐশ্বর্যে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাকে দেখিলাম। কিন্তু সেদিনও মনেব মধ্যে আশঙ্কা ছিল। কেন না, বাংলা দেশের পলিমাটিতে যেমন কোন কীর্তি-মন্দির স্থায়ী হয় না, তেমনি মিলনী শক্তির অভাবে আমাদের দেশে কোন জন-সংসদ পাকা হইয়া টিকিতে পারে না, রক্তে রক্তে দল বিবোধেব দুর্ব্বার বীজ তাহার ভিত্তিতে ভিত্তিতে গ্রন্থি বিদাবণকারী বিনাশকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত কবিতো থাকে। বোধ করি একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগ্যেই একপ দুর্ঘোগ ঘটে নাই। এ পর্যন্ত ষাঁহার তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শক্তিশালী পুরুষ। তথাপি তাঁহাদের নিজের শক্তিই ইহাকে সন্ধিভেদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। বস্তুত বাঙ্গালী চিত্ত ইহাকে গভীবভাবে রক্ষা করিয়াছে। সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্য সম্পদ, সাহিত্যে বাঙ্গালী আপন গৌরব উপলব্ধি করে। বাংলা-দেশে সাহিত্য পবিসং আপন স্বাভাবিক আশ্রয় পাইয়াছে। তাই আজ আটত্রিশ বৎসর কালের অভ্যর্থনার দ্বারা জয়যুক্ত এই পরিষৎকে নিঃসংশয়িত কণ্ঠে অভিনন্দিত করিবার দিন আজ আসিল। এই দিন পূর্ণতব প্রাণশক্তি বহন করিয়া বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্তন ককক—এই কামনা করি।”

—রবীন্দ্রনাথ

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঊনচত্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেরিত কবিশুঙ্কর বাণী হইতে উদ্ধৃত]

CUL-H01948-78-294079

22/10/79

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

কর্তৃক ৮০ ৭১৮.১
নং ১-৪ ০২৮৮
২৮: - ২৮:
২৬৮০



রৈ মা সি ক

৮৮৫

অশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ়
১০৮০

78

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীগৌরাসংগোপাল সেনগুপ্ত



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ অব্দের ২১ জুলাই) কলিকাতায় ২১২ নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে ‘বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার’ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমুখ জাতীয়-সাহিত্য-অনুবাগী কতিপয় সভ্য ‘একাডেমি অব্ লিটারেচার’ নামে আপত্তি করায় এবং “বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার নাম করা আবশ্যক” ও “অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে হয়” মনে করায় ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে ‘বেঙ্গল একাডেমি লিটারেচার’ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ নামে অভিহিত হয়।

১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট) মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঁচজন অ্যাসরক্ষক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকূলে রে. দলিল সম্পাদন করিয়া পরিষদমন্দির নির্মাণের জগু ভূমিদান করেন। বঙ্গসাহিত্যানুধনী-দরিদ্রের দানে পরিষদমন্দির নির্মিত হয় এবং ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ গৃহ-প্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহপ্রবেশ-উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ তাহার ভাষণে সাহিত্য-পরিষদের “অভ্যুদয় বাঙ্গলাদেশে পুণ্যফল” বলিয়া গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

“ইহা ভোজবাজির খেলাব মত অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালি ব্রহ্মাঙ্গীন ট. জোরে একরাতে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হ্রৎসঙ্কটবিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হই- তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদ শারীরিক আবির্ভাব ঘটয়াছে।

বাঙালী ইহাকে পোষণ কবিবে, বক্ষা কবিবে, ইহাব অভাব দূর করিয়া নিঃ অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আ- করিতে আসিয়াছি।

তবুও মন হইতে ভয় দূর হয় না। কাবণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহারা স্বভাব হইতে লুপ্ত হয়। ভাগ্যে যাহাব দুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাম্পদকেও অন্নদান কবি বিমুখ হয়।

বাংলাদেশে ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবত- হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,—এমনি করিয়া অনেক নর- আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল অপমার্- অমঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জন্ম হইয়া উঠিয়াছে—তাহাবাই আমাদের উন্নতিপথেব একটি বড় বড় বাধা বচনা করিয়া রহিয়াছে। বাঙলাদেশের ক্রোড়ে যে কল্যাণের কম- শৈশব সাহিত্য-পরিষৎ-কপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্র- হউক, আনন্দেব আনুকূল্য প্রসারিত হউক—বিধাতাপুরুষ এই সভাস্থলে উপস্থিত থা-

তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্যলিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গোবব, বাঙালীর কীর্ত্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক। অস্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ কবিতেছি।”

১) বাঙলাব মহাপুরুষদেব স্পর্শপূত এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাভাবে সংস্কার করা হয় নাই। দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্র চিত্র সংরক্ষণেব জন্ত উপযুক্ত স্থানেব ও উপকরণেব ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। সর্বশ্রেণীর বাঙালীব সহায়তাব দ্বাবাই এ কার্য সম্ভব হইতে পাবে। ১৩৭২ বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কার্যে সহায়তার জন্ত বাঙলার ছাত্রসমাজেব নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েব জাতীয় শ্রম প্রকল্পেব কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্যে ছাত্রস্বৈচ্ছা-সেবকগণের সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব জাতীয় শ্রম প্রকল্পের ণ্ডকদাস কলেজ ইউনিটেব ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ সংস্কারেব কার্যে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে শ্রমদান কবেন।

২) পরিষদভবন ও রমেশভবনের ভিতবেব সমস্ত কক্ষ এবং বাহিরেব সমস্ত অংশ সংস্কার কবিয়া চুনকাম ও রং করিয়া দিবার ভার ছাত্রছাত্রীবৃন্দেব স্বৈচ্ছায় গ্রহণ কবিয়াছেন। গৃহ-সংস্কারেব উপকরণাদি ক্রয়েব জন্ত এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বহন কবিবার জন্ত পরিষদের সুহৃদ ও সভ্যগণ স্বৈচ্ছায় কিছু কিছু অর্থদান কবিয়াছেন, সেই সাহায্য হইতে পরিষদমন্দিরের সংস্কার কার্য করা হইতেছে। সমগ্র পরিষদমন্দিরের সংস্কার, জীর্ণ ও বিবর্ণ চিত্রগুলিব নবরূপায়ণ, দুই লক্ষাধিক গ্রন্থ ও পত্রিকা সংরক্ষণেব উপযুক্ত ব্যবস্থা করাব জন্ত বহু উপকরণ সামগ্রী আসবাব এবং অর্থ প্রয়োজন। সভাকক্ষ ও পাঠকক্ষের জন্ত বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার প্রয়োজন, দুর্লভ পুস্তক বাখার জন্ত স্টীল ব্যাক ও আলমাবি প্রয়োজন।

৩) বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাতেব নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব কার্য-নির্বাহকসমিতিব পক্ষ হইতে আমাদেব বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা সাধ্যমত উপকরণ সামগ্রী শ্রম ও অর্থদান কবিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরেব সংস্কারকার্যে সহায়তা ককন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর জাতীয় সম্পত্তি, পূর্বপুরুষগণেব এই রিক্ত রক্ষা কবিবার দায়িত্ব বাঙালীমাতেবই। বাঙালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ দানে ইহা প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে, বাঙালীব ক্ষুদ্র বৃহৎ দানেই ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

৪) পরিষদ-মন্দির সংস্কার ও সংরক্ষণেব জন্ত প্রদত্ত সকল সামগ্রী উপকরণ শ্রম ও অর্থ শ্রদ্ধাব সহিত গৃহীত হইবে। ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩৮০।

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীমদনমোহন কুমার

সভাপতি

সহকারী সভাপতি

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বর্ষ ৮০ ॥ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ—আষাঢ়

১৩৮০

সূচীপত্র

ষট্-ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিব অভিভাষণ—ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১
ষট্-ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—	
রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব	১২
আমাদের প্রভাতকুমার—‘বনফুল’	১৫
প্রভাতকুমার ও ববীন্দ্রনাথ—ডঃ শ্রীবিজ্ঞনবিহারী ভট্টাচার্য	১৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫
বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে—ডঃ শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও	
শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	২৮
ববীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল—ডঃ শ্রীসুকুমার সেন	৩৩
আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলেখ-যুক্ত শৈব মূর্তি—ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	৪০
পরিষৎ সংবাদ	৪৩

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

রৈ মা সি ক



অশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন

১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীগৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড,

কলিকাতা—৬

॥পরিষদ্ বাঙ্গলা অভিধান ॥

আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাব মনীষীবা “বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যেব অনুশীলন ও উন্নতি সাধনে”-র উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তাঁহাদেব নির্দেশিত সাতটি উপায়ের প্রথম উপায়টি ছিল “বাঙ্গলা ভাষাব ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন।” পরিষদ্ প্রতিষ্ঠাব সময় হইতেই পরিষদেব কয়েকজন সদস্য এই কার্যে ত্রুতী হইয়াছিলেন। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী বামেন্দ্র-সুন্দব ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র বায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদাব প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙলা ভাষাব ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সঙ্কলনেব বহু উপকরণ সাহিত্য পদ্বিষং পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি পনের বৎসব অক্লান্ত পবিশ্রম কবিয়া বাঙলা ভাষাব ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন কবেন। ৬০ বৎসব পূর্বে ১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাহা দুই খণ্ডে প্রকাশ কবিয়াছিলেন। বর্তমানে সেই অভিধান দুপ্রাপ্য। গত ৬০ বৎসরে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেব বিচিত্র বিকাশেব ফলে বাঙলা ভাষাব একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গক অভিধান সংকলন আবশ্যক হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষাব সহস্রবর্ষ ব্যাপী বিকাশে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলায় যে-সমস্ত শব্দ বাঙলা সাহিত্যে—সাধু ও চলিত ভাষায় এবং মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষায় ছিল বা আছে সেগুলিব একখানি বিবাত পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গক ভাষা বিজ্ঞানসম্মত অভিধান বা মহা-কোষ সঙ্কলনেব সঙ্কল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৮ শ্রাবণ ১৩৮০) গ্রহণ কবা হইয়াছে। এই অভিধানে বিগত সহস্র বৎসরে বাঙলা ভাষায় যত শব্দ সাহিত্যেব ভাষায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলেব মুখেব ভাষায় ও প্রত্যন্ত প্রদেশেব ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলিব ব্যাকরণগত পরিচয় ও বিভিন্ন অর্থাদি ছাড়াও যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিকৃতি ও কালানুক্রমিক সাহিত্যিক, মৌখিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হইবে। সুবহু Oxford English Dictionary ব ন্যায় এই অভিধান বাঙলা ভাষাব প্রামাণ্য অভিধান হইবে। Oxford English Dictionary প্রস্তুতে ইংবেজ জাতিব সমস্ত পণ্ডিত সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্ঠায় ইংরেজী ভাষায় প্রামাণ্য অভিধান প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গভাষাব সমস্ত সেবককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই দুব্বহু শ্রমসাধ্য ব্যয়বহুল কাজে আহ্বান কবিতেছেন। বিপুল অর্থব্যয়ে কাশী নাগবী প্রচারিণী সভা ‘হিন্দী শব্দমাগব’ নামে যে বিরাট কোষগ্রন্থ প্রস্তুত ও পুনঃ প্রকাশ কবিতেছেন তদ্রূপ একখানি বিরাট পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভাষাব অভিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ অর্থবল, লোকবল ও সবকারী দাক্ষিণ্যের অভাবে এযাবৎ প্রস্তুত ও প্রকাশ কবিতে পাবেন নাই। বাঙ্গলাভাষাব লেখক, পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র সমাজেব সমবেত চেষ্ঠায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই কার্য সম্পূর্ণ কবিতো পাষিবেন বলিয়া আমবা বিশ্বাস কবি। আমাদেব পূর্বপুরুষগণ ৮০ বৎসব পূর্বে যে সঙ্কল্প গ্রহণ কবিয়া ছিলেন এবং আংশিকভাবে পূর্ণ কবিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ কবার দায়িত্ব আমাদেব গ্রহণ কবিতো হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই কার্য সম্পূর্ণ কবাব সঙ্কল গ্রহণ কবিয়া এই অভিধান সঙ্কলনের তত্ত্বাবধানের ভাব জাতীয় আচার্য শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীমুকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের উপর দিয়াছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে অভিধান সঙ্কলনের কার্য আরম্ভ কবিয়াছেন।

এই কার্য সম্পূর্ণ কবাব জন্ত বহু সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ, বৃত্তিভোগী ও অবৈতনিক, গবেষক ও কর্মীব প্রয়োজন হইবে। মুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী কয়েকজন ব্যক্তির অনুগ্রহে অভিধান প্রস্তুতের জন্ত চাবিজন বৃত্তিভোগী গবেষককে অভিধান সঙ্কলনের কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অনুরাগী বহু ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে সহায়তা ও স্বেচ্ছাশ্রমদানের প্রস্তাব কবিয়া পরিষদে পত্রপ্রেষণ কবিয়াছেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ও বঙ্গভাষানুবাগী ব্যক্তি সহায়তা কবিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলের সাহায্য সাদবে গ্রহণ করা হইবে।

পরিষদ অর্থ সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা কবিতেছেন, অর্থ সংগৃহীত হইলে বৃত্তিব সংখ্যা বাতান হইবে। অভিধান প্রস্তুতের ও প্রকাশের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবা হইবে।

অভিধান সঙ্কলনের কার্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বক্ষিত ৬ হাজার প্রাচীন পুথি এবং গত দুই শত বৎসবে বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদি হইতে শব্দসংগ্রহ ও প্রয়োগেব নিদর্শন উদ্ধার কবিয়া ব্যবহার কবা হইবে। পোতুগীজ পাদ্রি মানোএল-দা-আসুম্পসাঁওর বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ (১৭৪৩) হইতে আবত্ত করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন কোষগ্রন্থে ধৃত শব্দাবলীর সাহায্যও গ্রহণ কবা হইবে। বঙ্গভাষাভাষী যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ ও প্রত্যন্ত প্রদেশের শব্দ ও প্রয়োগেব নিদর্শন সংগ্রহ কবিয়া পাঠাইবেন সেগুলিও এই অভিধান-প্রণয়নের কার্যে ব্যবহার কবা হইবে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙলা ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট শব্দ ও প্রয়োগেব নিদর্শন সংগ্রহের ভাব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর দেওয়া হইবে। বঙ্গভাষা-অনুবাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণের প্রস্তাব কবিলে তাঁহাদের উপর যথা প্রয়োজন দায়িত্ব দেওয়া হইবে।

পবিষদের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত হইলেও অর্থাভাবে পবিষদের কোন মহৎ কার্য কখনও বন্ধ হয় নাই। পবিষদ বঙ্গভাষী জনগণের সমবেত চেষ্টা ও সহায়তার উপর নির্ভর কবিয়া এই দুকহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কার্যে সর্বসাধারণের সহায়তা প্রার্থনা কবিতেছেন।

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বর্ষ ৮০ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—আশ্বিন

১৩৮০

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে—ডঃ শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদায়	৪৯
বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা—ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
ভাবভীষ্ম প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কার শিল্পে ভূমিকা—শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য	৭৭
পরিষৎ সংবাদ	৮৯

ক্রোড়পত্র

উনাশীতিতম বার্ষিক কার্য-বিবরণ	১—১২
একাদশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে	
সভাপতির অভিভাষণ	১—১৮
১৩৭৯ বঙ্গাব্দে পরীক্ষিত উদ্বর্তপত্র	

মূল্য : প্রতিসংখ্যা—২.০০ টাকা



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ—চৈত্র

১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

মূল্য তিন টাকা মাত্র ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

॥ ত্রৈমাসিক ॥

বর্ষ ৮০ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ মাঘ—চৈত্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১
ইন্দিরা দেবী স্মরণে—শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী	৪
মানুষ মধুসূদন—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)	১২
কবি মধুসূদন—শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭
ভাবতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা—শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য	২৪
গোবিন্দচন্দ্র দাস—শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২
গোবিন্দচন্দ্র দাস—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৪১
পরিষৎ সংবাদ	৪৫

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

চর্যাপদ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; চণ্ডীদাস-সমস্যা ; বৈষ্ণব পদাবলী ; শাক্ত-পদাবলী ;
রোমান্টিসিজম ; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ; বাঙলা গল্পের
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ; বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল
মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র, বিহাবীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল,
শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥

ডবল ডিমাई ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭২ ।

মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা । বোর্ড বাঁধাই ॥

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ
১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪০/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৮০ আচার্য্য জগদীশ বসু বোড, কলিকাতা-১৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

॥ ত্রৈমাসিক ॥

বর্ষ ৮০ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ কার্তিক—পৌষ, ১৩৮০

সূচীপত্র

শুভ সংবাদ

(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ হইতে অপহৃত খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকেব বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার)—শ্রীমদনমোহন কুমার	৩
বমাংপ্রসাদ চন্দ—শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার	৯
বাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ই মাঘ ১৩৮০ পঠিত)—শ্রীসুকুমার সেন	১৭
প্রত্নতত্ত্ববিদ বমাংপ্রসাদ চন্দ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	২৩
প্রত্নতাত্ত্বিক বমাংপ্রসাদ চন্দ—শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	৩৩
ভাবতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কারশিল্পের ভূমিকা—শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য	৩৭

স্মারক গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিবস্ববর্ণীয় মনীষী ও লেখকদের নির্বাচিত ছুপ্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন ।

বাঙ্গালার “ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া পবিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির পবিচয় কোঁতুহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥
মূল্য পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র বেজিস্ট্রেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্‌ এবং ৮ ধারা অনুযায়ী
‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল :—

১। প্রকাশ-স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬

২। প্রকাশ-কাল—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রাকর—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বায়, ভারতীয় নাগরিক।

শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৮০, আচার্য্য জগদীশ বসু বোড, কলিকাতা-১৪

৪। প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার, ভারতীয় নাগরিক।

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদক—শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় নাগরিক।

পত্রিকাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২৪৩।১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬

৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের বা এক শতাংশের অধিক মূলধনের মালিক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬

আমি, শ্রীমদনমোহন কুমার, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরি উক্ত তথ্যগুলি
আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য।

শ্রীমদনমোহন কুমার

তারিখ ১৪ই শ্রাবণ ১৩৮১

প্রকাশক,

৩১শে জুলাই ১৯৭৪।

সম্পাদক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

পরিষদ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ

বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডাদাসের পদাবলী, বামমোহন-গ্রন্থাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী,
বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ভাবতচন্দ্র-
গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী, বামেন্দ্রসুন্দর-বচনাবলী, বামেশ্বর-বচনাবলী,
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচনাবলী, শবৎকুমারী
চৌধুরাণী বচনাবলী

প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে বঞ্জনীয় ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৮০, সংখ্যা—১

বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৮০

ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(ঝাড়গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর, চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৭৯, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৩)

এবারকার বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলন পশ্চিম-বঙ্গলার পশ্চিম সীমানার প্রত্যন্ত অঞ্চল এই ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গলার সাংস্কৃতিক গঠনে এবং ইহার সাম্প্রতিক পরিপোষণে এই অঞ্চলের লক্ষণীয় দান আছে। পশ্চিম-রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম-মেদিনীপুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহভূম, পশ্চিম-বাঁকুড়ার সংলগ্ন বারভূম ও মানভূম, এবং উত্তর-বাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহাব-প্রদেশের সাঁওতাল-পরগণা ও হাজারীবাগের পূর্ব অংশ—এই-সমস্ত অঞ্চল, রাঢ়খণ্ডেরই অধীন—ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ-বঙ্গেরই অংশ। বৃহৎ-বঙ্গের অংশ হইলেও, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার পশ্চিমেই বিহাব-প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট-নাগপুর—চাঁইবাসা, কোল্‌হান, বাঁচি, হাজারীবাগ ও পালামৌ জেলা, এবং মধ্য-প্রদেশের সবগুজা জেলা—এইগুলি লইয়া “ঝাড়খণ্ড” অঞ্চল—বঙ্গালা দেশের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ়ভূমির এবং “সুন্দ” বা “সুবভ” অর্থাৎ দক্ষিণ-বাঢ়ভূমির “সামন্ত” বা সীমান্ত অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চল—সেখানকার মুখ্য আদিবাসীরা বঙ্গালীর কাছে “সামন্ত-পাল,” “সামন্তবাল” বা “সাঁওতাল” (অথবা “সাঁওতাল”) নামে পরিচিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, অসুর, বীর-হড, জুআঙ প্রভৃতি কোল-জাতীয় আদিবাসী, তথা দ্রাবিড-গোষ্ঠীর কুড়ুং বা ওরাওঁ এবং মালৈব বা মাল-পাহাড়ী আদিবাসী—ইহারা এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী—এই ঝাড়খণ্ড ইহাদের নিজেদের দেশ। আর্য-ভাষী মগহিয়া, মৈথিল ভোজপুরী, বঙ্গালী এবং ছত্তিসগড়ীদের চাপে পড়িয়া ইহারা এখন নিজেদের মাতৃভূমিতেই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, এই দেশের প্রতি তাহাদের জাতি-বা বংশ-গত দাবীর সঙ্কল্পে সচেতন হইয়া, তাহারা এখন ভাবত-রাষ্ট্রের মধ্যে “ঝাড়খণ্ড” নামে একটি স্বতন্ত্র ও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে পরিচালিত নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—যদিও নানা দিক্ হইতে তাহার পথে অনুপনয় বাধা তাহা বা বৃদ্ধিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, সে অন্য কথা।

কোল ও দ্রাবিড (দ্রমিড) জাতিদের দ্বারা আধুষিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চল হইতে আগত রাঢ়-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট সাঁওতাল প্রভৃতি কোল-জাতির মানুষের প্রভাবে পড়িয়া, পশ্চিম-বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া, এবং পশ্চিম-বর্ধমান ও পশ্চিম-মেদিনীপুর—ঝাড়গ্রাম ও

ধলভূম—ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, ভাষায় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের এক অখণ্ড অংশ হইয়াও, কতকগুলি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, একটা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালীর জীবনচর্যা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, কোল ও দ্রাবিড় জাতির এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিরাত জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু-কিছু উপাদান আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে আর্য্য-পূর্ব যুগের এই অনার্য্য-ভাষী দ্রমিড়, নিষাদ (বা কোল) এবং কিরাত (বা মোঙ্গোল) শ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে লব্ধ উপাদান যাহা পাওয়া যায়, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞগণ তাহার অল্প-স্বল্প অনুসন্ধান ও আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। বাঙ্গলা দেশে আর্য্য-ভাষীভ্রাম্ভণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজের উদ্ভবের পূর্বে, সমগ্র বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে দ্রমিড়, নিষাদ ও কিরাত জাতির যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার পরে সাম্প্রতিক কালেও আবার এই-সমস্ত জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গলা-দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির, ভাষাব, রীতি-নীতির মধ্যে যে অল্প-স্বল্প পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহা পশ্চিম-মেদিনীপুর্বের মত সাঁওতাল-অধ্যুষিত স্থানেও পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলের সাঁওতালগণ অবশ্য সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ নহে, কিন্তু সংখ্যায় নগণ্যও নহে। বিগত দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া স্থানীয় সাঁওতালগণকে আর “আদিবাসী” পর্যায়েব নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলিয়া অবহেলা করিতে পারা যায় না। গ্রামীণ জীবনে, আদিবাসী সাঁওতাল কৃষিজীবী এবং সাধারণ হিন্দু কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কবিবার কিছু নাই; উভয়েরই জীবনের মান এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা একই হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেবল সাঁওতালগণ অনেকটা বঙ্গভাষী হইয়া গেলেও নিজেদের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা এখনও ভুলে নাই—মাতৃভাষার চর্চা করিতে বিশেষ ব্যগ্র। কিছুটা বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রভাবে পড়িয়াও, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে বাহ্যতঃ অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেও, নিজেদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি সম্বন্ধে, ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এবং নাচ প্রভৃতি ব্যাপারেও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, সাঁওতাল জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে এখনও বিশেষভাবে সচেতন রহিয়াছে, সাঁওতালী সমাজ-জীবনকে সানন্দ আগ্রহের সহিত এখনও তাহারা ধরিয়া আছে। যে-সকল সাঁওতাল ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, ইউরোপীয় মিশনারিদের অনুগ্রহে তাহারা যে-সব সুবিধা সুযোগ পাইয়া শিক্ষায় ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, অ-খ্রীষ্টান সাঁওতালগণ সংহতি-শক্তির অভাবে এবং প্রবল শিক্ষিত জনের নেতৃত্বের অভাবে তাহা হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত। তথাপি সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্যাদায় এখন গৌরববোধের সহিত প্রতিষ্ঠিত এই-সকল সাঁওতাল—ইহাদের মধ্যে নামতঃ খ্রীষ্টানও অনেক আছেন—উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন, বৃত্তি-বিষয়ে সরকারের আনুকূল্য লাভ করিতেছেন, এবং সরকারী চাকুরীতে—বিশেষতঃ কতকগুলি পেশায় (যথা ফোজী পুলিশে ও সেনাবাহিনীতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সহৃদয় সাঁওতাল, শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কায়ম

থাকিয়া সাঁওতালী ভাষার সাহিত্যিক পরিবর্তনে সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং মুখ্যতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যেব দৃষ্টান্তে, গল্প কবিতা ও নিবন্ধাত্মক এক আধুনিক সাঁওতাল সাহিত্য সৃজন করিতেছেন। সাঁওতাল চিন্তের যে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাঁওতালী গীতিকবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—সাঁওতাল পবম্পবাগত সাঁওতাল জীবন-চর্য্যার যে-সব মনোহর চিত্র রবীন্দ্রনাথের মত দবদী কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন সাঁওতালী শৈলীর এক নবীন যুগোপযোগী প্রকাশ, নূতন ভাবে এই-সব সাঁওতালী কবিতায় দেখা যাইতেছে। এই অভিনব সাঁওতালী সাহিত্যেব বিকাশ, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে—এবং প্রায় পাঁচ লাখ সাঁওতালী-ভাষী মানবের দ্বারা সৃষ্ট নূতন যুগের এই সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যেব সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠিতেছে, সেই সাহিত্যের অন্যতম সর্জন-কেন্দ্র হইতেছে এই পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল।

বাঙ্গলা লিপিতে মুদ্রিত এই আধুনিক সাঁওতালী সাহিত্য, সমগ্রভাবে ভাবতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলাব, এবং বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরেব একটি স্বকীয় দান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ঝাড়খণ্ডে সাঁওতাল-পবগণা জেলার হুমকার নিকটে বেনাগড়িয়া গ্রামে স্কাণ্ডিনেভীয় লুথারান খ্রীষ্টান মিশনাবিদেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচার-কেন্দ্রের ছাপাখানা হইতে, স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি A. Skrefsrud স্কেফ্‌স্‌রুড্‌, “হড্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ডাম্‌কো-বেআংক্‌ কাথা” অর্থাৎ “হড্‌ বা সাঁওতাল জাতিব পূর্ব-পুরুষদের ইতিকথা” এই নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রোমান্‌ লিপিতে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। এই বই হইতেই আধুনিক কালে সাঁওতালদের জাতীয় সাহিত্যের পত্তন আরম্ভ হইল বলা যায়। ‘কলেয়ান’ বা কল্যাণ-গুরু নামে একজন প্রাচীন সাঁওতাল জ্ঞানবৃদ্ধকে ডাকিয়া মিশনারি সাহেব তাঁহার মুখ হইতে সাঁওতালী পুবাণ-কথা এবং সামাজিক বীতি-নীতিব কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ কবিয়া লয়েন। বহুদিন ধবিয়া এই বই ইংরেজীতে বা অন্য কোনও ভাষায় অনূদিত হয় নাই, কিন্তু সাঁওতাল ভাষা শিখিয়া লইয়া অনেকে এই বই ব্যবহাব করিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল-ভাষাবিদ P. O. Bodding বডিং-এর করা ইংবেজী অনুবাদ Sten Konow স্টেন্‌ কনো সাহেবের সম্পাদনায় নরওয়ে-দেশের Oslo অস্লো নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাব পরে এই বই ভারত-সরকারের জনগণনার সচিব শ্রীঅশোক মিত্র আই-সী-এস্‌ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁস্‌দাংক্‌ নামে একজন শিক্ষিত সাঁওতাল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভাবতীয় সাহিত্যের এই মূল্যবান আকব-গ্রন্থ, কোল-জাতিব ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বেদ ও পুবাণ একাধারে যাহাকে বলা যায়, তাহার প্রকাশেব কৃতিত্ব উত্তর-ঝাড়খণ্ডের হুমকা অঞ্চলের কল্যাণ-গুরু এবং নবওয়ে হইতে আগত পাদ্রি A. Skrefsrud সাহেবেব। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশেব প্রায় সতেরো কিংবা আঠাবো বৎসব পবে, ধলভূম ও পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, বামদাস টুডু মাঝি নামে এক জ্ঞানী সাঁওতাল পণ্ডিত, নিজের আগ্রহে, অনুকপ আব একখানি পুস্তক সংগ্রহ ও রচনা কবিয়া কলিকাতায়

ছাপাইয়া প্রকাশ করেন, অনুমানিক ১৯০৪-কিংবা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—“খেরবালবাংসা ধারাম-পুথি” (অর্থাৎ “খেরওয়াল বা সাঁওতাল বংশের বা জাতির ধর্ম-পুস্তক”)। এই বইয়ের একখানি মাত্র মুদ্রিত পুস্তক ঘাটশিলায় ১৯৪৬ সালে আমি শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মু ও শ্রীযুক্ত ডোমনচন্দ্র হাঁসদাংক এই দুইজন সাঁওতাল ছাত্রের আনুকূল্যে দেখিতে পাই। ধলভূমের রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বাহাদুরের ম্যানেজার স্বর্গীয় বক্ষিমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রায়-অপ্রাপ্য বইয়ের একটি নূতন সংস্করণ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটশিলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমি একটি ভূমিকা লিখিয়া দেই। কিন্তু নানা কাবণে, বিশেষতঃ বক্ষিমবাবুর অতি শোচনীয় আকস্মিক অকাল-মৃত্যুব জন্ম, ঐ বইয়ের প্রচাব হয় নাই। অধুনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুহৃদ্ ভৌমিকেব আগ্রহে ও চেষ্টায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ, ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে এই ঝাড়গ্রাম হইতেই। রামদাস টুডু ধলভূম-রাজ্যের প্রজা ছিলেন, কাড়ুয়াকাটা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার এই ধর্ম-পুস্তক নিজের আঁকা ছবিতে পূর্ণ, এবং নানা বিষয়ে এই বই কল্যাণ-শুভকর পুস্তক অপেক্ষা পূর্ণতর, যদিও ইহাতে হিন্দু ধর্ম ও পুরাণ-কথাব প্রভাব আবও অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই নূতন সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইলে, আর্য্য-অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া রামদাস টুডু মাঝির এই অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব ঝাড়গ্রাম লাভ করিবে। রামদাস টুডুব দৃষ্টান্তে সাঁওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও রীতি এবং ধর্ম ও ধার্মিক অনুষ্ঠান লইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গভীর বিচার ও অনুভূতিশীল একজন বিশিষ্ট সাঁওতাল চিন্তানেতা, অদ্বৈত মিত্রবর শ্রীযুক্ত নায়েকে মঙ্গল চন্দ্র সবেন, ভূতপূর্ব এম-এল-এ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভা) সাঁওতাল ভাষায় কতকগুলি গান ও অগ্নি রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন—ইহার নিবাস-স্থান এই মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামেব নিকটবর্তী শিলদা ডাকঘরের অধীন আতোছুয়া পাহাড়ী গ্রাম হইতে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। ইহাব এই সাহিত্যিক কৃতি মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখন সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কতকগুলি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে—সাঁওতাল-পর্বগণায়, ধলভূমে, পশ্চিম-মেদিনীপুরে, হাওডায়, জুগলী জেলার খানাকুল ও রাধানগর অঞ্চলে, উত্তর-বঙ্গে এবং কলিকাতায়। সাঁওতালীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ ও অনুকরণ হইতেছে, ছোট গল্প ও নাটক বাহির হইতেছে, সাঁওতালী যাত্রা অভিনীত হইতেছে। ভাবতের অগ্রতম প্রাচীনতম ভাষা-গোষ্ঠীর একটি সংখ্যা-বহুল ভাষা নূতন করিয়া সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হইয়া, সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কৃতিব গোঁব বর্ধন করিয়া চলিবার পথ ধরিয়াছে—এ বিষয়ে মেদিনীপুরের অনুদান লক্ষণীয়।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে ভাষণ দিতে আসিয়া, আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া কিছু আলোচনা করিতে বসি, “ধান ভানিতে শিবেব গীত” বলিয়া মনে হইতে পাবে। এই অপ্রাসঙ্গিকতাব একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছি—ভাবতের সর্ব-ভাষাশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূলে ও বিকাশে উভয়েই এক, ইহাই প্রতিপাদনের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় কথা—বহুদিন ধবিয়া ভাগীরথী-তীরবর্তী মেদিনীপুরের পূর্ব অঞ্চল মাত্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এবং এক বাস্তব-বিদ্যা ভিন্ন অন্য শিল্পে, তেমন লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই। মেদিনীপুরের ভাগীরথী-তীর-সন্নিকটস্থ তমলুক নগর সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ব-ভাবতে একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পবিগণিত—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে পোতাযোগে গমনাগমনের জন্য এই তমলুক বন্দর, যাহার প্রাচীন নাম ছিল “তান্মলিপ্তি তান্মলিপ্ত, দামলিপ্ত” প্রভৃতি, সমগ্র ভাবতের পক্ষে অন্যতম প্রধান পূর্ব দ্বার স্বরূপ ছিল। ইহাব দক্ষিণ-পূর্বে হিজলী অঞ্চল, সাগবাস্ত্রিত দক্ষিণ-বাচের উপকূলে একটি প্রধান স্থান ছিল, এবং “কাঁথি” অর্থাৎ “কাঁথ” বা “কন্ডা” অর্থাৎ Rampart বা “দুর্গপ্রকাব” এই নামে যাহাব পূর্বতন প্রাধান্য এখনও সূচিত হইতেছে, সেই দক্ষিণ হইতে বাচ ও গোড়-বঙ্গদেশে প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বারা সুবক্ষিত প্রধান দ্বারপথ এই নগর, কর্ণগড় ও মেদিনীপুর প্রভৃতির অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে একটি মুখ্য নগর ছিল বলিয়া অনুমান হয়। মধ্য-বাচ ও উত্তর-বাচের তুলনায় দক্ষিণ-রাচ বা মেদিনীপুর অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশেষ অরণ্য-সঙ্কুল ছিল বলিয়াই মান হয়—“ঝাড-খণ্ড” অর্থাৎ বৃক্ষ বা অবগ্যানী আবৃত দেশের, ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জেব যেন এক পূর্বদিকের বিস্তার ছিল এই মেদিনীপুর। ওদিকে বাঁকুড়াব বিষুপুর্ব ও চন্দ্রকোণা এবং এদিকে ঘাটাল মহিষাদল ও তমলুকেব পথ ধরিয়া, এখনকার মেদিনীপুরের দক্ষিণে দাঁতন ও বালেশ্বর হইয়া, বালেশ্বর ভদ্রক ও কটকেব পথে পূর্বা ও আবও দক্ষিণে যাওয়া, ইহাই ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলের সঙ্গে বাহিরের জগতের মুখ্য সংযোগ-পথ। দেশ অরণ্যসঙ্কুল, দক্ষিণ হইতে উড়িষ্যা তেলুগু কানাড়ী ও তামিলজাতির মানুষের উত্তর-পূর্ব ভারতে গোড়-বঙ্গে যাতায়াতের প্রধান পথ—যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই এই-সমস্ত দক্ষিণেব মানুষের আগমন হইত। তবে তীর্থযাত্রা এবং অন্ন-রন্ধ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর দিয়া গোড়-বঙ্গ এবং কাশী ও গয়া অঞ্চল হইতে ও ঝাডখণ্ড হইতে লোকেব যাতায়াত হইত, এবং বঙ্গভাষী জাতির মধ্যে বিলীযমান আদিবাসী সঁওতাল প্রভৃতি যাহাবা আসিয়া এখানে বাস কবিত, বেশীভাণ তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত অবগ্যসঙ্কুল ও বিপংসঙ্কুল দেশ বলিয়া, ভাগীরথী-তীরের লোকেবা, মধ্য-ও উত্তর-বাচের শুদ্ধ বঙ্গভাষী লোকেবা, মধ্য-ও পশ্চিম-মেদিনীপুরে বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন, ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এখনকার মেদিনীপুর জেলা পূর্বাপূর্বা খাঁটী বাঙ্গলা-ভাষী জেলা নহে। জেলাব সর্বত্রই অবশ্য শুদ্ধ সাধু ও চলিত বাঙ্গলা পঠিত লিখিত ও কথিত হইলেও, ভাগীরথী-তীরেব শুদ্ধ চলিত ভাষা মাত্র জেলাব উত্তর-পূর্ব অংশে কথ্য ভাষাকপে প্রচলিত। তমলুকের পূর্বে, মেদিনীপুর শহরবৎ দক্ষিণে, নাবায়ণগড় ও সবৎ পর্যন্ত অঞ্চলে, যে বিশিষ্ট ধবণের বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত, তাহাব নাম-করণ হইয়াছে South-Western Bengali ‘দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা’। গোড়-বঙ্গেব ভাষা যে কয়টি মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে—যথা, বাচী, গোড়ী, বারেন্দ্র, কামরূপীয়, কাছাড়-শ্রীহট্টীয়, পট্টিকেবীয় বা

কুমিল্লা-অঞ্চলীয়, বঙ্গদেশীয় বা বঙ্গাল, চট্টগ্রামী বা চট্টলীয়, এবং সমতটীয় বা দক্ষিণ-বঙ্গীয়—মেদিনীপুরের এই “দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা” এগুলির একটিরও মধ্যে আসে না। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডে, স্বল্প সংখ্যক জনেব মধ্যে সীমায়িত বাঙ্গলার এই উপভাষাটির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এবং মনে হয় এই উপভাষা, স্বতন্ত্র ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে—একদিকে বাঙ্গলা-আসামী, অন্যদিকে উড়িয়া, এই দুইয়ের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে বলা যায় না। মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্র কথা ভাষাব কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই। পূর্ব-ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানেব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলাব এই উপভাষাকে “সুন্দা” অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, সুন্দা-দেশীয় অথবা সুন্দাক বাঙ্গলা এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মর্যাদা বক্ষা করা যায়। জিজ্ঞাস্য—এই “দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা”র কেন্দ্র-স্থল “সবং” অঞ্চল—এই নামেব মধ্যে কি “সুন্দা” শব্দ লুকাইয়া আছে? “সুন্দা = সুব্ভ ; সুন্দাঙ্গ = সুব্ভঙ্গ,” পরে “সোবঙ্গ, সবং”?

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জর্জ এব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের সংকলিত Linguistic Survey of India-তে এই বিশিষ্ট বাঙ্গলা উপভাষার প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়—মেদিনীপুর জেলার মধ্য-ভাগে, মেদিনীপুর থানাব দক্ষিণে, ডেববা থানাব দক্ষিণে, সমগ্র সবং থানাব উত্তরে, নারায়ণগড়ে, পশ্চিম পাঁশকুড়া থানায়, এবং পশ্চিম তমলুক ও পশ্চিম নন্দীগ্রাম থানায়—প্রধানতঃ কৈবর্ত বা মাহিস্ত্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই উপভাষা। ১৯০৩ সালের হিসাবে, জন-সংখ্যায় সাড়ে-তিন লাখ মাত্র লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই লোকভাষা, এখন হয়তো আরও কমিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সেক্রেটারি, বিদ্বান, কবি ও গুণী কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় (স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাট্টা ছিলেন ইহার দোহিত্র) এই উপজাতি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন (Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I, Specimens of the Bengali and Assamese Languages, Calcutta 1903 : পৃষ্ঠা ১১ এবং পৃষ্ঠা ৩৯ সংশ্লিষ্ট দুইখানি মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ভাষাব একটি বিশেষ মূল্যবান নিদর্শন, মহীপাল মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলোকনাথ বসু কর্তৃক রচিত “গ্রাম্য উপস্থাস”, “সোনাব পাথর-বাটি” (নূতন সংস্করণ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)-তে পাওয়া যাইবে। বইখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এই প্রায়-অপ্রাপ্য বই একখানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক ত্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সুখের বিষয়, এই স্থানীয় বাঙ্গলাব বইখানিব মূল্য বুঝিয়া বইখানিব প্রথম খণ্ডটি তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন, ও ইহাব ভাষা-ভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চিৎ কবিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৯৬৯ সাল, পৃঃ ১৩-৩৭)। বাঙ্গলা ভাষাব আলোচনায় ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন। আমাব Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, ১৯৭১ সালে পুনর্মুদ্রিত) এই “সুন্দাক” বাঙ্গলার বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা কবিতে পারি নাই। মেদিনীপুর জেলাব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ বাঙ্গলাভাষার এই স্বতন্ত্র শাখার পূর্ণ আলোচনাব অভাবে, বাঙ্গলা ভাষাব উদ্ভব ও বিবর্তন ইতিহাস অসম্পূর্ণ

বহিয়া গিয়াছে। আশা করি যে বিজন-বারু আবও বড় করিয়া মেদিনীপুরের এই উপভাষাব আলোচনা কবিবেন। ইহা ভিন্ন, জেলার অগ্ৰজ শুদ্ধ বাঙ্গলা অপেক্ষা শুদ্ধ বা মিশ্রিত উড়িয়া সমধিক প্রচলিত—বিশেষতঃ কাঁথি মহকুমায় ও উড়িষ্যাব সংলগ্ন অগ্র সর্বত্র। এবং পশ্চিম-মেদিনীপুরে ‘মাহাতো’ সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, ও সাঁওতাল-ভাষীও প্রচুর। উড়িয়া-ভাষী মেদিনীপুরীবা সকলেই বাঙ্গলা জানে, ইন্ধুলে বাঙ্গলা পড়ে, নিজেদেব বাঙ্গালী বলে, এবং ইহাদের সমাজ উড়িষ্যাব অনুকপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথক্। তথাপি উড়িয়ার প্রসাব এত অধিক যে মেদিনীপুরেব দক্ষিণ ও পশ্চিমের লোকেরা সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসূদন জ্ঞান মহাশয়ের কাঁথি-নগরস্থ বিখ্যাত “নীহার প্রেস” হইতে, বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর উড়িয়া সাহিত্যগ্রন্থ, ধর্মবিষয়ক ছোট-খাট বই, এবং জগন্নাথ দাস রচিত সমগ্র ভাগবত-পুবাণ ও অগ্র প্রধান গ্রন্থ মেদিনীপুরের লোকেদেব জন্ম প্রকাশিত হইয়াছে। এবং বাঙ্গলা অক্ষরে নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত এই-সমস্ত উড়িয়া গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

এই-সব কারণে, এক পূর্ব-মেদিনীপুর ভিন্ন অগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টির তেমন সুযোগ, মধ্য-প্রাচীন যুগে ছিল না। বাঙ্গলার অগ্রাঙ্গ অঞ্চলের তুলনায় এখানকার সাহিত্য-গৌরব ততটা লক্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর একটি ভাষাব উন্নতি-বিধানও মেদিনীপুরেব হাত ছিল। হিন্দীবি বিখ্যাত কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (উপনাম “নিরাল”—১৮৯৭-১৯৬১) আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে ১৯৩৫ সালের দিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করেন, যাহা হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে “ছায়াবাদ” নামে পরিচিত। মেদিনীপুরের মহিষাদল-রাজ্যেব পশ্চিমা-ব্রাহ্মণ রাজবংশের ক্ষুদ্র সেনায়, উন্নাও জেলা হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা কর্মগ্রহণ করেন, এবং এখানেই কবিব জন্ম হইয়াছিল। প্রায় সারা জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন, মেদিনীপুরেই খুব ভাল কবিয়া বাঙ্গলা শিখেন, রবীন্দ্রনাথের ভাব-শিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হন, এবং আধুনিক হিন্দী কাব্যজগতে একটি অভিনব রবীন্দ্র-রীতি প্রবর্তন করেন, যাহাব প্রভাব হিন্দী জগতে হইয়াছিল সুদূর-প্রসারী।

বাঙ্গলা ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ঘটিতেছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০ এবং ইহার দুই-এক শতক পূর্ব হইতেই। ঐ সময়ে মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তনে উদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশ, আধুনিক ভোজপুরী মৈথিল মগহী, বাঙ্গলা আসামী এবং উড়িয়ার সাধাবণ আদিম রূপ হিসাবে, কাশী মিথিলা মগধ, রাঢ় সূক্ষা, গোড় সমতট বঙ্গ, বরেন্দ্র কামরূপ, শ্রীহট্ট পট্টিকেবা চট্টল, এবং বাঙ্গলা ও উড়িয়ার সংযোগ ভূমিতে ও উড়িয়ায় প্রসূত হয়। এই-সমগ্র প্রাচী অঞ্চল জুড়িয়া এক সাধাবণ সংস্কৃতিব ক্ষেত্র, তখন ভোজপুরী মৈথিল-মগহী বাঙ্গলা-আসামী-উড়িয়া তাহাদের পৃথক্ সত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিব দিক্ হইতে এই প্রাচী অঞ্চল, ভারতে ও ভাবতেব বাহিরে এক বিশিষ্টতাময় গোববের স্থান অর্জন করে। মেদিনীপুর-অঞ্চল প্রাচীন তমলুক নগরকে আশ্রয় করিয়া এই গৌরবে

অংশ গ্রহণ কবে, ইহাব পরিবর্ধন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য ভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে তমলুক অঞ্চল বৌদ্ধ তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে তাহা জানা যায়। তাহাব পূর্বে, বৌদ্ধ পালি সাহিত্য ও গ্রীক ভৌগোলিকদের লেখা হইতে তমলুকের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথাও জানিতে পাবি। তবে বাঙ্গলা উড়িয়া মৈথিল প্রভৃতি আধুনিক-আর্য্য-ভাষাব পত্তনের বা স্থাপনার যুগে, যখন বাঙ্গলা ও উড়িয়ার মধ্যে পার্থক্য ততটা লক্ষণীয় ছিল না, তখন মেদিনীপুর-অঞ্চলের ভাষা যে, উভয় প্রকারের মাগধী অপভ্রংশ-জাত মিশ্র আর্য্য ভাষার ক্ষেত্র ছিল, তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায়। অবগ্যসঙ্কুল, প্রচুর পরিমাণে সাঁওতাল প্রভৃতি কোল আদিবাসীদের বাসভূমি বলিয়া, ঝাড়খণ্ডের মত এ অঞ্চলেও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। কখনও কখনও মেদিনীপুর জেলা, বিশেষ ভাবে ইহাব পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, উড়িয়ার অংশ বলিয়া কেহ-কেহ উল্লেখ কবিতেন, তবে স্থানীয় লোক এ সম্বন্ধে কখনও সচেতন বা সোচ্চার হন নাই, সহজেই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ভাগীরথী-তীরেব দেশ ও বর্ধমান, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়াব প্রতি। এই গোড়-বঙ্গের সাংস্কৃতিক হাওয়া সুদূর ঝাড়খণ্ডে, এবং মেদিনীপুরেও গিয়া পহুঁছিয়াছিল—গোড়-বঙ্গের সংস্কৃতির বিশিষ্টতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গেই। চৈতন্যদেবের প্রভাবে গোড়-বঙ্গের যে সভ্যতা ও চিন্তাধারার, সাহিত্যের, ও সঙ্গীত এবং অল্প মুকুমার কলাব উদ্ভব এবং প্রসার আরম্ভ হইল, তাহা মেদিনীপুরের উচ্চ স্তরের এবং নিম্ন স্তরের জনগণ অক্লেশেই গ্রহণ করিলেন। মেদিনীপুরের জীবন-চর্যা-গোড়-বঙ্গেরই অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গেল। “মেদিনীপুর” নামটি করে সর্বজন-গৃহীত হইল, তাহা জানা যায় না। সংস্কৃত, রূপ ধারণ কবিলেও, বাঙ্গলা-দেশের ও ভাবতের অল্প বহু ভৌগোলিক ও জাতিবাচক নামের মত, এই নামেরও পিছনে কোনও অজ্ঞাতমূল অনার্য্য কোল-জাতীয় নাম ঢাকা পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। সারা বঙ্গভাষী জনগণের মত মেদিনীপুরের লোকসাহিত্যে সেই এবই জিনিস পাই—কৃষ্ণলীলার-গান, বৈষ্ণব নাম ও রসকীর্তন, হব-পার্বতীর গান, কালী-কীর্তন, এবং ঝুমুৰ গীত, টুমুৰ গান, ভাটুর গান প্রভৃতি নানা প্রকারের লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে খ্রীষ্টচৈতন্যদেব প্রচাৰিত বৈষ্ণব ধর্ম, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন হইতে মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও পহুঁছায়, এবং কোথাও-কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে) মেদিনীপুরের অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসিয়া বাস করেন, ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নবোত্তম দাস ও জীনিবাসের সঙ্গ লাভ কবেন, বৈষ্ণব-তত্ত্ব লইয়া কতকগুলি নিবন্ধ-কাব্য রচনা কবেন, এবং গোড়ীয় পদকর্তা মহাজনদের মধ্যে ইনি অগ্রতম ছিলেন—বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাব উচ্চ স্থান স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দদাস মেদিনীপুরের ভূমিতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ষোড়শ শতক হইতেই এইকপে মেদিনীপুর বাঙ্গলাব প্রবর্ধমান সাহিত্য-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।



সংখ্যা—১ ষট্টিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

মেদিনীপুরের বঙ্গসাহিত্য-অবদান-মালায় মধ্যে আব দুই জন বড় সাহিত্যিকের নাম করিতে হয়—একজন, “শিবায়ন” বা “শিবমঙ্গল” কাব্যেব এবং অন্য গ্রন্থের রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি ১৬৩২ শকাব্দে (১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে) “শিবায়ন” রচনা করেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ববদা পরগণায় যদুপুর গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। পবে ইনি মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটস্থ কর্ণগড়ে আসিয়া বাস করেন। আব একজন বড় বাঙ্গালী লেখক, প্রথম যুগেব বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একজন প্রধান প্রবর্তক ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণেব রচয়িতা (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ আনুমানিক), বাঙ্গলাসাহিত্য-বচনায় শ্রীরামপুরেব খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহযোগী ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, এবং কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজেব বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ও লেখক, পণ্ডিত যুত্বাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইঁহাব প্রধান রচনা হইতেছে “বত্রিশ সিংহাসন” (১৮০২), “রাজাবলী” (১৮০৮), “বেদান্ত-চন্দ্রিকা” (১৮১৭) এবং “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” (১৮৩৩)। ইঁহাব জীবনকাল ঠিকমত জানিতে পাবা যায় নাই। ইঁহাব সেবায় বঙ্গভাবভী বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছেন, আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য ভাষাব প্রতিষ্ঠায় ইঁনি ছিলেন সব্যসাচী।

মেদিনীপুরেব সাহিত্যিক ও অন্তর্বিধ অবদানের সঙ্গে আব একজন বিরাট পুরুষের নাম গোরবেব সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে—তাহা হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেব (১৮২০-১৮৯১)। ইঁহাব জন্মস্থান বীরসিংহ-গ্রাম জন্মকালে হুগলী জেলাব অধীনস্থ ছিল, পরে ঐ গ্রামকে মেদিনীপুরেব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইঁনি বিশেষ কবিতা মেদিনীপুরের অধিবাসিগণেরও গর্বস্থল হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গলারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী কর্মোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরেব অধিবাসীকপে বাস কবিতাছিলেন, ও এইভাবে মেদিনীপুরও তাঁহাদের গৌরবেব অংশ-ভাক্ হইবার অধিকার লাভ কবিতাছে।

ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরেব অংশ-গ্রহণ এই সংগ্রামকে বিশেষ গৌরব দান কবিতাছে। খুদিরাম বসু হইতে আবঙ-কবিতা দেশমাতার উদ্ধারের জন্ত যে সমস্ত পুণ্যশ্লোক আত্মত্যাগী বীরেব আত্মবলিদানে মেদিনীপুর ও ভাবতভূমি পবিত্র হইয়াছে, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে তাঁহাদের স্মরণ কবি, তাঁহাদের প্রশংসা কবি।

মেদিনীপুরেব ভাগ্যবান জমীদার-কুলের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যেব উৎসাহ-দাতা অনেকেই রহিতাছেন। যেমন নাডাজোল জমীদার বংশ। যেমন এই ঝাড়গ্রামের মল্লরাজ-বংশ—এই রাজবংশের রাজা শ্রীযুক্ত নবসিংহ মল্লদেব—যিনি বঙ্গ-সাহিত্য প্রচারে নানা ভাবে সক্রিয় সহায়তা কবিতা আসিতাছেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েব ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র বচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব মাধ্যমে প্রকাশ করাইবার জন্ত অর্থানুকূল্য কবিতাছেন—পবিষদের সত্যকাব হিতৈষী বান্ধব হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণেব পক্ষে, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা যে, রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব এই ষট্টিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী বলিয়া, চিক্লিগড়ে ঝাঁহাদেব প্রাসাদ ও কেন্দ্র, সেই ধলভূম-মহারাজ ধবল-দেব বংশও পরিচিত।

উপস্থিত ছত্রিশতম বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা লাভ-লোক-সানের খতিয়ান, অন্ততঃ সংক্ষেপে পেশ করা, হয়তো সভাপতির অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেহ বা চাহিবেন, সাহিত্যের আদর্শ এবং বাঙ্গলার সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে “সাবগর্ভ” আলোচনা। এই সমস্ত বিষয় এবং অনুরূপ বিষয় লইয়া কার্য্যকর বা উপযোগী আলোচনা করাব পিছনে থাকা চাই—সাহিত্য-বিষয়ে লেখকের কারয়িজী এবং ভাবয়িজী উভয়বিধ প্রতিভা, সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বোধ ও সুবিবেচনা, এবং জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রীতি ও অনুবাগ-প্রসূত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। এই সমস্ত যোগ্যতাব অধিকারী না হইলে, সাহিত্য-বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সুদৃঢ় ভাবে নিবেদন কবিতে চাই যে, এইরূপ যোগ্যতাব অধিকারী আমি নহি। বহুত করিয়া আমি বলিয়া থাকি যে আমি সাহিত্যিক নহি, ঝাঁহারা সাহিত্যসৌধ বচনা কবিয়া ভাষা-সরস্বতীকে মহীয়সী করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের অনুগামী একজন “মাটি-কাটা মজুর”, সামান্য বাক-তত্ত্বের আলোচক মাত্র। পবিতাপের সঙ্গে একথা স্বীকার করিব যে, আধুনিক সাহিত্যের অনেক কিছু আমার বোধগম্য নহে। শিল্পে আজ-কাল যেমন বাস্তবিকতাব বিবোধী Modernism বা অতিআধুনিকতা এবং Abstract Art অর্থাৎ নিগূঢ়রূপ-প্রদর্শন অথবা “কপ-সাব” কল্পনা দেখা দিতেছে, অনেক চেষ্টা কবিয়া যাহা আমি ধবিতে ছুঁইতে বা বুঝিতে সমর্থ হই নাই, তেমনি সাহিত্যেও এই Ultra-modernism ও Abstractism কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দৌর্দণ্ড-প্রতাপে বাজত্ব কবিতেছে। বিশেষতঃ কবিতা এবং কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই এখনকার বাঙ্গলা সাহিত্যে বড়-বড় কবি দেখা দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন-ও। কিন্তু “বয়োধর্মণে বুদ্ধি-ভ্রংশঃ”—সর্বক্ষেত্রে আমি তাহাব অর্থ গ্রহণ কবিতে অপারক, এইরূপ নিগূঢ়-তত্ত্বের কবিতাব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঝাঁহাবা করিয়া থাকেন সেইরূপ প্রস্তাবকদের কাছে আমাকে তুষ্টী অবলম্বন কবিয়া থাকিতেই হয়। “উটেব মত হ’ল বজনী”; “মানুষেব আলজিভ কেটে দিয়ে অভ্যন্তর আবেগে, প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে পুঁতে যাই আনন্দের গাছ”, “সন্ধ্যা হ’লে অন্ধকাবে চামচিকে, বাতুলেব খেলা—দেখে দেখে এ অভ্যাস মজ্জাগত যাদেব, তাবাই—হবেলা উকুন বাছে—কাছাকাছি আবশোলা ওড়ে”; “শুয়োবেব বাচ্চা হ’তে শখ হয়, তাইতো এখনো—সার্ডিন-মাছেব তেলে মাছ-ভাজা এখন অকচি”,—প্রভৃতি ভাবগর্ভ ছত্রের অর্থ বা দোতনা, ব্যর্থ আকুলতাব সঙ্গে চিন্তা করি—এব চেয়ে আবও নিবিড় দেহ-ধর্ম-বিষয়ক, আবও ভাবগভীর লাইনের অভাব নাই;—সুতবাং এ বিষয়ে কিছু বিচার বা আলোচনা বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনধিকাব-চর্চা হইবে।

বাঙ্গালীর আর সব কিছু গিয়াছে, বা যাইতেছে—কেবল অবশিষ্ট আছে তাহার

ভাষার সাহিত্যিক গোঁবব। এই গোঁববকে জীয়াইয়া বাখিবাব চেষ্টার বিরাম নাই। এবং আমাদের এই চবম দুর্দিনেও একটা আত্মপ্রসাদের কথা—কাঁটা-বনের মধ্যে একটি মিষ্টি ফলের মত—এই যে, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যে—গল্প উপন্যাসে উপাখ্যানে নিবন্ধে রস-বচনায়—বাঙ্গালীর তাহার আঙ্গিক সত্তাকে এখনও একেবাবে হাবাইয়া ফেলে নাই। ববীজ্ঞোত্তর সাহিত্যে বঙ্কিম ববীজ্ঞ শরতের অনুগামীদের পক্ষে যাহা অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না, এমন কথা-সাহিত্য আমরা এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের জীবিত ও পরলোকগত কথাকাব ও নিবন্ধকারের মধ্যে অক্লেসে ১৫২০ জনের নাম কবিত্তে পাবা যাইবে, ঐহাদেব বচনা পৃথিবীর যে-কোনও প্রোচ ও উচ্চকোটির সাহিত্যেব পক্ষেও গৌরবেব বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ছেঁড়া চাটাইয়েব উপবে শুইয়া লাখ টাকাব স্বপন দেখাব মত আমবা এখন বিগত গ্রীক্ষীয় শতকেব—উনবিংশ শতকেব—মধ্য-ভাগে যে-সমস্ত বড-বড সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্ত মনীষীব আবির্ভাবে কলিকাতা ও বাঙ্গলা-দেশ ধন্য হইয়াছে—গ্রীক্ষীয় ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক স্বর্ণ-যুগের অধিকারী মহাকালেব প্রসাদে আমবা হইতে পারিয়াছি, এখন সেই মহাপুরুষদেব অবদান স্মরণ করিয়া তাঁহাদেব উদ্দেশে প্রায় প্রতিবৎসব একটি বা একাধিক কবিয়া শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় পূর্ব-স্মৃতিকে জাগাইয়া বাখিবাব চেষ্টা কবিত্তেছি। ঐতিহাসিকেব দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝিত্তে পারিব যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব-জাতির সাহিত্যেব ও সংস্কৃতিব বিবর্তনে, মাত্র তিনটি বিভিন্ন দেশে তিনটি বিভিন্ন কালে এই অসাধাবণ ব্যাপাব ঘটয়াছিল—এত অল্প সময়ে বিস্ময়কর ভাবে এতগুলি কবিয়া বিরাত্ মনীষীর আবির্ভাব—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শাস্ত্র চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে ঐহাদেব প্রভাব সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্ভুদ্ধ কবিয়াছে, কবিত্তেছে এবং করিবে—যথা, (১) পেবিক্রেসের সময়েব গ্রীক্ষপূর্ব পঞ্চম শতকেব আথেনাই বা আথেন্স নগবীতে, (২) বাণী এলিজাবেথেব সময়েব, ষোড়শ শতকেব লন্ডনে ও ইংলাণ্ডে, এবং শেষ (৩) ইংরেজ আমলে ১৮০০ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ও বাঙ্গলা-দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে। আমাব মনে হয়, জাতি হিসাবে ইহাই আমাদের চবম দান—ভাবতকে, এশিয়াকে, সমগ্র জগৎকে।

বার্ষিক বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনে নিশ্চয়ই আমাদের এই পিজাগত রিক্তেব বিচাব ও মূল্যায়ন করিবাব সার্থকতা আছে, আবশ্যকতা আছে। অত্যাঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে যেমন, এই সম্মেলনেও তেমনি যোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বাবা সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতিব প্রগতির কথা আলোচিত হইবে। আন্তবিক কামনা করি, সেই-সমস্ত আলোচনা, জ্ঞানদীপ্ত সৌন্দর্যোদ্ভাসিত এবং পরিপূর্ণ হইয়া, ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত এই ষট্টিংশত্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনকে সার্থক ককক ॥

(এই অভিভাষণ ঝাড়গ্রামে উদ্বোধনী সভায় পঠিত হইবার পরে, সভাপতি মহাশয় কত্ ক কিয়দংশে পরিবর্তিত হইয়া মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাভাঙ্গ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।)

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত ষট্টিংশ বঙ্গ সাহিত্য
সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী বান্ধব রাজা
শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের ভাষণ

মাননীয় মূল সভাপতি, সাহিত্যিক, সুধীবৃন্দ ও ঝাড়গ্রামের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আমার মনে হয় আজকেব এই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশনের উদ্বোধনের ভাব কোন যথার্থ গুণী ব্যক্তির উপর অর্পিত হলেই সকল দিক দিয়ে শোভন হ'ত। কেন না, আমি সাহিত্যদ্রষ্টা নই। সাহিত্যসেবী বলেও স্পর্ধা বাধি না। অন্তবেব কথা জানিয়ে শুধু এই বলতে পারি যে, আমি বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসি। সাহিত্যের প্রাক্ষণে প্রবেশেব ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন অধিকার নাই এবং সেই অধিকার বলেই শত কুঠা, শত অক্ষমতা সত্ত্বেও দাঁড়িয়েছি আপনাদের সম্মুখে।

আমাদের পবন সৌভাগ্য যে, আজকে এই উৎসবের পৌরোহিত্যে বরণ কববার সুযোগ পেয়েছি এমন একজনকে, যিনি সাহিত্যের বিচিত্র পথেব পথচারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের জাতীয় জীবনের মবা গাঙে নূতন বান ডাকলো। বাংলা দেশে এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হল। বাঙ্গালীর মনীষা শতশিখায় জ্বলে উঠলো। বাংলা দেশে প্রতিভাব দীপালি উৎসব শুরু হোল। সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্মিক সাধনায় বাঙ্গালীর প্রতিভাব এক অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা দিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুগের জ্যেষ্ঠ বাঙ্গালীদের কীর্তি কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ সেই গৌরবময় যুগের অবসান ঘটেছে। সে যুগের জ্যোতির্ময়-প্রতিভাধর পুরুষেরা একে একে বিদায় নিয়েছেন। আমার পূজনীয় মাস্টার মহাশয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ্ত প্রতিভা এখনো এই গৌরবময় যুগটির মহিমামণ্ডিত ঐতিহ্য জাগিয়ে বেখেছে। এই বর্ষীয়ান জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যবথীকে ও সমাগত সাহিত্যিক সুধীবৃন্দকে আমি আমার সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনই দেশের সাবস্বত সমাজের যথার্থ মিলনভূমি। আজ আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি যে, এ হেন মহান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত হয়েছে আমাদের এই সুদূব অনগ্রসব দাবিজক্রিষ্ট ঝাড়গ্রামে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবক্ষণ মানসে যে পুণ্যব্রত সন্মিলন গ্রহণ কবেছেন তা সম্যক উপলব্ধি ক'বে ঝাড়গ্রামবাসী আজ প্রেবণা লাভ করবে এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য আজ তাবা কৃতজ্ঞ। সম্মেলনের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার উপর শ্রীভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ইহাই কামনা করি।

এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার পুণ্য জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলার অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যেব কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। আজ যে মেদিনীপুরেব সহিত আমবা পবিচিত সে মেদিনীপুর তাব সমস্ত পূর্বতন ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস হাবিয়েছে। তাব বাণিজ্য সংস্কৃতি, তাব ধর্মপ্রেবণা, তাব যুদ্ধ বিশাবদতা একসময় সমস্ত ভারতবর্ষ তথা সমস্ত পৃথিবীব অনুপ্রেবণা দানকাবী ছিল। প্রাক্‌আর্য চরিত্রেব তান্ত্রলিপ্ত হচ্ছে অততম দ্রাবিড সভ্যতাব পীঠস্থান। সে যুগে তান্ত্রলিপ্ত ভাবতের খ্যাতনামা অততম নো-বন্দব ও নো-নির্মাণ কেন্দ্র। যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী জাতি সমস্ত পৃথিবীতে অমিতাভ বুদ্ধের শাস্তি ও অহিংসান্ন বাণী বহণ ক'বে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানেব ঐশ্বর্য ও শ্রী চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েন্ ও হিউয়েন্সাঙকে স্তম্ভিত ক'বেছিল—যাব খ্যাতি রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ভাবতের তিনটি প্রদেশ বিহাব, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাব সংযোগ স্থানে অবস্থান হেতু বহু যুদ্ধেব লীলাভূমি এই মেদিনীপুর। মোগল পাঠান শক্তির সহিত নিজ স্বাধীনতা বক্ষাব জ্ঞাব বহু হিন্দু বাজুবর্গ প্রাণ সমর্পণ ক'বেছেন এইখানে। ধর্মক্ষেত্রেও মেদিনীপুর অগ্রগণ্য তীর্থভূমি। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ নিজ পথ ও মতেব সহনশীলতার পবিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ ও পার্শ্বনাথের মত ও পথেব সহিত যুগাবতার খ্রীচৈতন্যদেবের খ্রীক্ষেত্র যাওয়াব পথে স্বীয় স্বর্গীয় প্রেম ও ভক্তিমূলক সংগীতে বিধৌত হয়েছিল এই মেদিনীপুর ভূমি। আমাদের এই ঝাড়গ্রামই পবম বৈষ্ণব শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের জন্মভূমি ও গোপীবল্লভপুবে তাঁর পীঠস্থান।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই। এই মেদিনীপুরেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যেব জনকপ্রতিম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দবামেব লীলাভূমিও এই মেদিনীপুর এবং আবও অনেক স্মরণীয় সাহিত্যিকের রচনা-ক্ষেত্রেব স্মৃতিও এই মেদিনীপুরেব বহু স্থানেব সহিত জড়িত। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে মেদিনীপুরেব সম্মানগণেব অবদানও কম নয়। শহীদ স্কুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজবা, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বাজা দেবেন্দ্রলাল খান মহোদয় প্রভৃতি স্বাধীনত যুদ্ধের পূর্বোধ্য ছিলেন। শেষে বর্তমান ঝাড়গ্রামেব কপকাব আমার পবম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বর্গীয় দেবেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ না ক'বে শেষ করতে পারছি না—যিনি এই মেদিনী-পুর জেলাব বহু সরকারী ও বেসবকাবী উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানেব সহিত যুক্ত থেকে নিজেকে নিঃশেষ কবেছেন।

জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যেব প্রভাব নির্দেশ ক'বতে-যাওয়া আমার মত অব্যবসায়ীব পক্ষে নিতান্তই অনধিকাব চর্চা। শুধু সহজ বিচার বুদ্ধি বলে এই মনে হয় যে, জাতীয় জীবনেব সঙ্গে সাহিত্যেব একটি নিগূঢ় সংযোগ আছে। বাস্তব জীবনেব সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চললে সাহিত্য অলস বক্সনায় পবিণত হয়। এই জগতই সাহিত্য যুগধর্মী হওয়া উচিত। আমাদের বর্তমান বাঙ্গালী জীবনেব জীবন মরণ সমস্তাগুলি—বক্ষিতের-হাহাকাব, হতশ্রী

পল্লীজীবনের নিরানন্দ—ইহারা কি বাঙ্গালী সাহিত্যিককে অনুপ্রেরণা যোগাতে পাবে না? আমার মনে হয় অবসাদ ভরা জীবনে আশাব সঙ্গীত ধ্বনিত ক’রে তোলা, আত্ম-বিশ্বাসেব ছবি ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যেব একটি প্রধান কাজ। এ সব কথা তুলে আমি আপনাদের সময় নষ্ট ক’বতে ইচ্ছা করি না। বক্তব্য শেষ করার আগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মাধ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাব আবেদন যে, ঝাড়গ্রামে তাঁদের একটি স্থায়ী সক্রিয় শাখা স্থাপন ক’রে এই অনগ্রসব ঝাড়গ্রামবাসীদের সাহিত্য-সেবাব বা অনুশীলনের সুযোগ দিলে আমবা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাহিত্যেব সাধক আপনারা—আপনারা জাতিব নমস্কার। আপনাদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছি এবং যাঁবা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন সেই কর্তৃপক্ষগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমুন, বঙ্গভাবতীব অর্চনা ক’বে আজকেব এই অনুষ্ঠানেব শুভ উদ্বোধন কার্য সম্পাদনে আমরা ব্রতী হই। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হোন। জয় হিন্দ।

শ্রীনবসিংহ মল্লদেব

সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি।

ষট্‌ত্রিংশৎ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ঝাড়গ্রাম অধিবেশন।

সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী

১ম—৩য় খণ্ড (আমার জীবন)

মূল্য—৩৯'০০

চতুর্থ খণ্ড—১৪'০০

অক্ষয় বড়াল-গ্রন্থাবলী

সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই।

মূল্য—১৬'৫০

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই।

মূল্য—২৫'০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

- ফোন : ৩৫-৩৭৪৩



আমাদের প্রভাতকুমার

বনফুল

(শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে যিনি সর্বপ্রথমে কুন্ডলীন পুঙ্কাবে ‘পূজার চিঠি’ নামে গল্প লিখিয়া পুঙ্কৃত হইয়াছিলেন, একদা ববীন্দ্রনাথের উৎসাহ যাহাকে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত কবে আমবা আজ বাংলা সাহিত্যেব সেই অনুপম গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই সভায় সমবেত হইয়াছি তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন কবিবাব জগ্য। এই সভাব আয়োজন যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা সাহিত্য-প্রেমিক মাঝেই স্বীকাব কবিবেন। কিন্তু হায়, আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন একটি বা একাধিক সভা কবিয়াই শেষ হইয়া যায়। বস্তুত ইহাব বেশী আব কিছু কবিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা বড জোব বাজ্য-সবকাবকে অনুবোধ করিতে পাবি প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলীব একটি সস্তা সংস্করণ অথবা তাঁহার গল্পগুলিব একটি চয়নিকা তাঁহাবা বাহিব ককন। আমাদের প্রচেষ্টা ইহাব বেশী আব অগ্রসব হইবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অনেকে খেদ করেন সেকালের বড বড সাহিত্যিকদের একালের আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীরা আজকাল ভুলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাঙালী হয়তো ভুলিয়াছে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বাঙালীরা ভোলে নাই। সর্বকালে সর্বদেশে এই বসিকদের নাতিবিস্তৃত জগতেই প্রকৃত স্রষ্টাব, নিষ্কলুষ সাহিত্যিকদের মর্যাদা চিব অম্মান। সে জগতে বসস্রষ্টা প্রভাতকুমার শ্রদ্ধাব সিংহাসনে আজও সমাসীন আছেন। যে প্রভাতকুমারকে ববীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—‘ছোট গল্প লেখায় পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সবাসাচী অর্জুন। তোমাব গাণ্ডীব হইতে তীবগুলি ছোট্টে যেন সূর্যেব বশিব মতো—’ যে প্রভাতকুমারকে উদ্দেশ্য কবিয়া জোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন—‘তোমাব গল্প আমাব খুবই ভালো লাগে। বড বড ফবাসী গল্প লেখকদের অপেক্ষা তোমাব গল্প কোন অংশে হীন নহে। —সেই প্রভাতকুমারকে প্রকৃত সাহিত্যবসিক বাঙালীরা আজও মনে বাখিয়াছে। এই সভাব উদ্যোগ তাঁহাদেরই চেষ্টায়। বামা-শ্যামা-যত্ন-মধুর দল তাঁহাকে মনে বাখে নাই বলিয়া খেদ করিবার প্রয়োজন নাই। লগুন শহবে সেক্সপীয়রের নাম শোনে নাই এমন লোকের ক্ষথাও একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছি। ইহাই স্বাভাবিক। মুর্গিব নিকট মুক্তোব দানা অপেক্ষা গমেব দানা বেশী মূল্যবান। মুর্গিব চক্ষে মুক্তোব দানা বাজে জিনিস। সুতবাং মুর্গিদের জগতে মুক্তোদানা কেন অনাদৃত ইহা লইয়া হা হতাশ কবা সময় নষ্ট কবা ছাড়া আব কিছু নয়। যাহারা জহুবী তাঁহাবা যথার্থ মুক্তাব যথার্থ মূল্য চিবকাল দিয়াছেন।

প্রভাতকুমার অধিকাংশ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মতো কবিতা দিয়াই সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ তিনি তাঁহার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসগুলিব জগ্য বিখ্যাত। ত্রিশখানি গল্প-সংগ্রহ ও উপন্যাস তাঁহার কীর্তি বহন করিতেছে। তাঁহার

লেখাব্যবশিষ্ট্য তাঁহার ভাষাব স্বচ্ছতা, গল্পের প্লটের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি তাঁহার সকল বচনাব মধ্যে হাস্য-ব্যঙ্গের সু-মধুর ফল্গুধারা। বাংলাব গল্প-সাহিত্যে আব একটি অভিনবত্ব তিনি আনিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে বিলাত-ফেবত এবং বিলাত-প্রবাসী ভাবতীয়দেব একটি নিখুঁত সরস চিত্র তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব এ চিত্র তিনিই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভাতকুমারদেব সাহিত্যেব দীর্ঘ-আলোচনাব অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। সেকালেব 'দাসী' 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' 'ভাবতী' 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার রচনা প্রকাশ কবিয়া যে গুণগ্রাহিতাব পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা এ যুগে দুর্লভ। এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও না কি হোমরা চোমবাদের সুপারিশ না থাকিলে নবাগত সাহিত্যিকদেব লেখা প্রকাশিত হয় না। সে যুগে এ সব ছিল না। তাই বিলাত প্রবাসী প্রভাতকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যেব পাঠস্থান কলিকাতা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়। কলিকাতা শহবে বসিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন এ রকম সাহিত্যিক বেশী নাই। এক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কাহাবও নাম তো মনে পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্র সকলেই কলিকাতাব বাহিরে থাকিয়াই তাঁহাদেব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার শেষ জীবনে 'মানসী ও মর্মবাণী'-ব সম্পাদক এবং ল কলেজের অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার জীবনেব অধিকাংশ সময় কাটিয়াছিল কলিকাতাব বাহিরে—জামালপুরে, সিমলায়, দার্জিলিঙে, বংপুর্বে এবং গয়ায়। তাঁহার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ই. আই. বেলের একজন সিগনালার। পিতাব সহিত প্রভাতকুমার অনেক বেল-স্টেশনে ঘুরিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গল্পে বেলঙয়ে স্টেশন এবং বেলের কর্মচারীরা জীবন্ত। তাঁহার বিখ্যাত আশ্রিত্ত্ব গল্পটির অন্তরালে হয়তো প্রত্যক্ষ দর্শনের কোনও প্রেবণা আছে। বসিক প্রভাতকুমারকে, বসপ্রস্তু প্রভাতকুমারকে, স্বল্পভাষী প্রভাতকুমারকে, শিষ্টাচার সম্পন্ন প্রভাতকুমারকে, নিবহঙ্গাব সুমিষ্ট স্বভাব আত্মগোপন প্রবাসী প্রভাতকুমারকে আমাব প্রণাম নিবেদন কবি। শুধু লেখক হিসাবে নহে মানুষ হিসাবেও তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বসিক সমাজকে যে আনন্দ একদা দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিদান দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা শুধু বলি—

তুমি আমাদের আপনাব লোক ছিলে

মোরাও তোমাব আপনাব লোক আছি,

মৃত্যু তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক

আমরা কিন্তু আছি অতি কাছাকাছি।

প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব প্রসঙ্গ উঠলেই—রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা প্রায় আমাদের অজ্ঞাতসাবেই উচ্চারণ করে থাকি। আমরা প্রভাতকুমার বলতে বুঝি ছোটগল্পেব-লেখক। এবং বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎকর্ষ বিষয়ে যখন তারতম্য বিচার করতে বসি তখন—‘তম’ যে রবীন্দ্রনাথের নামাশ্রিত হবে তাতে কারও দ্বিমত হয় না। —‘তব’ সম্পর্কেও দ্বিমত নেই। রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়, প্রভাতকুমার দ্বিতীয়। সে দ্বিতীয়তায় কোনো অগৌরব নেই। লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। গদ্যেব পথে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রায় হাতে ধবে নামিয়েছেন। দ্বন্দ্বদর্শী গুরু মতই তিনি প্রভাতকুমারেব প্রতিভাব প্রকৃতিটি বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁকে ঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শিষ্যও বিনা প্রতিবাদে সে পথ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন সে আমাদের সৌভাগ্য। নইলে বাংলা সাহিত্য একটি দুর্লভ ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হত। প্রভাতকুমারেব পব আরও অনেক শক্তিমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। ছোট গল্পের শাখাও ফুলে ফলে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। তবু একথা সকলেই স্বীকার কববেন তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্য যা পেয়েছে আব কারও হাতে তা পায়নি।

সাহিত্য বচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারেব যোগাযোগ কবে হয়েছিল? কি ভাবে হয়েছিল? —জানবাব জগ্গে কৌতূহল হয়। আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে তাব থেকে এইটুকু মাত্র জানলাম যে প্রভাতকুমার কবিতা দিয়ে তাঁব সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। জেনেছি তাঁর নিজেব জবানিতে।

“রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য বচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিবাছিলাম ‘কবিতাব মা বাপ নাই, যা খুশী লিখিয়া যাই—কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সে পাণ্ডিত্য আমার কই?’ ইহাতে রবিবাবু উত্তবে লেখেন, ‘গদ্য বচনাব জন্ত প্রধান জিনিস হইতেছে বস। বীতিমতো আয়োজন না কবিয়া, কোমব না বাঁধিয়া সমালোচনা হউক প্রবন্ধ হউক গল্প হউক একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি।”

রবীন্দ্রনাথের কথাব ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলেছিল। তিনি একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখলেন; রবীন্দ্রনাথেব ‘চিত্রা’ কাব্যেব সমালোচনা। সমালোচনাটি ছাপা হল ‘দাসী’ পত্রিকায়। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। একটি গল্পও লিখলেন, ‘শ্রীবিলাসেব দুবুদ্ধি’। সেটি বেরোল ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় ছদ্ম নামে।

গল্পের কথা লেখক রবীন্দ্রনাথকে জানান নি। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীয় সম্পাদক। তিনি ‘ভারতী’-তে ‘প্রদীপে’-র ওই সংখ্যাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘রাধামণি দেবী’-র নামাঙ্কিত গল্পটির সুখ্যাতি করেছিলেন। ‘রাধামণি দেবী’-র নামে আরও একটি গল্প মুদ্রিত হল ওই ‘প্রদীপ’ পত্রিকাতেই কয়েক মাস পবে। নাম ‘বেনামী চিঠি’। রবীন্দ্রনাথ ভাবতীতে এই গল্পটির প্রশংসা করেন। প্রভাতকুমার তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন,—“রবিবাবু এবারও ভারতীতে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসব প্রদীপে নিজমূর্তি ধরিয়া বাহির হইলাম।”

রবীন্দ্রনাথের অযাচিত প্রশংসায় প্রভাতকুমারের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। আমাদের প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা যতটা অযাচিত ছিল ততটা ‘অজানিত’ ছিল কি না। ‘রাধামণি দেবী’ যে প্রভাতবাবুর ছদ্মনাম এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি না। প্রভাতবাবু বলেছেন এই নামটির প্রতি তাঁব একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। সে মায়ার কারণটিও কৌতুকাবহ। সেটি এই।—আগের বছর কুস্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল ‘পূজার চিঠি’। পূজার ছুটিতে স্বামী বাড়ি আসবেন। স্ত্রী তাঁকে এটা সেটার সঙ্গে এক বোতল কুস্তলীন কেশ তৈল আনার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছে। এই হল প্রস্তাবিত ‘পূজার চিঠি’-র বিষয়। প্রভাতকুমার রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে একটি পত্র রচনা কবে পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রটিই প্রথম পুরস্কার পায়। সেই কাবণেই নামটির উপর নাকি তাঁব মায়া বসে যায় এবং পরেও গল্পের ছদ্মনাম হিসেবে এটির ব্যবহার করেন।

কিন্তু ছদ্মতার আবরণ যে বেশী দিন আসল নামটিকে ঢেকে রাখতে পারে নি, সেটাও তাঁরই মুখ থেকে শুনে পাচ্ছি। কুস্তলীনরা জানতে পেরেছিলেন যে, ‘রাধামণি দেবী’ প্রভাতবাবুরই ছদ্মনাম। তাবপব থেকে তাঁবা পুরস্কার ঘোষণার সময় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ছদ্মনাম ব্যবহার করলে পুরস্কার পাবেন না।

কুস্তলীনবা যা জানতে পেরেছিলেন এবং যে কারণে জানতে পেরেছিলেন সে ঘটনা এবং তাব কাবণ সেদিনকার সাহিত্যসমাজে কখনো অজ্ঞাত থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কানে সে সংবাদ না ওঠাটা সম্ভব মনে হয় না। তবে প্রভাতবাবু তাঁব স্নেহেব পাত্র। তিনি যেটা গোপন রাখতে চান কবি সেটা জেনেও তাঁকে জানাতে চান নি।

প্রভাতকুমার বলেছেন, “তখন আমি ছিলাম ‘কবি’, সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম।” ‘সুতরাং’ নামক সংযোজক অব্যয়টি থেকেই বুঝতে পারি—তিনি তখন আপন কবিত্ব গোবব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। যতই নিজেকে বিদ্রূপ করুন তাঁর কবিতা সেদিনকার পাঠকসমাজে নিতান্ত অপাংক্ত্যেয় ছিল না।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা দেখেছেন এবং সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তার মধ্যে লেখকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। সুস্থ বিচারবুদ্ধি বলে বুঝেছেন এই শক্তিকে কবিতার চেয়ে গল্পের খাতে বহাতে পারলে সবার লাভ। বঙ্গভূমি যতই ক্ষুদ্র হোক, কাল যখন নিববধি তখন কবির অভাব হবে না। কিন্তু দুই বা তিন নম্বরের শতসংখ্যক কবিব চেয়ে এক নম্বরের একটি গদ্যলেখকের প্রয়োজন বেশী এবং তাঁর ধারণা প্রভাতকুমারের দ্বারা সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের কবিতা দেখে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে আশাবিত্ত হয়েছিলেন। এটা আমার অনুমান বটে কিন্তু অনুমানের পিছনে কিছু হেতুও আছে। সর্বনিম্নে নিবেদন কবি।—

সেদিনকার কবিতাঃপ্রার্থী তরুণ সমাজে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর অভাব ছিল না। প্রভাতবাবু ছিলেন অনুবাগী-সম্প্রদায়ের অন্যতম। তাঁর কুড়ি এরুশ বছর বয়স থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা শুরু করেন। প্রথম কয়েকটি চিঠি বিনা স্বাক্ষরে বা ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল। (দেশ ১৩৭৫, সাহিত্য সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের পত্র) এই সকল পত্রে তিনি কবির সঙ্গে পবিচিত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের অনুরাগী পাঠক রূপে কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে তাঁর একটি ছবি পাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রভাতকুমারের প্রথম স্বাক্ষরিত চিঠির তারিখ ১১ মাঘ ১৩০১ (জানুয়ারি ১৮৯৫)। এই চিঠির পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। ‘সাধনা’ পত্রে প্রভাতকুমারের একটি কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের মাঘ মাসে। তাব হু-মাস আগেই রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’র সম্পাদন-ভাব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদকত্বে যে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেই পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির চিহ্ন তাতে আব সন্দেহ থাকে না। প্রভাতকুমার সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবার আশ-প্রকাশ কবলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে তাঁর পত্রিকায় যে কবিতাকে স্থান দিয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে সেটি নিতান্ত শিক্ষার্থীর রচনা নয়। বাল্যকাল থেকেই প্রভাতকুমার কবিতার চর্চা কবেছেন তার প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণও দেওয়া যায় যার থেকে দৃঢ় অনুমান হয় যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পবিচয় হয় এবং তাঁকে ‘আদর্শ’ বলে ধরে নিয়েই তিনি কাব্যবচনা করতে আবমু করেন। পয়ার ত্রিপদী মাত্র নয় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নূতন নূতন ছন্দ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ‘মানসী’র ভূমিকায় কবি বলেছেন, “মানসীতেই ছন্দের নানা খেলা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবিব সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।” প্রভাতকুমার রবীন্দ্র কাব্যের অনুবাগী পাঠক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। পাঠক হিসেবে তাঁর যে কেবল অনুরাগই সম্বল ছিল তা নয় বিচারবুদ্ধিও ছিল সুতীক্ষ্ণ। তাঁর গোড়ার দিক্কার কবিতাতেও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দের প্রয়োগপরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ

সম্বন্ধে কৌতূহলী নবীন লেখকের একটি মুদ্রিত কবিতার নাম ‘চিবনব’।^১ ব্রজেনবাবু (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫৪) মনে কবেন এইটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। প্রথম না হয়ে পঞ্চম হলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু এটি যে তাঁর ১৭ বছর বয়সের পূর্বে রচিত নয় তাতে সংশয় নেই কাবণ “ভাবতী” ও বালক” পত্রিকার ১২৯৭ সালেব কার্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটির ছন্দেব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করে দেখাই।—

ক্রমশঃ শ্বাখানি	সজীব হয়ে উঠে,
যে যার কায় পানে	সকলে যায় ছুটে।
লোহিত রঙ মাখা	যে দিকে নভঃখানি,
সে দিকে চেয়ে থাকি	উঠিবে দিনমণি।
হেবিয়া সেই শোভা	মোহিত হয়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া	ভরিয়া যায় জাঁখি।
বিষাদে দিনমণি	ক্রমশঃ লাল লাল,
সরোজি কাঁদে বসি	রাঙিয়ে ছুটি গাল।
গাভীবা মাঠে থেকে	আবাসে আসে ফিরে,
কৃষক তার পাছে	লাঙল লয়ে শিবে।
পাখীরা গাছে বসে	পূরবী গেয়ে গেয়ে,
ঘুমায়ে পড়ে তুরা	মাথাটি নীড়ে থুয়ে।

ছন্দটি সাত মাত্রার, তিন-চার তিন-চার কবে। লাইনে চোদ্দ মাত্রা থাকলেও পয়ার নয়। এই ছন্দ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছন্দ’ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেটি এই :—

তরুণী বেয়ে শেষে	এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই	জলে না দিন কাটে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বালক প্রভাতকুমারের কবিতার ছন্দেব সঙ্গে এব কোনো তফাৎ নেই। ববীন্দ্রনাথ দুইমূলক সমমাত্রার সঙ্গে তিন মূলক অসমমাত্রার পার্থক্য দেখানোর জগ্বে এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। পয়ার চলে দুইমাত্রার চালে, এর চাল তার বিপরীত। এব পা ফেলার ভাগ অসমান। “এর এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পবে একটা করে যতি আছে। কিন্তু বিজোড অঙ্কেব অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্য সমস্ত পদটাব মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দেব স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতাব সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জগ্বেই এই বকম ছন্দেব রচনা।”

এ ছন্দ নবীন শিক্ষার্থীৰ ব্যবহারযোগ্য নয়, ববীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট

বোঝা যায়। কিন্তু প্রভাতকুমার তাঁর পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

এই ছন্দ ববীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সে অনুমান অস্বাভাবিক নয়। ‘বধু’ কবিতাটির কথা ভাবুন। বধু পুর্বোপরি এই ছন্দে রচিত না হলেও, সাত মাত্রার প্রয়োগ এতে বহুল পরিমাণে করা হয়েছে। যেমন—বেলা যে পড়ে এল, পূর্বানো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূবে, কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে বাঁধাঘাট, ছিলাম আনমনে, একেলা গৃহকোণে, কে যেন ডাকিলরে, ইত্যাদি। ‘বিবহানন্দে’ কবিতাটিও স্মরণযোগ্য। এখানেও সাতমাত্রার ব্যবহার হয়েছে এবং লাইনের উভয় অর্ধেই সাতমাত্রার ব্যবহার, তবু উভয় অর্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত দিই।—

ছিলাম নিশিদিন	আশাহীন প্রবাসী
বিবহ তপোবনে	আনমনে উদাসী।
আঁধাবে আলো মিশে	দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ু বশে	উঠিত সে উছাসি।

প্রতি লাইনের প্রথমার্ধে ৩+৪, দ্বিতীয়ার্ধে ৪+৩। প্রভাতকুমার প্রথমার্ধের মাত্রা বিভাগ উভয়ার্ধেই প্রয়োগ করেছেন।

১৩০১ সালের মায় সংখ্যা সাধনায় তাঁর কবিতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই—কবি হিসাবে সাহিত্য সমাজে প্রভাববানুব পবিচয় অবশ্যই ঘটেছিল। তার পূর্বে নানা পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় কবি হিসেবে তিনি তখনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ববীন্দ্রনাথের প্রেরণায় গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হবার পবেও প্রভাতকুমার কাব্য চর্চা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিবর্তন হন নি। ১৩০৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা ‘ভাবতী’তে—‘অভিশাপ’ নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বি এ পরীক্ষা দিয়ে যখন কবনিকের চাকরি নিয়ে সিমলায় যান তখনও কবিতা লেখা চলছে, এবং ভাবতী পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা ববীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাচ্ছেন। ববীন্দ্রনাথ ভাবতীতে সে কবিতা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেছেন। ববীন্দ্রনাথ লিখিত একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি।—

“প্রিয় ববেয়, আমি এখন একটি ছোট নদী উপরে, বোটে। বর্ষা তাঁহাব সমস্ত বিপুল উপকরণ লইয়া বাঙ্গালাব এই প্রান্তবর্তী নবোদগত ধাতাজ্বব পুলকিত পল্লীটির উপব আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে—এখানে তাহাই লইয়া জলে স্থলে আকাশে যে ধুম পড়িয়া গিয়াছে তোমাদেব সিমলাব বাজদপোদ্ধত শিখরে তাহাব বেশি আব কি হইবে ?

তোমাব এবাবকাব কবিতা আঘাটেব ভাবতীতে ছাপাব জন্য পাঠাইলাম এখনো যদি জায়গা থাকে তো বাহির হইবে—নতুবা পবেব ট্রেন, শ্রাবণেব ‘ভাবতী’ব জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।” এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে এই সিমলায় অবস্থানের সময় তিনি ‘সিমলা-শৈল’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি চিত্র-সহযোগে ১৩০৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা প্রদীপে প্রকাশিত হয়েছিল।

294079

যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমার কবিতার স্বর্গ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে গল্পের মর্ত্যলোকে অবিস্মরণীয় আসন গ্রহণ করলেন। প্রভাতবাবুর প্রথম গল্পসংকলন 'নবকথা' প্রকাশিত হল ১৩০৬ সালে (১৮৯৯)। এতে সর্বসুদ্ধ এগাবটি গল্প ছিল, রচনাব কাল—১৩০৩ থেকে ১৩০৬।

বাব বছর পবে 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের সাহিত্য সৌহার্দ্য তখনও অব্যাহত আছে, বং আবও ঘনীভূত হয়েছে। 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেবোলে প্রভাতকুমার একখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাব প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লেখেন—

“ভাবিলাম সব গল্পই তো পূর্বে পড়া হইয়াছে ইহা আর পড়িব কি? অত্যাশ্চর্য সাধারণ লোকের মত অপূর্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না, তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে শুক করিলাম—দেখিলাম মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন আবিষ্কার কবিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসিব হাওয়ায় কল্পনাব ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভাব আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব কবিতার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন। তোমার গাণ্ডী হইতে তীরগুলি ছোট যেন সূর্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারী—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে। বুকেব মধ্যে গিয়া প্রবেশ কবে না। যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণেব পাঠকেবা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভিড করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।”

প্রভাতকুমারের শিল্পপ্রতিভা তাঁকে কালজয়ী কবেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভাই তাঁব সাফল্যের একমাত্র কারণ নয় তাব সঙ্গে অবিবাম সাধনাও ছিল। যে-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন তাকে সর্বাসুন্দর করবাব জগে তাঁব চেষ্টা ছিল নিরলস। এবং তাঁর সে চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সহায়তার কখনো অভাব হয় নি। ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে লিখিত একটি পত্রে প্রভাতকুমার প্রশ্ন কবেছিলেন,—“ছোট গল্পে কথোপকথনের মাত্রা কতটা indulge করা যাইতে পাবে? কোনও একটা মনেব ভাব ফুটাইতে হইলে, লেখক নিজের জবানী সেটাকে জানায়, কিংবা পাত্র পাত্রীব মুখে পাঠককে জানিতে দেয়। কোনটা প্রশস্ত? অবশ্য দুই চাই। এ সম্বন্ধে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পাবে না। আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাসা কবিতেছি, কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে নাটকের province encroach কবা স্বকপ পাপ স্পর্শ কবে কি না, আমার গল্পে আমি যতটুকু কথোপকথনের আশ্রয় লই, তা too little কিম্বা too much যে side—এই হউক, দোষের বিবেচনা করেন কি না, সংশোধন আবশ্যক মনে করেন কি না।

“দেখুন কোনও একটা complex মনেব ভাব ফোটানো, তাহা action এবং

কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় না কি? লেখক তাহাকে আগাগোড়া delineate করিতে চেষ্টা করিলে হয়তো একটু tedious হয়। আপনি কি মনে করেন?” লেখক পত্রের উপসংহাৰ করেছেন এই ব'লে, “আমাব ভারি ইচ্ছা আপনি ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।”

এ পত্রের উত্তরে ছোট গল্প বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ আসে নি, কিন্তু তার বদলে এসেছিল একটি স্নেহ-উপহাৰ—সদ্য প্রকাশিত ‘কাহিনী’ কাব্যগ্রন্থের একটি প্রতিলিপি।

প্রভাতকুমার এই উপহাৰের প্রাপ্তিস্বীকার কবে যে চিঠি লিখছেন তাতে বলছেন,—

“আপনার স্নেহ উপহাৰ ‘কাহিনী’ প্রাপ্ত হইলাম। ‘কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ’ অতি সুন্দর লাগল। দেবী ‘ভাবতী’-র পুরোহিতাকে (সবলা দেবী) উৎকোচ দিয়া ‘চিবকুমার সভা’ পাণ্ডুলিপিতেই পড়িয়া লইয়াছি। উহা মধু এবং গুড় কোনওটাতেই পড়ে নাই বটে, কাবণ উহা নেবু দেওয়া বরফ দেওয়া সববত।”

চিবকুমার সভা নামক সামাজিক গল্পটির মধ্যে প্রভাতকুমারের প্রশ্নের বোধ হয় আংশিক উত্তর আছে। এই গল্পে কথোপকথনের পরিমাণ খুব বেশী। প্রভাতবাবু ভাষায় বলব গল্প এখানে নাটকের province-এ অনেকখানি encroach করেছে। এতখানি encroach কবেছে যে এই বইটির নাট্যরূপ দেওয়া খুবই সহজ হয়েছিল।

যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বালক প্রভাতকুমারের ব্যাকুলতা অস্ত ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহ ও সম্প্রীতি তিনি অজস্র পরিমাণে লাভ করেছিলেন।

সাহিত্য-সাধক চরিত্র মালা

(বঙ্গীয় সাহিত্য সাধকগণের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়)

১ম—১১শ খণ্ডের মোট মূল্য ৯০.০০ টাকা

পৃথকভাবে ১১১ খানি পুস্তক এবং প্রত্যেকটি খণ্ডও বিক্রীত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

(ফোন : ৩৫—৩৭৪৩)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : (১৮৭৩—১৯৩২)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোট 'গল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমারের দান অবিস্মরণীয়। ভালো লেখক মাত্রেরই একটি নিজস্ব ভঙ্গী থাকে, প্রভাতকুমারেরও আছে। সেটি কি, নির্দেশ করা কঠিন। ববীন্দ্রনাথের 'ক্ষুণ্ণিত পাষণ'-এর মতো কল্পনার ঐশ্বর্য বা 'অতিথি'র মতো সূক্ষ্ম সঙ্কেত তাঁর গল্পে নেই। কিন্তু একটি স্নিগ্ধ সর্কোতুক ঘবোয়া পবিত্র গল্পের পাত্রপাত্রীকে যেন সহজে মনের কাছে নিয়ে আসে, বিনা আড়ম্বরে চিনিয়ে দেয়। গল্প বলবার কোশলটি তাঁর এমনি আয়ত্ত যে যা নিয়েই বলুন, শ্রোতাকে বশ কবে নিতে তাঁর দেবি হয় না। তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই ঘটনা নির্ভর। আজকালকার গল্পে অনেক সময়ে 'গল্প'ই খুঁজে পাই না। বাহাদুরির চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দেয়। অবাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ, অসুস্থ চিন্তার উত্তেজনা মনোবিকারের সুদীর্ঘ বিবরণ—পাঠকের মনকে অযথা ক্লিষ্ট করে তোলে। যাকে একালে 'চেতনা-প্রবাহ' বা 'স্ট্রীম অব্ কন্‌শাস্‌নেস্' বলি, তাবও দৃষ্টান্ত পাই অনেক গল্পে। অসাব্য বিবরণ চলেছে পাতার পব পাতা। না আছে ঘটনার আকর্ষণ, না আছে চবিত্তের দীপ্তি, না আছে জীবন-বসেব স্বাদ। এতে হৃদয় তৃপ্তি পায় না। বুদ্ধিবিলাসী হয়তো বলবেন, হৃদয়ের সাহিত্য এ যুগের জন্ম নয়, এ যুগ বিচার-বিশ্লেষণের। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণও যে খেয়ালের খেলা নয়, তাই বা ক'জন মনে রাখেন? ভূয়োদর্শন বা প্রভূত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যথার্থ বিচার সম্ভব। পুঁথির পাতা বা শব্দ-সমষ্টি কোনও মর্যাদা নেই সাহিত্যে, যদি না তাতে অন্তরের স্পর্শ পাই।

যাই বলি, সাহিত্য নিছক পবীক্ষা-নিরীক্ষার বস্তু নয়। জীবনের ছবি তাতে দেখতে চাই, জীবনের বস উপভোগ কবতে চাই। প্রভাতকুমারের গল্পে তাবই আয়োজন।

*

*

*

সংক্ষেপে তাঁর জীবন কথা স্মরণ কবি। ১৮৭৩ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১২৭৯ সাল, ২২ মাঘ, বর্ধমান ধাত্রীগ্রামে-মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার গুরুপ গ্রামে। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় সামান্য বেল-কর্মচারী ছিলেন। প্রভাতকুমার জামালপুর স্কুল থেকে এক্ট্রান্স এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ্., এ. ও বি. এ পাস করেন। অতঃপর কিছুদিন শিমলায় সরকারী অফিসে এবং কলকাতায় ডিবেক্টব জেনারেল অব টেলিগ্রাফ্‌স্-এর অফিসে কেবানি গিবি করেন।

এফ্. এ. পাসের পূর্বেই ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু ছ' বৎসরের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। তিনি আবার বিবাহ করেন নি। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সম্পাদিকা সরলা দেবী তাঁর প্রতিভার অনুরাগিনী ছিলেন। উভয়ের বিবাহের কথাবার্তাও নাকি হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি।



ব্যাবিস্টাবি পড়ার উদ্দেশ্যে প্রভাতকুমার কাউকে কিছু না জানিয়ে বিলেতে পাড়ি দেন। পাস্ ক'বে এসে দার্জিলিঙে, রংপুরে এবং শেষে গয়ায় প্র্যাকটিস্ করেন। এ কাজে তাঁর মন বসেনি। নাটোবের মহারাজ জগদিল্লনাথ রায় মহাশয়ের আস্থানে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রের সহযোগী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে সাহিত্য সেবাতেই তিনি একান্তভাবে মন দিয়েছিলেন। শেষের দিকে প্রায় ষোলো বৎসর তিনি ল' কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্যাবিস্টাবিতে তাঁর মন বসুক বা না বসুক, তাঁর বহু গল্প উপন্যাসেই উকিল বা ব্যাবিস্টাবের সাক্ষাৎ পাই, আর পাই সংসারের নানাবকম মানুষ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতাব পবিচয়।

*

*

*

বহু বাঙালী সাহিত্যিকের মতো তিনিও সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। ভাবতী, দাসী, প্রদীপ প্রভৃতি মাসিক পত্রে তার অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

তাবপরে লেখেন গল্প ও উপন্যাস। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ছোট গল্পে। কোনোটি হাস্যমধুর, কোনোটি অশ্রুচকরণ। মজাব মজার ব্যাপার তাঁর গল্পে প্রায়ই ঘটতে দেখি, অথচ সেগুলি অবাস্তব বা কণ্ঠকল্লিত নয়। যেমন, 'আত্মতত্ত্বে' ডি. সুজা সাহেবের কাণ্ড। তিনি বেলের গার্ড। প্যাসেঞ্জার-গাড়ি নিয়ে চলেছেন। ব্রেকভ্যানে অসংখ্য ল্যাংড়া আমের ঝুড়ি। সকালের খাওয়াটা ভালো হয় নি, ক্ষিদেও পেয়েছে, পাকা আমের গন্ধে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ঝুড়ি থেকে আম বেব করে, কিছু খেয়ে, কিছু বিলিয়ে, শেষ পর্যন্ত টুকবো পাথর দিয়ে আবার ঝুড়ি ভর্তি করে ডিউটি শেষ করে তিনি বাড়ী ফিবলেন। পরদিন তাঁর মা জানালেন, তাঁর হবু স্বশ্রব এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুড়ি খুলে পাওয়া গেল শুধু পাথরের টুকবো। গার্ড সাহেব আম বাব ক'বে নেবাব সময় তো লেবেলের দিকে তাকাননি, যে ঝুড়ি তাঁরই কাছে আসছিল। তারই থেকে হ'হাতে আম বিলিয়ে এসেছেন এবং নুড়ি দিয়ে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ কবেছেন। এমন কবে নিজেই নিজের হাতে জঙ্ক হবেন, তা কি আব জানতেন?

'মাস্টার মশাই' সুপরিচিত গল্প। ইংবেজী শিক্ষার প্রথম যুগে দুই গ্রামে ইংরেজী স্কুল খোলা নিয়ে রেযাবেষি। কোন্ গ্রামে ভালো ইংবেজী জানা মাস্টার এসেছেন, তা নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নন্দীগ্রামের হাবান চক্রবর্তী আর গৌসাইগঞ্জের ব্রজগোপাল মিত্র। দু'জনেরই মুখে ইংবেজীর খই ফোটে। কে বেশী জানে, তার পরীক্ষা হবে দুই গ্রামের অধিবাসীদের সামনে, সীমান্তবর্তী বটগাছতলায়। গ্রামবাসীরা যদিও ইংবেজী জানেনা, তবু কে কার প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবলেন বা না পাবলেন, তা তো বুঝতে পাববে! হারান মাস্টার প্রশ্ন কবলেন, 'হর্নস্ অব্ এ ডিলেমা' অর্থ কি? বেজে মাস্টার বলে দিলেন, 'উভয়-সঙ্কট'। কিন্তু বেজো মাস্টারের প্রশ্নে হাবানমাস্টার কুপোকাৎ। 'আই ডোন্ট নো' মানে যেমনি তিনি বললেন, 'আমি জানি না', অমনি গৌসাই গঞ্জের লোকেরা চৈতৈয়ে উঠল,

দুয়ো দুয়ো; জানেনা, বলতে পাবেনি। আসল রহস্য নন্দীগ্রামের লোকদের বোধগম্য হ'লনা। সভা ভেঙে গেল। হাবান মাস্টার মুখ চুপ করে বিদায় নিলেন।

আবার, 'বসময়ী বরসিকড়া'। বাক্যজালায় স্বামীকে ঘরছাড়া ক'রে বসময়ী পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ক্ষেত্রমোহনও সংকল্প করলেন, আব সাধামাধি নয়, তিনি অশুভ্র বিবাহ কববেন। কিন্তু যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সেখানেই বসময়ী গিয়ে ভাঙ্টি দেন, উৎপাত শুরু করেন : মাস ছয়েক পবে বসময়ীর মৃত্যু হল। বিয়েব উদ্যোগ চলেছে। ক্ষেত্রবাবু ভেবেছিলেন, এখন তাঁব পথ নিষ্কটক। কিন্তু অকস্মাৎ বিনামেষে বজ্রাঘাত। একেব পব পর এক বসময়ীর হাতে লেখা চিঠি আসতে লাগল। তার সারমর্ম : বসময়ী বটগাছে বাসা বেঁধেছেন। বিয়ে কবলে বক্ষে নেই, বাসব ঘবে তিনি আগুন লাগিয়ে দেবেন এবং ক্ষেত্রবাবুর ঘাড মটকে খাবেন। অদ্ভুত ভূতুড়ে বহস্য। পবে জানা গেল, নানা অবস্থা কল্পনা ক'বে কতকগুলি চিঠি লিখে বসময়ী তাঁব ছোট ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং সময়মত এক একখানি ডাকে ছাডতে নির্দেশ দিযেছিলেন। তা থেকেই বহু বোমাধকব পবিস্থিতির উদ্ভব।

'বলবানু জামাতা'ও চমৎকার হাসির গল্প। নলিনীভূষণ সুদর্শন, কিন্তু তাঁব নামও যেমন মেয়েলি, চেহারাটিও তেমনি। দিব্য কোমল, নধব কান্তি। তা নিয়ে বিয়ের সময় বিহুয়ী শ্যালিকা ছড়া বেঁধেছিলেন। নলিনীব মনে মনে রাগ হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন, শরীব ভালো না ক'রে আর তিনি শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। নিয়মিত ব্যায়াম এবং পুষ্টিকব খাদ্যে দেহ মজবুত হ'ল, হাতেব পেশী শক্ত হ'ল, তার উপব, তিনি গালপাট্টা দাডি বাখলেন। বহুদিন শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হয়নি। ডাক-বিভাগের চাকুরি, দু' তিনবার চেষ্টা ক'বেও ছুটি পাননি। অবশেষে যখন ছুটি পেয়ে গেলেন, তখন বিভ্রাট ঘটল। তিনি টেলিগ্রাম ক'বে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁব যাবার খবব যথাসময়ে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছায়নি। এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী। সে শহরে তখন দু'একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। গালপাট্টাওয়ালাকে এক পালোয়ান জামাই পবিচয় দিয়ে দেখা করতে চায়, শুনে বাড়ীব কর্তাব সন্দেহ হ'ল, এও ডাকাতি। তিনি দাবোয়ানকে লুকুম দিলেন, লোকটাকে তাডিয়ে দিতে। ক্ষুব্ধ চিত্তে নলিনী ফৈশনে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রামটি এলো। মেয়েরা বললেন, তা হ'লে হয়তো জামাই-ই এসেছিল। 'তাই তো, তাই তো' কবতে করতে কর্তা জামাতা বাবাজীকে ফিবিযে আনতে গেলেন। মান অভিমান অন্তে মধুর মিলনে গল্প সমাপ্ত হ'ল।

এমন বহু গল্প আছে, যাব আখ্যান নতুন ধবণেব, বর্ণনা সহজ সরল অথচ অব্যর্থ যাতে পাঠকেব বুদ্ধি পরীক্ষার মতলব নেই, অনাবশ্যক ভনিতা নেই, মনের আনাচে কানাচে অবৈধ প্রবৃত্তি খুঁজে বেড়াবাব চেষ্টা নেই। অনাড়ম্বর বলেই এ গল্প এমন তৃপ্তিকর। কেবল হাসিব গল্প নয়, ককণ গল্পও তাঁব অনেক আছে। সেগুলিও সাবলীল এবং মর্মস্পর্শী।

‘ভিখারী সাহেব’ একটি অসামান্য কাহিনী। ইতব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার অনবদ্য উজ্জ্বল-চিত্র ‘স্বাদরিনী’। মানুষ তার পোষাহাতীকে ভালোবাসে, হাতীর ভালোবাসাও যে কত গভীর ও আন্তরিক হ’তে পারে, তার নিদর্শন এ গল্পে আছে।

‘দেশী ও বিলাতী’ নামক গল্প-গ্রন্থ এক সময়ে খুব খ্যাতি অর্জন ক’রেছিল। এব দশটি গল্প দেশীয় জীবন-চিত্র, আর চা’বটির ঘটনাস্থল বিলেত। বহির্দেশের কথা নিয়ে গল্প বোধহয় বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন। বিষয়ের নূতনত্বের জন্য শেষোক্ত গল্পগুলি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক’বেছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটশ—তেবোখানি ছোটগল্পের সংগ্রহ, চৌদ্দখানি উপন্যাস আর ‘অভিশাপ’ নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য। তা ছাড়া বারো জনের লেখা ‘বারোমাসী উপন্যাস’-এর তিনটি পবিচ্ছেদ তাঁর লেখা। ‘বিলাত-ভ্রমণ’ তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেবিষেছিল। কবিতা এবং সমালোচনা প্রবন্ধও তিনি অনেক লিখেছিলেন। তাঁর বহু বচনা বিভিন্ন মাসিকপত্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘বমাসুন্দরী’তে পাই একটি দুবস্ত গ্রাম্য মেয়ের মনোরম চিত্র। ‘রত্নদীপ’-এ গার্হস্থ্য জীবনকে ঘিবেছে জটিল চক্রান্ত জাল। ‘সিন্দূর কোটা’য় বাঙালী খ্রীষ্টান মেয়ের আন্তরিক মাধুর্য ও ঔদার্যের কাহিনী। ‘নবীন সন্ন্যাসী’তে আদর্শবাদী সংসার-বিরাগী যুবকের পবিত্র প্রেম পারিপার্শ্বিক গ্লানি-মলিনতাকে লজ্জিত করে আপন মহিমা উদ্ভাসিত। ‘মনের মানুষ’-ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক, আপাত অলৌকিক রহস্য শেষ পর্যন্ত বাস্তব ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এসেছে। কোনও সামাজিক আদর্শ প্রতিপাদন বা তত্ত্ব-উদ্ঘাটন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্রতিটি কাহিনী ঘটনা-বিস্তার ও সহজ স্ফুটনায় উপভোগ্য।

তাঁর জন্মের শতবর্ষ-উপলক্ষে এই স্মরণ-সভার আয়োজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। বিশেষতঃ এ কথা স্মরণীয় যে তাঁকে সহকারী সভাপতিত্বপেঁ পেয়ে পবিত্র একদিন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিল।*

* পরিষদ-ভবনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে

শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রগতির চাকা ঘুরছে, তার সঙ্গে তাল বেখে চলতে গেলে সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া আমাদের অণ্ড উপায় নেই। এ বিষয়ে অধিক লেখাব প্রয়োজন নেই। কি কি উপায়ে আমরা নিজেদের নিযুক্ত করব সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। আমরা এই প্রবন্ধে আর একটি মাত্র উপায়ের কথা আলোচনা করছি।

বিজ্ঞানের কোন জাতি নেই, আন্তর্জাতিক সীমারেখা নেই। দ্রুত ভাব বিনিময়ের ফলে নবতম বিজ্ঞান ধারণাকে আত্মসাৎ করতে কোন বাধা নেই—এব জগৎ অনুবাদ হল সহজতম পন্থা। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য তথ্য পরিবেশন। এক্ষেত্রে বচনা শৈলী বা ভাষার সৌকর্য্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। লেখক এক্ষেত্রে গোণ বা উছ, তাঁর বক্তব্যটাই একমাত্র বিবেচ্য। এজন্য মনে হতে পারে বিজ্ঞান অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। এটা সর্বাংশে সত্য বলা যেতে পারে না। বিজ্ঞান অনুবাদের ভাষা এত স্পষ্ট হওয়া দরকার যাতে কোথাও ব্যাখ্যা বা টিকা টিপ্তনীর প্রয়োজন না হয়। এমনকি দ্ব্যর্থবোধক শব্দও এখানে অচল। অভ্যস্ত শব্দ সংযত এবং বলিষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞান ধারণা অনুবাদের পক্ষে সহায়ক। এই অনুবাদের ভাষা হওয়া দরকার সমগ্র ব্যঞ্জনাবাহী ও নিখুঁত। সর্বাঙ্গীন অর্থ এবং দ্বারা প্রকাশিত হবে। এই ভাবে অনুবাদ যে দুকহ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। নিখুঁত প্রতিলিপি বোধহয় একমাত্র বিজ্ঞান প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে পদার্থ বিজ্ঞানের ‘ইনটারফিয়ারেন্স’ কথাটি। এর অর্থ একটাই—তার বেশী নয়। সুতবাং পরিভাষাও একটাই হবে—একাধিক নয়। ভগবদ্গীতার নাকি একশো ত্রিশটি বিভিন্ন ইংবাজী অনুবাদ আছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক লেখাই কখনো একবারেব বেশী দুবার অনূদিত হয় না, কারণ তার ব্যাখ্যা মাত্র একটি।

নানা কাবণে বৈজ্ঞানিক বচনার অনুবাদ মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে চিন্তার বিনিময় আজকাল অত্যাৱশ্যক এবং উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে আরও অধিক। নিজস্ব ক্ষেত্রে অথবা সম্পর্কিত অণ্ড বিষয়গুলিতে নতুন কি জ্ঞান সংযোজিত হল জানতে হলে একজন ভাবতীয় বিজ্ঞানীকে অণ্ড ভাষার শব্দগাপন্ন হতেই হবে। যদিও আমাদের জ্ঞানীসমাজে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কবেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয় কিন্তু ইংবাজি, জার্মান, রাশিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষা না জানা তাঁব নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণেব প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত। একজন সমসাময়িক জাপানী কবির বচনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে না পৌঁছলে হয়ত ততটা ক্ষতি হবেনা যতটা হবে আজ জাপানীরা ‘ফার্ম ব্রিডার

রিয়াক্টর' জাতীয় পবমাণু প্রয়োগ কৌশলে নতুন কি উপায় উদ্ভাবন কবেছেন সেটা অবিলম্বে জানতে না পাবলে, আমরা নিজেবা যখন বিয়্যাকটর নির্মাণকাজে হাত দিয়েছি এবং যখন আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তি উৎপাদন ও গবেষণার পক্ষে তাব গুরুত্ব অপবিসীম তখন এ বিষয়ে সববকম ব্যবহৃত পদ্ধতি না জেনে আমাদের পক্ষে সহজতম এবং সুলভতম পস্থা খুঁজে বার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বলাই বাহুল্য এই সব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছবার একমাত্র উপায় দ্রুত ও সুষ্ঠু অনুবাদ। অত্যাথ্য আমাদের যে কোন উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প অনেক বেশী—ব্যয়সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পাবে।

বৈজ্ঞানিক বচনাকে মোটামুটি ভাবে চাবটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—

- (১) স্নাতকোত্তর, গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়
- (২) কলেজ পর্যায়
- (৩) স্কুল পর্যায়
- (৪) লোকপ্রিয় বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক রচনার পাঠক নানা শ্রেণীর। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র, জীবিকার দিক দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন জনসাধারণ যঁাবা কেবল কৌতূহল নিবারণের জন্য বিজ্ঞান পড়তে চান, অথবা বিশেষজ্ঞ যিনি সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করেন এবং অপরাপর ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ইত্যাদি নানাবিধ পাঠকের কথা অনুবাদের সময় মনে রাখা প্রয়োজন। তবে একটা বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই সেটা হল সর্বসম্মত ও স্বীকৃত পবিভাষার ব্যবহার।

এখন স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা পর্যায়ে যাবতীয় কাজকর্ম ইংরাজীতেই সম্পাদিত হয়। অত্যাথ্য ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ নিয়ে বিশেষ কোন সমস্যা নেই—তা বছদিন ধবে হয়ে আসছে এবং এই কাজ সম্পন্ন কবাব জন্য সবকাবী সংস্থাও আছে। পবমাণু শক্তি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিজেদের অনুবাদক থাকে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা বাখতে হয়। এরকম সম্মেলন ভারতে যদিও হয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত ভাষা সব সময়েই বিদেশী। আঞ্চলিক ভাষায় এযাবৎ হয় নি।

কলেজ পর্যায়ে ইংরাজীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার কবার জন্য ক্রমাগত দাবী আসছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এই দাবী মেনেছেন, কেউ বা মানতে প্রস্তুত নন। কাবণ হিসাবে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব। স্কুল পর্যায়ে অবশ্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান আবস্ত হয়েছে এবং পাঠ্যবইও পাওয়া যায়।

অনুবাদের আসল প্রশ্ন হল মূল ভাষা থেকে গ্রাহক ভাষার একটি ভাবেব স্থানান্তর করণ। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন গ্রাহক ভাষা সেই ভাবে ধারণ কবার উপযুক্ত

অর্থাৎ তার শব্দ সম্ভাব এবং শক্তি এমন যে অনায়াসে তাকে যথেষ্ট ব্যবহার করা যায়। ভাবভীষ্য কোন ভাষাই এখনো সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম কিনা এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তার অবস্থা একটা ঐতিহাসিক কাণ্ড আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় ভারতের মাটিতে ছিল না, তাকে বিদেশ থেকে বোপণ করা হয়েছিল। এদেশে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও বিস্তার হল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হলেও আপাততঃ আমরা আমাদের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুবাদের সমস্যা এই দিকেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বিজ্ঞানের বিলম্বিত বিকাশের অবশ্যস্বার্থী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশে। এই শতাব্দীর, এবং ভাল কবে বলতে গেলে গত কয়েক দশকের দ্রুত বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে আমাদের ভাষাগুলি ভাল বাখতে পারে নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই সত্য গোড়াতে স্বীকার কবে নেওয়া ভাল, কাণ্ড ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হলে এদিকে যা করণীয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়বে না। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইত্যাদি কথা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। আমরা যখন ভাষা নিয়ে গর্ব করি তখন বোধ হয় ভুলেই যাই যে কেবল গল্প উপন্যাস কবিতা দিয়ে কোন ভাষার সর্বাঙ্গীন পুষ্টি সম্ভব নয়—প্রবন্ধের ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দাবলীও ভাষার শবীর গঠনে কম সহায়ক নয়। এই দিকে এখন মোহমুক্ত দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যে বিরাট কর্ম কাণ্ডে আয়োজন চলেছে এবং ভবিষ্যতে আবার প্রসারিত হবে তাতে কোন না কোনভাবে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ জড়িত হচ্ছেন। এই জনসমষ্টি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বা সমাজের উপরের স্তরের লোক নন—এঁদের মধ্যে সর্বস্তরের লোক আছেন যাদের কাছে এটি জীবিকার প্রশ্ন—এঁদের অনেকের কাছেই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার অর্থ সময়ের অপচয়—সেইজগৎই আজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অনুবাদের প্রশঙ্গ এত জরুরী।

অনুবাদের কাজে সর্বপ্রধান সমস্যা হল পবিভাষা—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সর্বসম্মত পবিভাষার অভাবে ইচ্ছামত শব্দ তৈরী করা হয়ে আসছে যেমন রবীন্দ্রনাথ ইনফ্রা বেড্ ও আলট্রা ভায়োলেটকে বাংলায় লিখেছিলেন লাল উজানী ও বেগুনী পারেব আলো। কথা দুটি বাংলায় বিশেষ চলেনি। পবিবর্তে যা বহুল ব্যবহার হয়ে আসছে তা হল অবলোহিত ও অতিবেগুনী। সেইবকম পজিটিভ ও নেগেটিভকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন হাঁ- ধর্মী ও না—ধর্মী। এক নিউক্লিয়াস কথাটির বাংলায় নানাবিধ রূপ দেখা যায়, যথা অণু, পরমাণু, কেন্দ্র ও নাভি। পরিশিষ্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে এই সমস্যাটো স্পষ্ট হবে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাংলায় যাকে অণু বলা হয় তা হল মলিকিউল এবং পরমাণু হল অ্যাটম—এটাই সর্ববাদীসম্মত পরিভাষা। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও যে অণু পরমাণুতে গোলমাল কবে ফেলেন সেটা খুবই দুঃখজনক।

১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পাবিভাষাব একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তবে বইটি এখন সহজলভ্য নয়।

বাংলায় অনুবাদ কবাব সময় উপযুক্ত বাংলা অভিধানের অভাবে পদে পদে হৌচট খেতে হয়। কোন বাংলা অভিধানেই পাবিভাষিক শব্দ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো নেই। এমনকি বর্তমানে যে সব পাবিভাষিক শব্দ চালু আছে শুধু সেগুলি সংগ্রহ করে কেউ যদি বাংলায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে একটি সঙ্কলন করেন তা হলেও অনুবাদক এবং সাধারণভাবে সমস্ত কৌতুহলী পাঠকই উপকৃত হন। অনেকে স্বীকার করবেন যে বহুল প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি, যেগুলির উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলায় নেই সেগুলির বদলে কোন নতুন অপ্রচলিত শব্দ সৃষ্টি না কবে সেই বিদেশী শব্দটিকে আত্মসাৎ করা অনেক দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়। আধুনিক হিব্রু ভাষা এই উপায়ে ক্রমাগত তাব শব্দসম্ভাব বাড়িয়ে চলেছে। কথাটাব যৌক্তিকতা অস্বীকার কবাব উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া। অর্থাৎ কেবল অ্যাটম শব্দটিই ইংরাজী থেকে নেওয়া হবে না অ্যাটমিক, অ্যাটমাইন প্রভৃতিও চলবে। না বাংলায় অ্যাটমীয়, অ্যাটমীকরণ প্রভৃতি চলবে। সুতবাং শব্দের বিভিন্ন রূপগুলি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার।

ভাষা বহুতা নদীৰ মত। তাব স্রোত কখনই থেমে থাকে না। গতিই জীবনের দ্যোতক। সুতরাং আমবা আশা কবতে পাৰি যে ভাষা তাব নিজস্ব প্রয়োজনে পথ সৃষ্টি কবে নেবে। কিন্তু এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলে এই স্রোত-স্বতীকে হয়ত অধিকতর কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করা যাবে।

পরিশিষ্ট

(১)

কালমান যন্ত্ৰেব ঞ্জবত্ৰেব বিষয়েও তাঁহাবা একই প্রকারে নিঃসন্দ্বিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ও প্রিসিপিয়াব গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিবপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপভূমি সকলের পক্ষে একই এবং তাহাব ধর্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বেব অপেক্ষা বাখে না, এই মতবাদেব উপর প্রতিষ্ঠিত গণিত শাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুইশত বৎসব সর্বগ্রাছ ছিল। যান্ত্রিক উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেব প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনাব মধ্যে নিত্যসামঞ্জস্য আছে কি না তাহাবই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্মমানের ক্ষেত্রে পবীক্ষা ও গণনাব মধ্যে যে অসঙ্গতি ধবা পড়িতে লাগিল, তাহাব নিরাকরণ আব পুরাতন বিজ্ঞানেব পক্ষে সম্ভব হইল না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

—বিজ্ঞানের সংকট

(২)

অশ্বখুর তড়িচ্চুম্বক—ইহাতে কাঁচা লোহাব বা কোন উচ্চ চৌম্বকীয় সংবেদন-প্রবণতা এবং নিম্নতম চৌম্বকীয় গতিশীলতা গুণবিশিষ্ট একটি নমুনা বডকে অশ্বখুরের আকাবে বেঁকাইয়া লওয়া হয় এবং উহার দুই বাহুব উপর অন্তবিত্ত তাব যথোপযুক্ত ভাবে জড়াইয়া একটি অখণ্ড সলিনয়েড গঠন করা হয়। এক বাহুব উপর তাব জড়ানো শেষ হইলে উহার মাথা ঐ বাহুব উপরের পৃষ্ঠ হইতে বাহিব হইয়া আসিয়া অশ্ব বাহুব তলা দিয়া ঢুকিবে এবং দুই বাহুতে তাব জড়ানোব পব তারের শেষ প্রান্ত বাহুব তলা দিয়া গিয়া বাহিব হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই যে, কোন সমপ্রবাহী তড়িৎপ্রবাহ এই অখণ্ড সলিনয়েডটিব তাবের মধ্য দিয়া চালনা করা হইলে, প্রান্তীয় দিক হইতে দেখিলে সলিনয়েডেব যে প্রান্তে তাবের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ি কাঁটার গতিব দিকে বহে, নমুনাদণ্ডেব ঐ প্রান্তে একটি চৌম্বকীয় দক্ষিণ মেরু এবং অশ্ব প্রান্তে চৌম্বকীয় উত্তর মেরু গঠিত হয়। তাব জড়ানোব পদ্ধতিটি এই ক্ষেত্রে তাই একটি বিশেষ বিষয় কপে-গণ্য হয়।

—পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্কুলপাঠ্য বই

(৩)

কির্ণ সূর্যের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচাৰ কবেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে :—সূর্যদেহের অভ্যন্তর একটি ঘনীভূত পিণ্ড—(Photosphere) আব উহার চাৰিদিকে একটি পাতলা বাষ্পের আবরণ (Chromosphere) আছে। এই আলোকমণ্ডল (Photosphere) ও বর্ণমণ্ডলের (Chromosphere) বর্ণচ্ছত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় কি না? উত্তরে বলা যায় যে, যদি আলোকমণ্ডলটি কোনওকপে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে আমরা শুধু বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পাবি। কিন্তু এ ব্যাপার সহজসাধ্য নয়। আমরা একটি গোল চাকতী নির্মাণ কবিয়া উহাকে এমনভাবে দূরবীক্ষণের সামনে স্থাপন করিতে পাবি যে, আলোকমণ্ডল সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ সূর্য আকাশেব যে অংশ অধিকাব করিয়া আছে শুধু যে সেই অংশ হইতেই সূর্যালোক পাওয়া যায় এমন নহে।

মেঘনাদ সাহা

—নবওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

ডঃ শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাজিলাল সম্পাদিত—

রামেন্দ্র রচনাসংগ্রহ

মূল্য—২৫.০০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

ফোন—৩৫-৩৭৪৩



রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল

শ্রীশ্রীকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথ জীবনের কবি, আনন্দের কবি। নিজেই তিনি স্পষ্ট কথায় স্বীকার করে গেছেন, 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। এ আনন্দ জীবনের আনন্দ, প্রাণের সরব নীবব অনুভূতির আনন্দ। চল্লিশ বছর বয়সে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'মবাব পরে চাইনে ওরে অমর হতে'। কিন্তু মৃত্যু তো বৃহত্তর জীবনের তোরণদ্বার। মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি, তবে মরণের পরে কোন স্বর্গলোক বা অমৃতধামও স্বীকার করেন নি। (ব্রহ্ম সঙ্গীতেব কথা এখানে ভুলে যাব।) পঞ্চাশ বছরের পর থেকে মাঝে মাঝে মৃত্যুব কথা তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু মর্ত্যধরার আলোছায়াব আলিঙ্গনে, হাওয়ায় দোলায়, বকুলেব সৌরভে, প্রাণের বিচিত্র প্রকাশে তাঁর মন ভবে রয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন তাঁর যে প্রাণ তা নিসর্গেব সঙ্গে বৃহৎ প্রাণেব সঙ্গে একতালে স্পন্দিত হচ্ছে। এ ব্রহ্মবাদ নয়, একে বলা যায় অভিনব মায়াবাদ। সহজ করে বলতে গেলে বলব লীলাবাদ। (অভিনব বলছি এই কাণে যে বৈদান্তিক মায়াবাদে জগৎ মরীচিকার মতো মিথ্যা, মায়া ব্রহ্মের যবনিকা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় জগৎ সত্য—সে যদি মায়া হয় তো তা ব্রহ্মেরই রূপ)। শিশুলীলায় যা কান্না হাসিব দোলা তারই প্রকারভেদ বর্ষায়ানিব ভাবনায় জীবন-মৃত্যুব পালা-বদল। 'যখন পড়বে না মোব পায়ের চিহ্ন এই বাটে' তখনও তাঁব সভা যে বৃহৎসত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্ম প্রাণের প্রকাশে মর্ত্যধরার খেলাব বস এইমতই উপভোগ করবেন—এ ভাবনা তাঁর বাহ্যিক বছর বয়সেই উদ্ভিত হয়েছিল। জীবনের অখণ্ড স্রোতে যেন গা ভাসিয়েই রবীন্দ্রনাথ অনুভব এবং কল্পনা করেছিলেন,

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।

করবে খেলা সকল খেলায় এই আমি।

নতুন নামে ডাকবে মোবে, বাঁধবে নতুন বাঁধব ডোরে

আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

এই গান এবং আবও কয়েকটি গান থেকে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁব বচনা সমগ্রভাবে বিচার করলে সে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তায় মিশে গেলে তাব পবে কী যে হয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্বাক।

ভবিষ্যতের আশ্বাস সত্ত্বেও গানটিতে ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ প্রকট হয়েছে ধূয়া পদে

তখন আমায় নাই বা মনে বাখলে,

তাবাব পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা ভোগেব ভালোবাসা নয়, মুখের ভালোবাসা নয়, ভোগ ত্যাগ সমান দৃষ্টিতে নিয়ে মুখ-দুঃখের তালে

তালে সমান ভাবে পা ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার আনন্দ। সে আনন্দ কোন প্রাপ্তিতে নয়, বিশুদ্ধ অনুভবে। এই অনুভব যদি ব্রহ্মানন্দ হয় তবে সে আনন্দ মানুষ-জীবনেই লভ্য, অন্য কোনও অধ্যাত্মলোকের অস্তিত্বে নয়। ‘কৃষ্ণেব যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা’—বৈষ্ণব কবির এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্পষ্টতর এবং আবও ব্যাপক হয়েছে। বিশ্বপ্রাণের আনন্দ প্রকাশ যে—আনন্দলোকে তা কবির চোখে কীভাবে ধরা পড়েছিল তা একটি গানে অত্যন্ত সহজে ব্যক্ত হয়েছে।

গানটি এই :

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।

সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥

গাছেরা ভবে নিল সবুজ পাতায়,

ধবণী ধবে নিল আপন মাথায়।

ফুলেবা সকল গায়ে নিল মেখে,

পাখিবা পাখায় তাবে নিল একে।

ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মাষের বুকে,

মাষেরা দেখে নিল ছেলের মুখে।

সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,

সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে।

সে যে ওই বিদীর্ণ বীব-হৃদয় হতে

বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।

সে যে ভাঙাগড়াব তালে তালে

নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তায় আলো প্রাণপ্রবাহেব, আনন্দধারাব, সিঞ্চন। হয়ত এই চিন্তাব বীজ পেয়েছিলেন তিনি বালাকালে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে।

জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে সে ভোজ্যে তিনি আকর্ষণ পবিপূর্ণ হয়েও পরিতৃপ্তি লাভ করেন নি, কেন না সে আনন্দের পবিত্রত্ব নেই, সেই আনন্দের অনুভবই জীবনরস-পান। এবং সে আনন্দযজ্ঞে তিনি ভোক্তাই ছিলেন না, ভোজ্যেব আয়োজনেও তিনি সুপকার ছিলেন। তাঁর আয়োজিত ভোজ্য মর্ত্যলোকে আমাদের আনন্দযজ্ঞের জন্তু ধরা হয়েছে। সে অতি সহজলভ্য, আমাদের হাতেব কাছেই রয়েছে—যদি চোখে পড়ে, মনে লাগে। এই ভাবনার সহজ প্রকাশ রয়েছে একটি পরিচিত গানে।

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।

শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,

ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলাব ডালি একলা সাজায়—

সামনে চেয়ে এই-যে দেখি চোখে আমার বীণা বাজায় ॥

আমার এয়ে বাঁশের বাঁশী, মাঠের সুবে আমার সাধন ।

আমার মনকে বেঁধেছে বে এই ধরণীর মাটির বাঁধন ।

নীল আকাশের আলোব ধারা পান কবেছে নতুন যাবা

সেই ছেলেদেব চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর হৃৎচোখ পুবে,

আমার বীণায় সুব বেঁধেছি ওদেব কচি গলাব সুরে ॥

দূরে যাবাব খেয়াল হলে সবাই মোবে ঘিবে থামায়,

গাঁয়ের আকাশ সজনে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায় ।

ফুঁবায় নি, ভাই, কাছের মুখা নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা—

এই-যে এ-সব ছোটো খাটো পাই নি এদের কুল-কিনাবা,

তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা ॥

লাগলো ভালো, মন ভালালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই ।

দিনে রাতে সময় কোথা, কাজেব কথা তাই তো এড়াই ।

মজেছে মন, সজল আঁখি— মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—

ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো ।

আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো ॥

এই গানটির মর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে পাবি যে সহজসিদ্ধি বলে যে কথা আমাদের পড়া আছে এবং যে শব্দের খাঁটি অর্থ আমাদের ঠিক জানা নেই, সেই সহজসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল । মাঠের সুরের সাধনায় তিনি সহজসিদ্ধ হয়েছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ রঙে-রসে যে আনন্দের ডালি আমাদের জন্ম সাজিয়ে রেখে গেছেন, তার মধ্যে তিনি নিজের মনটিকেও যথা সম্ভব পুবে দিয়ে গেছেন । আমাদের মনে যে তাঁর মনেব স্পর্শ হয়ত কিছু কিছু লাগবে চিরকাল না হোক অন্ততঃ দীর্ঘকাল ধবে সে করুণ আশা তাঁর মনের কোণে ছিল । গান ও কবিতার মধ্যে তাব ইঙ্গিত বাববার পাওয়া যায় ।

দিয়ে গেনু বসন্তেব এই গানখানি—

ববষ ফুঁবায় যাবে, ভুলে যাবে জানি ।

তবু তো ফাস্তুন রাতে এ গানেব বেদনাতে

আঁখি তব ছলছল, এই বল মানি ॥

স্মৃতিবক্ষাব সমাবোহে তাঁব যে বিদ্বেষ ছিল তাব স্পর্শ আভাস রয়েছে পরিশেষেব ‘দিনাবসান’ কবিতাটিতে । কবিতাটি পড়লে কোনো ববীন্দ্র স্মৃতি সভায় যেতে মন সরে না ।

বাঁশি যখন থামবে ঘবে,

নিববে দীপেব শিখা,

এই জনমের লীলার পরে
 পড়বে যবনিকা,
 সেদিন যেন কবির তবে
 ভিড় না জমে সভাব ঘরে,
 হয় না যেন উচ্ছবে
 শোকের সমাবোহ,
 সভাপতি থাকুন বাসায়,
 কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
 নাই বা হোলো নানা ভাষায়
 আহা উহু ওহো।
 নাই ঘনালো দল-বেদলেব
 কোলাহলেব মোহ ॥

আমাব স্মৃতি থাকুনা গাঁথা
 আমাব গীতিমাঝে,
 যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
 মর্মরিয়া বাজে।
 যেখানে ঐ শিউলিতলে
 ক্ষণহাসির শিশির জলে,
 ছায়া যেথায় ঘুমে চলে
 কিরণ-কণা-মালী;
 যেথায় আমাব কাজেব বেলা
 কাজেব বেশে কবে খেলা,
 যেথায় কাজেব অবহেলা
 নিভুতে দীপ জ্বালি
 নানা রঙের স্বপন দিয়ে
 ভরে কপের ডালি ॥

তঁার স্মৃতি জেগে উঠবে প্রকৃতির পরিবেশে। তঁার স্মৃতি ভেসে উঠবে তঁার গানে, তঁার স্মৃতি হয়ত আরও কিছুকাল টিকে থাকবে তাঁব শান্তিনিকেতনে যেখানে তিনি দিনেব বেলায় কাজের খেলা খেলতেন, রাত্রিবেলায় 'নানা রঙের স্বপন দিয়ে কপের ডালি' ভরতেন।

ববীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাদী পরিবেশে। তাঁর প্রথম জীবনে ব্রহ্মবাদ তাঁব বাহ্য ধর্ম ছিল বলতে পারি। তখনও তাঁব নিজস্ব ধর্ম খুঁজে পাবার সময় হয়নি।

এই ব্রহ্মবাদের সাধনায় একটা মূল আস্থা ছিল ত্যাগে ও বৈবাগ্যে অর্থাৎ ভোগ নিঃস্পৃহতায়। একে নিকামতা বলব না নিঃস্পৃহতাও নয়, এ হল মনের সংযম। ত্যাগেব মহত্ব ববীন্দ্রনাথের মন সর্বদা টানত। কিন্তু বৈবাগ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস তা তিনি মানেননি। পঞ্চাশ বছরে পড়বাব আগেই তিনি লিখেছিলেন—‘বৈবাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমাব নয়’। তাহলে কোন্ সাধনে কোন্ পথে তিনি মুক্তির দিশা পেয়েছিলেন? এব উত্তর পাওয়া যায় তৃতীয়বার বিলেতে যাবাব অব্যবহিত পূর্বে লেখা একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত রচনায়।—একটি গানে।

এমনি কবে ঘুবিব দূরে বাহিবে

আর তো গতি নাহিবে মোর নাহিবে ॥

যে পথে তব বখের বেথা ধবিয়া

আপনা হতে কুসুম উঠে ভবিয়া

চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পদতলে পড়িব লুটে-

সবাব পানে রহিব শুধু চাহিবে ॥

তোমাব ছায়া পড়ে যে সবাববে গো

কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।

জলেব ঢেউ তরল তানে সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে

ঘিবিয়া তাবে ফিবিব তবী বাহি বে ॥

যে বাঁশীখানি বাজিছে তব ভবনে

সহসা তাহা শুনিব মধুপবনে।

তাকায়ে বব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে

বাজায়ে বীণা বেডাব গান গাহিবে ॥

গানটির ধ্রুবপদে কবি বলতে চেয়েছেন, আমি ধ্যাননিবিষ্ট যোগী বা কায়কল্প সাধক নই, আমি পবিত্রাজক, চলাই আমাব ধর্ম। তাবপর তিনটি স্তবকে তিনটি ছবি দিয়ে তাঁব ধর্ম যে কী তা বিশদ করেছেন। প্রথম ছবিতে ববীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইছেন যে পরম তত্ত্ব বা চরম সত্যকে তিনি উপলব্ধি কবতে স্তব্ধই অপারক। ধ্যানের ধনকে নিজের হৃদয়ে ধরে বাঁধতে পাবেন না। জগৎসংসারে বিশ্বপ্রাণের যে রথযাত্রা চলেছে সেই রথযাত্রাব তিনি ভক্ত দর্শনার্থী। দ্বিতীয় ছবি থেকে বুঝি যে, সমাধিমগ্ন যোগীর অচঞ্চল হৃদয়ে যেমন পবন সতা, চবন তত্ত্ব, কমলরূপে ফুটে ওঠে তেমন তাঁব নয়। তাঁব মুগ্ধ চিত্ত বিশ্বপ্রাণেব বথেব চক্রচিহ্ন ধবে ধাবমান। স্থিরজল সরোববে পদ্ম ফোটে, চঞ্চলস্রোত নদীতে পদ্ম ফোটে না। অচঞ্চল চিত্ত যোগীর, স্থির চিত্ত কমলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তাঁব চঞ্চল চিত্ত যেন স্রোতের জল, তাতে ব্রহ্ম-অধিষ্ঠিত কমলের স্পর্শ ছবি পড়ে না, শুধু ভাঙা ভাঙা ছায়া পড়ে। সেই ছায়াটুকু নিয়েই তাঁব হৃদয় যেন গানের তরী বেয়ে চলেছে



জীবন-স্রোতে, সব কিছু দেখতে দেখতে। তৃতীয় ছবিব বক্তব্য, তাঁর ধ্যানের ধন, ব্রহ্ম বা বিশ্বপ্রাণ, স্রোতও বটে, স্রোতের উৎসও বটে। গানের তরী বেয়ে যেতে যেতে সেই উৎসের কলধ্বনি হয়ত একদিন শোনা যাবে। তখন তিনি সেই কলধ্বনি তাঁর গানের সুরে ভরে দিয়ে গেয়ে গেয়ে বেড়াবেন চবম মুহূর্তের প্রত্যাশায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-আকৃতিব প্রকাশ যে তাঁর গানে সেকথা অনেক আগেই বলেছেন তিনি। আবাব স্মরণ কবন গীতাঞ্জলিব 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' গানখানি।

নয়ন আমাধ কপের পুরে

সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুবে,

শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভাব

বাজাই আমি বাঁশি—

গানে গানে গঁথে বেড়াই

প্রাণেব কামা হাসি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তায় মুক্তির স্বরূপ কী?

বৈবাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,

অনন্তবন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।

মোহ মোর মুক্তিকপে উঠিবে জলিয়া

প্রেম মোব মুক্তিকপে উঠিবে ফলিয়া ॥

এতো হল জীবন থেকে মুক্তি এতো চবমমুক্তি নয়। চবম মুক্তি হল বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন মুক্তি, মোহমুক্তি। তাঁর চিন্তায় যে চবম মুক্তি কীরকম ছিল তার কিছু নির্দেশ রয়েছে পববর্তী কালের একটি গানে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ॥

দেহ মনের সুদূর পারে, হারিয়ে ফেলি আপনাবে

গানের সুবে আমাব মুক্তি উর্ধ্বে ভাসে ॥

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,

দুঃখ বিপদ-তুচ্ছ-কবা কঠিন কাজে।

বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমেব বহিঃশালা—

জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে ॥

রবীন্দ্রনাথ যে জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না, এই অন্তরঙ্গ গানটি তার এক বড় প্রমাণ। এই গানটি যে অর্থ আমি বুঝি তা হল মৃত্যু চবম মুহূর্তে আনন্দের বিস্মরণে বিশ্বপ্রাণেব মধ্যে ছড়িয়ে পড়া। যে প্রাণ তাঁর মর্ত্যকায় অধিষ্ঠিত ছিল, মৃত্যুর পরে তা আকাশে আলোয় আলোয় বিচ্ছুরিত হবে, ধূলায় ধূলায় বিকীর্ণ হবে, ঘাসে ঘাসে বোম্বাঙ্কিত হবে। এই হল দৃশ্যভূবনেব কথা। অদৃশ্য ভূবনে তা অনির্বচনীয় রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হবে, সকল মানুষের মনে ঝংকাব তুলবে। সকল কঠিন কাজে, মহৎ ত্যাগে উদ্দীপনা যোগাবে। এই ভাবে তাঁব মুক্তি মানে সর্বব্যাপী অস্তিত্বে জন্মলাভ।

নিজেব অধ্যাত্ম-ভাবনাব কথা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে কবিতায় গানে নানাভাবে বাব বাব বলেছেন। আমি এই আলোচনায় শুধু তাব গানকেই ধবেছি। কেন, তা বলে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রবন্ধে, শান্তিনিকেতনেব ভাষণে, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা উপস্থিত ব্যক্তিদেব, সমসাময়িকদের বোঝাবাব জন্মে। কবিতায় যা প্রকাশ করেছেন তা বর্তমান ও অনাগত বৃহত্তব পাঠকদের জন্মে। গানে যা গেয়েছেন তাব অধিকাংশই নিজের জন্মে। তাই গানে তাঁব অধ্যাত্মচিন্তাব প্রকাশ অকুণ্ঠিত এবং নির্বাধ, কোন বকম তত্ত্বকথাব সংশ্লেষবর্জিত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর তাব গানেই অব্যবহৃত হয়েছিল। একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকাব কববেন। (২৬।১।৮০ তারিখে পরিষদ-মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ)।

জ্ঞানেশ্বরী—জ্ঞানদেব বিরচিত ॥ অনুবাদ : গিবীশচন্দ্র সেন	২০ ০০
অমৃতানুভব ও চান্দদেব-পাসপ্তী—জ্ঞানদেব বিরচিত ॥	
অনুবাদ : গিবীশচন্দ্র সেন	৮'০০
জীবনলীলা—স্বাক্ষর সাহেব কালেলকব ॥ অনুবাদ : প্রিয়বরুণ সেন	১০'০০
বাণভট্টের আত্মকথা—হাজাবী প্রসাদ দ্বিবেদী ॥ অনুবাদ : প্রিয়বরুণ সেন	৫'৫০
চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ॥ সুকুমার সেন সম্পাদিত	১০'০০
বৈষ্ণব-পদাবলী (২য় সংস্করণ)—সুকুমার সেন সম্পাদিত	৩'৫০
ভারতচন্দ্র—মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	৩'০০
মনসামঞ্জল—কেতকদাস ক্ষেমানন্দ ॥ বিজনবিহাবী ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	৩'০০



সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্রভবন	রবীন্দ্র সর্বোবর স্টেডিয়াম	২১, হাডস রোড
৩৫, ফিরোজশাহ বোড	ব্লক ৫বি, কলিকাতা ২৯	মাদ্রাজ ৬
নিউ দিল্লী-১		

১৭২, নঙ্গীগাঁও ক্রুশ বোড, (দাদাব) বোম্বাই ১৪

আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলেখযুক্ত শৈবমূর্তি

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার

গত বৎসব ১৮ই মে, আমি পাটনা যাত্রাবেন অধ্যক ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত-মহাশয়েব একখানি চিঠি পাই। চিঠিব সঙ্গে তিনি কোন প্রস্তব মূর্তির লেখসময়িত পাদপীঠের একখানি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। ডক্টর গুপ্ত জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি জাপান পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন; সেখানে কোতো বিশ্ববিদ্যালয়েব পুৰাতত্ত্ব বিভাগেব অধ্যাপক তাহাকে ঐ মূর্তিলেখটিব পাঠোদ্ধারে সাহায্য কবিতে অনুবোধ কবেন। গুপ্তমহাশয় আবও জানান যে, কিছু কাল পূর্বে জাপানী পুরাতাত্ত্বিকগণেব একটি দল আফগানিস্থানে ঐ মূর্তিটি আবিষ্কার কবিয়াছিল। আমি তখনই তাঁহাকে জানাইলাম যে, লেখটিতে ব্রাহ্মী, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির উল্লেখ আছে।

কিছুদিন পূর্ব আমি আফগানিস্থানেব ঐ মূর্তিলেখটি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি এবং উহা ১৯৮৭২ তাবিত্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেব অন্তর্গত উচ্চগবেষণা কেন্দ্রেব মাসিক আলোচনাচক্রেব অধিবেশনে পঠিত হয়। উহাব কয়েক মাস পবে ডক্টর গুপ্ত মূর্তিটির সম্পর্কে আমাকে আবও কিছু বিবরণ দেন। তিনি কোতো বিশ্ববিদ্যালয়েব পুৰাতত্ত্ব বিভাগেব যে অধ্যাপকেব নিকট ফোটোগ্রাফটি পাইয়াছিলেন, তাঁহাব নাম তাকায়ামু হিগুচি। তাঁহারই নেতৃত্বে জাপানীরা কাবুলের কিছুটা উত্তর দিকে অবস্থিত তাপাস্কান্দাব নামক স্থানেব টীলাতে খননকার্য চালাইয়া শিলামূর্তিটি আবিষ্কার কবে। স্কন্দেব সহিত উমামহেশ্ববেব মূর্তি মার্বেল প্রস্তরে ক্ষোদিত। প্রস্তব খণ্ডটি ৮১.৫ সেন্টিমিটার উচ্চ; উহা প্রস্থে ৪২ সেন্টিমিটার এবং বেধ বা গভীরতায় ১৮ সেন্টিমিটার। উহা খণ্ডিত আকাবে পাওয়া যায়; কিন্তু খণ্ডগুলিকে জুড়িয়া মোটামুটি সম্পূর্ণাঙ্গ করা গিয়াছে। মহেশ্বর বুধের পৃষ্ঠে কিছুটা দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া সমাসীন। তাঁহাব দক্ষিণ পদ নিয়দিকে লম্বিত, বাম পদ বুধেব পৃষ্ঠে শায়িত। তাঁহাব চাবিহস্ত। বামদিকেব নিয়হস্ত উমাব স্কন্ধে গস্ত; বাম উর্দ্ধহস্তে ত্রিশূল, উহা উমাব মাথার উপর দিকে দেখা যায়। দক্ষিণের উর্দ্ধহস্ত ভগ্ন, বামহস্ত জানুর উপর স্থাপিত। মহেশ্বরেব বামদিকে উমা তাঁহাব দিকে হেলিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দণ্ডায়মান। তাঁহাব নিকটে বামদিকে বালক স্কন্দ। মূর্তিটির স্থানে স্থানে লাল, নীল এবং কৃষ্ণবর্ণেব ব্যবহার দেখা যায়।

ডক্টর গুপ্ত আমাকে আবও জানাইলেন যে, ইতিমধ্যে জাপানী পণ্ডিত মেইজি যামাদা লেখটির পাঠোদ্ধার কবিয়াছেন এবং তাঁহাব পাঠ Archaeological Survey of Kyoto University in Afghanistan, 1970, সংজ্ঞক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাকে জাপানীপণ্ডিত কর্তৃক উদ্ধৃত মূর্তি লেখটিব পাঠও পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম যে, উহাতে অসংখ্য ভুল এবং উহার কোন অর্থকবাও সম্ভব নহে।

কিছুকাল পূর্বে আমি আফগানিস্থানে আবিষ্কৃত একটি গণেশ মূর্তিতে উৎকীর্ণ লেখের পাঠ প্রকাশ কবিয়াছিলাম। উহা কাবুলের দক্ষিণে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত গার্দেজ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। বর্তমানে মূর্তিটি কাবুলে পামিব সিনেমার নিকট-বর্তী পীর রতননাথের দবগায় পূজা পাইতেছেন। এই মূর্তির লেখটি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। স্কান্দারের শৈবমূর্তির লেখটিও উহাব অনুরূপ। দুইটি লেখেরই অক্ষর অতি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত; কিন্তু বর্তমান লেখটিতে অক্ষরের গঠনে ত্রুটি আছে।

স্কান্দাবেব মূর্তিলেখে মাত্র তিনটি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহাতে অনুদ্ভূত ছন্দে বচিত দুইটি শ্লোক দেখা যায়। শ্লোকদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গদ্য বাক্য রহিয়াছে। অক্ষর গঠনের ত্রুটিব জন্ম দ্বিতীয় শ্লোকটির পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ দ্রুত।

আমি লেখটিব যে পাঠোদ্ধার কবিয়াছি, তাহা নিম্নরূপ।—

১। একমূর্তিপ্রিধা জাতা ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ (।*)

কর্তা বি-

২। স্মৃঃ ক্রিয়া ব্রহ্মা কাবগন্ত মহেশ্বরঃ ॥

উক্তঃ ভগবতা মহাদেবেন (।*)

যথাগ্নিমভিপ্রক্ষিপ্য বিশোধনোপলক্ষণম্।

৩। কৃত্বাহং চৈব বিষ্ণুঃ চ ব্রহ্মা চ নিবয়ং গতাঃ ॥

প্রথম শ্লোকটিব অর্থ বোধে অসুবিধা নাই। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন মূর্তিতে প্রতিভাত হন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু কর্তা, ব্রহ্মা ক্রিয়া এবং মহেশ্বর কারণ। আমবা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং শিব অর্থাৎ মহেশ্বরকে সংহারকর্তা বলা হয়। কিন্তু এখানে মনে হয়, ব্রহ্মাকে সৃষ্টি এবং বিষ্ণুকে সৃষ্টিকর্তা ও শিবকে সৃষ্টিব কারণ বলা হইয়াছে। উহার পর ভগবান্ মহাদেব অর্থাৎ শিবের উক্তি বলিয়া দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একবার আত্মশুদ্ধিব জন্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আপনাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহাব ফলে তিন জনকেই নরকে যাইতে হইয়াছিল। শ্লোকটি কোন পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

জাপানী পণ্ডিত মেইজি যামাদা লেখটিব যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত কবিলাম।

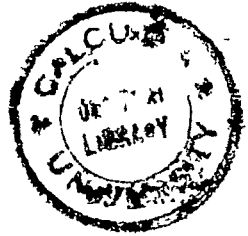
১। একমূর্তি ত্রিবাসনা ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ

কর্তা বি-

২। স্মৃঃ ক্রিয়া ব্রহ্মা কারণ তু মহেশ্বরঃ

উক্ত চ ভগবতা মহাদেবেন

য (দ, দ্ব) পি মতিমু দি স্য বি (ৎ স, স্ত) বং নে (নো, তেনো) পলভ্যতে (বা, ধা)



৩। ত (দ্ব) হং দৈব বিশ্বস্য ব্রহ্মা চ নিলয়ং গতা

এই পাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটি অনেক। প্রধান ভুলের মধ্যে প্রথমপংক্তিতে 'ত্রিবাসনা' অর্থহীন। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্ধেব কোন অর্থবোধ সম্ভব নহে। উহা দ্বিতীয়ার্থে 'দৈব', 'বিশ্বস্ত', এবং 'নিলয়ং', অর্থহীন ভ্রান্তপাঠ।

আমি যখন লেখটিব পাঠোদ্ধাব করি, তখন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা ব্রহ্মা, বিশ্ব ও শিবের ত্রিমূর্ত্তি সংবলিত প্রস্তবফলকে উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, ঐ ফলকে উমা ও কন্দের সহিত মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে, ব্রহ্মা, বিশ্ব ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি নহে। যাহা হউক, যিনি ঐ মূর্ত্তি নিশ্চারণ করান, তিনি অবশ্যই পৌৰাণিক হিন্দুধর্মের অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং শিব, উমা, কন্দ, ব্রহ্মা ও বিশ্ব—সকলের প্রতিই ব্রহ্মা পোষণ করিতেন। তবে শিবকে তিনি অগ্ন্যাদেবতা অপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গ্রন্থ-বিক্রয় বিভাগ

গ্রন্থবিক্রয় বিভাগ প্রত্যহ ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার ও অগ্ন্যাদেবতার দিন বন্ধ থাকে।

কমিশনের হার

পবিষদ-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থাগার পক্ষে

১—৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ১৫%

৫০০—৯৯৯ ,, পর্যন্ত ২০%

১০০০ এবং তদুর্ধ্ব ,, ২৫%

সর্বক্ষেত্রে প্রেরণ খবচ স্বত্ত্ব এবং তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। ভিঃ পিঃ পিঃর ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

ভারতকোষ

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য : ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড ২০.০০ (কুড়ি টাকা) হিসাবে প্রতি খণ্ড,
৪র্থ খণ্ড ১০.০০

অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা যায়। অন্যান্য ১০ খণ্ড লইলে গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য-প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কলিকাতা—৬

ফোন—৩৫-৩৭৪৩

পরিষৎ সংবাদ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

গত ১৮ চৈত্র, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (ইংবাজী ১ এপ্রিল, '৭৩) ববিবাব, অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ মন্দিবে কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পোবোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতকুমারের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ কবিয়া উক্তব চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রভাতকুমার ছিলেন বাংলা গল্প-সাহিত্যেব সার্থক রূপকার। পাশ্চাত্য সাহিত্যে নিষ্ফল প্রভাতকুমার বাংলা গল্প-সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়েব সূচনা করেন। প্রভাতকুমার জীবনের সহজ-সরল-দিকগুলি লইয়া যে সব অনবদ্য গল্প বচনা কবেন তা একালেব গল্পরসিকদেবও চবিতার্থ কবে। তিনি তাঁহাব গল্পগুলিতে তত্ত্ব বা জীবনদর্শনের অবতাবণা কবেননি সত্য—কিন্তু হাস্য-কৌতুক-বিষাদ প্রেম-স্নেহ-ভালবাসায় তাঁহার গল্প সমূহ অনাবিল আনন্দেব নিব্বার হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় দুঃখের সঙ্গে বলেন একালের গল্পরসিক পাঠক সমাজ প্রভাতকুমারেব গল্পসাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পবিচিত হনেন। প্রসঙ্গতঃ উক্তব চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের জীবনেব কযেকটি অজ্ঞাত তথ্যেব বিবরণ বিবৃত কবেন। লগুনে বমেশচন্দ্র দত্তেব সঙ্গে প্রভাতকুমারেব যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়—মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ কবিয়া তিনি তাহা পবিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে প্রভাতকুমারের অন্তরঙ্গ সম্পর্কেব দিকটিও তিনি উল্লেখ কবেন। তিনি বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভাতকুমারেব তাঁহার যত্নার অব্যবহিত পূর্বে সহকারী সভাপতি পদে অভিষিক্ত কবিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবিয়াছিল। পববর্তীকালে পবিষদ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চবিতমালায় প্রভাতকুমারের একটি জীবনচবিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনাদি ব পুনঃপ্রকাশ এবং জনসাধাবণের মধ্যে তাঁহার রচনাদি ব সুলভ সংস্করণের গ্রন্থ প্রচাবেব প্রতি ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করেন। প্রভাতকুমার বাংলা সাহিত্যেব নবযুগেব যে অধ্যায়ে আবির্ভূত হন—বিশ্বসাহিত্য সভায়—পেবিক্লিসীয় এথেন্স ও এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য এই যুগেব সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনীয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

প্রভাতকুমারের এই জন্ম-শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায় শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য “প্রভাতকুমার ও ববীন্দ্রনাথ” শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী মনোজ্ঞ নিবন্ধ পাঠ করেন। প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও কবি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রভাতকুমারের উপর লিখিত আব একটি চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ পাঠ কবেন। এতদ্ব্যতীত প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উক্তব অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য পবিষদেব পক্ষে সভাপতি মহাশয়—বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত সুধী ও সজ্জনবৃন্দের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮০ (৯ মে, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১১২তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পরিষদ আয়োজিত জনসমাকীর্ণ এই সভায় পৌবোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এবাবে রবীন্দ্র জন্মোৎসবকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে পরিষদের অগ্রতম শ্রাস-রক্ষক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র জন্মতিথির পূর্বাভূই অসুস্থ হইয়া নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হন। সভারশেষ পূর্বেই পরিষদ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্তা শ্রীসোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক পীড়িত হওয়ার সংবাদ এবং তজ্জনিত অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা কবিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীঠাকুরের সত্ত্বর আরোগ্য কামনা করেন।

বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত ‘হে নূতন দেখা দিক আব বার জন্মের প্রথম শুভ ক্ষণ’ সঙ্গীতখানির মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভাব সূচনা হয়। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ছিল এই সভার অগ্রতম আকর্ষণ।

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে ‘বিশ্বকবি’ শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গভাষা অপূর্ব গৌরব ও মহিমা লাভ কবিয়াছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কবিগুরুর সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ যোগাযোগের কাহিনী বিবৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভকে তিনি তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া অভিহিত করেন।

সভায় স্ববচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শ্রীমুকুমার সেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত এই নিবন্ধে ডক্টর সেন রবীন্দ্র জীবনদর্শনের বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) আর একটি স্ববচিত নিবন্ধ পাঠ কবিয়া সভাস্থ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞভাষণ প্রদান করেন। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর সমাপ্তি সঙ্গীতের পর ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত—সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী এবং সমবেত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্কিম জন্মোৎসব

গত ১৬ আষাঢ় ১৩৮০, ববিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৫তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। সভায় পৌবোহিত্য করেন ইতিহাসাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। জনসমাকীর্ণ এই সভা প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পবিসমাপ্ত হয়। বেশ কয়েকবৎসর বিরতির পর পরিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপস্থিত সুধী ও সজ্জন বৃন্দের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্যপৌরাণিকতা” শীর্ষক একটি মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির অভিভাষণ রূপে “যুগপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র” নামক অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। “বঙ্কিমতর্পণ” শীর্ষক স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীস্বদেশভূষণ ভূঞা। শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন what Bengal thinks to day India thinks to-morrow উক্তিটি গোথলেব। কিন্তু গোথলের পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি শ্রীঅববিন্দের দৃষ্টিতে ঋষি বঙ্কিমের মনস্বিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক স্বদেশভূষণ ভূঞা বাংলার নবজাগরণের পবিত্রক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক অবদানগুলি বহুস্তিসিদ্ধ আলোচনা করেন।

পবিষদ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বর্তমানযুগে বঙ্কিমসাহিত্যচর্চা উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ যুগেও এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে পাবে। অগ্রজপ্রতিম ইতিহাসাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পরিণত বয়সেও এই বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত কবায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় পরিষদ সভাপতিক্রমে তাঁহাব প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আচার্য মজুমদার ও শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত নিবন্ধ দুটি সম্পর্কে প্রশংসা উল্লেখ করিয়া পবিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব সভা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত সকলকেই সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তিনি সাহিত্যানুরাগী সকলকেই পরিষদের উজ্জীবনে সহযোগী হইত আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

গবেষণা বৃত্তি

দানবীৰ মতিলাল শীল মহাশয়ের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক (এটর্নি) মহাশয় সৃষ্ট “কালিদাস মল্লিক চ্যাবিটেবল্ ট্রাফ্ট” হইতে সাহিত্য পরিষদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে “আবতি মল্লিক” গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তনের জন্ম মাসিক পাঁচশত টাকা অনুদান গ্রহণের একটি প্রস্তাব পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। গত ২৬শে বৈশাখ তাবিখে কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে এই অনুদান গ্রহণের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অনুদানের জন্ম দাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনও জ্ঞাপন করা হয়। ইহাব পর সাধারণ মাসিক অধিবেশনে ইহাই স্থির হয় যে কালিদাস মল্লিক চ্যাবিটেবল্ ট্রাফ্টেব এই

মাসিক অনুদান হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য মাসিক ২৫০ টাকার দুইটি বৃত্তি দুইজন গবেষককে দেওয়া হইবে।

এই সঙ্গে রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি নামে মাসিক ১৫০ টাকার আরও একটি অনুদান বৃত্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গত বামকমল সিংহের স্মৃতিবক্ষার জন্য পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট বামকমল স্মৃতিবক্ষা তহবিলের জন্য সংগৃহীত ২৫,০০০ ০০ টাকার স্থায়ী আমানতের সুদ হইতে এই গবেষণা বৃত্তির ব্যয় নির্বাহ হইবে ইহাই স্থিবিধৃত হয়।

“আবতি মল্লিক” ও “বামকমল সিংহ” গবেষণা বৃত্তির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছে। কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ সমিতিকেকে উপযুক্ত প্রার্থী তথা গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ভাব অর্পণ করা হইয়াছে।

পরিষৎ সেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমদান

বাঙলাব মহাপুরুষদের স্পর্শপূত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাভাবে সংস্কার করা হয় নাই। দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্র চিত্র সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানের ও উপকরণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কার্যে সহায়তার জন্য বাঙলাব ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্যে ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ সংস্কারের কার্যে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়া শ্রমদান করেন। ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রথম দিন সাত টাকা রোজে একজন রাজমিস্ত্রী এবং চারি টাকা রোজে একজন মজুর নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় দিন স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিষদের দৈনিক এই এগাব টাকা ব্যয় বন্ধ করিবার জন্য রাজমিস্ত্রী ও মজুরকে বিদায় দেন এবং নিজেবা বাঁশের ভারী বাঁধিয়া, দেওয়াল মাজিয়া ঘষিয়া, যাবতীয় উপকরণ বহন করিয়া চূণকাম ও বঙের যাবতীয় কাজ করেন। হলঘরের পুরাতন ছবিগুলিকে নামাইয়া-সমুদ্রে পবিস্কার কবিয়া, প্রত্যেক ছবি পিছনে বাদামী কাগজ লাগাইয়া, নূতন বিং ও তাব দিয়া বাঁধিয়া টাঙাইয়া দেন। পরিষদমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মনীষী ও মহাপুরুষদের শ্বেতপ্রস্তরের বেদী ও মর্মরমূর্তিগুলি মালিন্যমুক্ত কবিয়া শোভন ও সুন্দর করেন। আর্নন্দবাজার পত্রিকাব ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় এবং স্টেটসম্যান পত্রিকাব ২৬ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের এই কাজের বিবরণ ও চিত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দির সংস্কার ব্যতীত ইহা বা পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ পঞ্জীয়ন কার্যেও সহায়তা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবগঠিত গ্রাসরক্ষক সমিতি

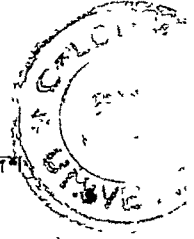
গত ১৭ই মাঘ, ১৩৭৯ পবিষদেব মাসিক সাধাবণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিষদেব নূতন গ্রাস বক্ষক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

- (১) ডঃ শ্রীমুকুন্মার সেন
- (২) শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (৩) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম্-পি
- (৪) শ্রীঅশোককুমার সবকাব

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ

- (৫) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ বায়

কোষাধ্যক্ষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (পদাধিকার বলে)



রচনাবলী গ্রন্থমালা

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র বচনা চাব খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ২১ নাটক, ৭ গদ্য বচনা [২০'০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ২ উপন্যাস, ৬ ছোট গল্প [২০'০০]। তৃতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ১৪ গদ্যবচনা [২৫'০০]। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ৬ নাটক, ৩ প্রহসন, ৫ কবিতা ও গান, ৩ গদ্যরচনা [১২'৫০]। দ্বিতীয় খণ্ডে ৮ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতা ও গান, ৩ গদ্যবচনা, ১ ইংরেজী কবিতা [১৫'০০]।

মধুসূদন রচনাবলী

সমগ্র বচনা (ইংবেজি সহ এক খণ্ডে) [১৭'৫০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

সমগ্র বচনা এক খণ্ডে [১৩'০০]।

রমেশ রচনাবলী

সমগ্র উপন্যাস (৬টি) [১০'০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

সমগ্র বচনা তিন খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [১৫'০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র প্রবন্ধ [১৭'৫০]। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি [১৫'০০] প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যসাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড | কলিকাতা—৯

বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুবাদী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সন্তুসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে। আগামী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১। বিচিত্রা ॥ ২৩টি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ
বচনার বিচিত্রসংকলন। মূল্য ১৮'০০, ২০'০০ টাকা

২। ভারতপথিক রামমোহন রায় ॥ ভারতের
জাতীয়তাবোধের উদগাতা, নবযুগের পথিকৃৎ, মহাত্মা
রামমোহনের জন্মদ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুনঃ-
প্রকাশিত। মূল্য ৪.৫০ টাকা

৩। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা,
রবীন্দ্র-রচনা এবং রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিভিন্ন
লেখকের মূল্যবান তথ্যসম্বন্ধরচনা সংগ্রহ। রবীন্দ্র-
জিজ্ঞাসু গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য
সংগ্রহযোগ্য।

প্রথম খণ্ড ১৫'০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০'০০

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ ॥ রবীন্দ্র-
প্রতিভার উন্মেষে প্রেরণাস্বরূপ, আবাল্যের
'সাহিত্যের সঙ্গী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত
মৌলিক নাটকের সংকলন। মূল্য ১৪'০০, ১৬'০০ টাকা

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০'০০ টাকা

পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০'০০ টাকা

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৮০



পত্রিকাধিকারক

শ্রীগৌরাসুগোপাল সেনগুপ্ত



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৫৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৫.০০

দ্বিতীয় খণ্ড ৫.০০

তৃতীয় খণ্ড ৯.০০

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—৩.৭৫

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস

(পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ২০% কমিশন)

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প চেতনা—হস্তশিল্প

—শ্রীআশীষ বসু ১.২৫

বাংলার উৎসব—শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী ১.২৫

বাংলার লোকনৃত্য—শ্রীমণি বর্ধন ২.৯০

দেশের গান—শ্রীভবতোষ দত্ত ০.৫০

বাংলাব শিকারপ্রাণী—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র ৩.০০

ডাকযোগে অর্ডার দেবাব ও মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—

সুপারিটেণ্ডেন্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,

পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ

৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

নগদ বিক্রয় : পাবলিকেশন সেলস্ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট

১ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৫৭৯২। ৭৩



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৮০, সংখ্যা—২

শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৮০

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পৌৰোহিত্যের পদে বরণ কবিতা আপনাবা আমাদের যে গৌরব ও সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্ম আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি সাহিত্যিক নহি এবং এই সম্মানের যোগ্যতা বা অধিকার আমার নাই। কিন্তু কৈশোবকাল হইতেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত। সুতবাং জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে বর্তমান কালের ছাত্রদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের অল্প বচনা তো দুবের কথা উপন্যাসেরও সমাদর খুব বেশী নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রও ইহাব সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। আমাদের ছাত্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী—অন্ততঃ উপন্যাসগুলির সহিত অপরিচিত ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম তখন আমাদের কয়েকজনের অবসর বিনোদনের একটি উপায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতে একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া তাহা কোন্ গ্রন্থে আছে এই প্রশ্ন করা। যতদূর মনে পড়ে এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়ায় অনেক পবিমাণে সাফল্য লাভ করিতাম। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে যেদিন অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাস প্রথম পাঠ কবি সে দিন যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ে ও আনন্দে মন পবিপূর্ণ হইয়াছিল আজিও তাহা ভুলি নাই। তাবপব বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়াছি—একবার দুইবার পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই নাই বহুবার পাঠ কবিয়াছি। ইহাতে কেবল যে বস ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, উপন্যাসের চরিত্র-গুলির আদর্শ ও ভাবধারা জীবনের চিবন্তন সম্পদরূপে পবিগত হইয়াছে। নরনারীব একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযমেব অভাবে সর্বনাশের চিত্র, স্বার্থতাগ ও আত্মবিসর্জনের অপূর্ব আদর্শের পার্শ্বে স্বার্থপরতার পঙ্কিলতা একপ পাপপূর্ণ ও ভালমন্দের কত বিচিত্র চিত্র আমাদের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত কবিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, নরনারীব কত অপূর্ব বিচিত্র কাহিনী ভাষা ও ভাবের মাধুর্যে ও অভিনব ‘দৃশ্য-পটের অবতারণায় অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কবিয়া মন মুগ্ধ কবিয়াছে। অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে প্রকৃতি হুহিতা কপালকুণ্ডলাব কর্ণোথিত মৃদু ধ্বনি “পথিক

তুমি কি পুথ হাবাইয়াছ ?” একবারমাত্র নবকুমার শুনিয়াছিলেন কিন্তু জীবনে বহুবার কর্ণে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। নিশীথে জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীব সম্ভবণ অথবা ত্রিস্রোতাব জলে সুসজ্জিত তবণীকক্ষে ব্রজেশ্বর ও দেবীচৌধুরাণীর মিলন—একবার পাঠ কবিলে কেহ কি কখনও ভুলিতে পারে? স্বল্প কথায়, ইঙ্গিতে ও পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে মানব চরিত্রের অন্তঃস্থলের গোপনতম রহস্য উদ্ঘাটিত কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র যে অপকণ নাট্য কৌশলে একাধারে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের অবতারণা কবিয়াছেন তাহা আমার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।

সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমারের স্ত্রী দৈব বিড়ম্বনায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা মতিবিবি সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের প্রণয়িনী ছিলেন। সেলিমের পূর্ব প্রণয়িনী মেহেরউল্লিসা তখন বর্ধমানে শেব আফগানের স্ত্রী। মেহেরউল্লিসার চিত্ত তখনও সেলিমের প্রতি আসক্ত কিনা ইহা জানিবার জন্য মতিবিবি বাল্য সহচরী মেহেরউল্লিসাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলেন। বলিলেন, হিন্দুস্থানে মেহেরউল্লিসাই দিল্লীস্ববেব প্রাণেশ্বরী হইবাব উপযুক্ত। মেহেরউল্লিসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “আমি যে শেব আফগানের বনিতা এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার দাসী ইহা তুমি ভুলিও না।” কিন্তু যেই শুনিলেন যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছেন, অমনি মেহেরউল্লিসাব নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া কহিলেন—“সেলিম ভারতবর্ষেব সিংহাসনে, আমি কোথায়?” অসংযত মুহূর্তে উচ্চাবিত এই একটি কথায় মেহেরউল্লিসার হৃদয়েব গোপন বহস্য ও চরিত্রের কি আশ্চর্য অভিব্যক্তি হইয়াছে। মতিবিবি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুতেই জানিতে পাবিতেন না এই একটি স্বগতোক্তি হইতেই তাহা নিশ্চিত বুঝিলেন।

কিন্তু এই আশাভঙ্গের নৈরাশ্য যে মতিবিবিকে কেন বিচলিত কবে নাই—তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ধমান যাইবাব পথে মতিবিবি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন—এবং দৈবক্রমে তাঁহাব ভূতপূর্ব স্বামী নবকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া একটি চটিতে নিয়া আসেন। মেদিনীপুরেব ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে মতিবিবি ও তখন তাঁহাব অপরিচিত নবকুমারের এই সাক্ষাৎ—ঘটনা সৃষ্টির চাতুর্যে শ্রেষ্ঠ নাটকের সহিত তুলনীয়। মতিবিবি যখন শুনিলেন যে তাঁহাব উদ্ধার কর্তাব নিবাস সপ্তগ্রাম তখন মাটিব প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া মুখ না তুলিয়া বলিলেন “দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?” নবকুমার বলিলেন—নবকুমার শর্মা। প্রদীপ নিভিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র আব কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এই একটি ইঙ্গিতে মতিবিবির হৃদয় রহস্য কি অপকণ কৌশলেই না ব্যক্ত করিয়াছেন। কেবল যে পান্থশালাব ক্ষুদ্র যুগ প্রদীপটি নিভিল তাহা নহে, আগ্রার ভোগলালসাপূর্ণ বাসনার যে বিশাল বহি মতিবিবির বুকে জ্বলিতেছিল ঐ

এক ফুৎকারেই তাহাও চিবদিনের মত নির্বাপিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহুস্থলে নাট্যধর্মী লিপিকুশলতাব একপ অপর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাব আব একটি চমৎকাব দৃষ্টান্ত বিষয়ক্ষে পাই। কুন্দনন্দিনীৰ প্রতি স্বামীৰ অনুরাগ দেখিয়া সতীসান্ধবী সূৰ্যমুখী তাহাদের বিবাহ দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কিন্তু বহুদিনের অদর্শনেব পর একবাব নগেন্দ্রনাথকে শেষ দেখিবার জন্ত বহু ক্লেশ সহিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া নিশীথে তাঁহাব শয়ন কক্ষে প্রবেশ কবিলেন। নগেন্দ্রনাথ জানেন সূৰ্যমুখী মৃত। সুতরাং বমণী-অঙ্গের স্পর্শে বলিয়া উঠিলেন “কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূৰ্যমুখীকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তুমি যদি সূৰ্যমুখী হইতে পাবিতে তবে কি সুখ হইত।” এই একটি উক্তিৰে সূৰ্যমুখী যাহা জানিলেন নগেন্দ্রনাথের সহস্র সান্ত্বনা বা চাটু বাক্যেও তাহা সম্ভব হইত না। তাই সূৰ্যমুখী বলিয়া উঠিলেন “আমি যে এত দূঃখ সহিয়াছি আজ আমাব সকল দুঃখের শেষ হইল।”

এ প্রসঙ্গ আব বাড়াইব না। কাবণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেব মৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা আমাব উদ্দেশ্য নহে। সে শক্তিও আমাব নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া জীবনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহাব অন্ততঃ একটুও প্রকাশ না কবিলে তাঁহাব স্মৃতি বাসরে আমার হৃদয়েব পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই দু'একটি কথা বলিলাম। উপন্যাসের মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে আমাদেব চিত্তজয় কবিয়াছিলেন—এবং ইহাই যে তাঁহার প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ পবিচয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার মাধ্যমে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যে তিনি এক নূতন যুগেব প্রবর্তন কবিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রধান হইলেও ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবদান নহে। অগাধ নানা দিক দিয়া তাঁহার যে প্রতিভা পবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও আমাদেব স্মরণ কবা কর্তব্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণেব কথা আজ সর্বজন বিদিত। যে কয়েকজন মহাপুরুষ জাতীয় জীবনে এই নবযুগের প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। এই মহাপুরুষেরা বিভিন্ন উপায়ে দেশেব অগ্রগতিব পথ নির্দেশ কবিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের এণালী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি নূতন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তাহাব সাহায্যেই এদেশে নবযুগেব পথ নির্মাণ কবিতে অগ্রসব হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বাংলা ভাষায় বচনাব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন আজিও তাহা পাঠ কবিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। সে যুগে বঙ্গভাষায় প্রচাব কার্য যে কত বড় হুংসাহসেব ও দৃঢ় সংকল্পেব পবিচায়ক ছিল আজ গ্রামবা তাহা ধাবণা কবিতে পারি না। প্রথমতঃ সে যুগেব অপবিণত বঙ্গভাষা উচ্চ চিন্তার ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যেব বাহন হইবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নব্যযুগের প্রবর্তক শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন ইংবেজী সাহিত্যেব প্রবলস্রোতে ভাসমান। ভূদেববারুর ভাষায় তাঁহাবা ইংরেজীতে কথা বলিতেন, চিন্তা কবিতেন, এমন কি স্বপ্নও দেখিতেন। ইংরেজী বচনার দক্ষতাই

ছিল তখন শ্রেষ্ঠতার একমাত্র মাপকাঠি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও **Adventure of a young Hindu ও Rajmohan's wife** নামে দুইখানি ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জন করিবেন। এই সর্বজনাকাক্ষিত দুর্লভ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আশা ত্যাগ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টিরূপ ব্রহ্ম ও অনিশ্চিত সাফল্যের পথে বঙ্কিমচন্দ্র কেন অগ্রসর হইলেন, তাহার কারণ তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :

‘প্রথমতঃ আমবা যতই ইংবেজি পড়ি বা বলি, তিন কোটি বাঙ্গালী পাঁচ সাত হাজার নকল ইংবেজি ভিন্ন কখন তিনকোটি সাহেব হইয়া উঠিতে পারিবে না, এবং নকল ইংবেজি অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেশের লোক ইংরেজী বুঝে না, কখনও বুঝিবে না, সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিনকোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সমস্ত লোক বুঝে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উচ্চিসকল বিদ্যুস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ ভাষার বিভিন্নতার ফলে এক্ষণে আমাদের ভিতর উচ্চ-শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পবস্পন্ন সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই এবং এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। এই সমুদয় কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য।’

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, শতবর্ষ পবে বাঙ্গালী আজ তাহার মর্ম বুঝিতে আবস্ত করিয়াছে। কিন্তু কেবল বঙ্গভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। যে বঙ্গসাহিত্য দ্বারা তিনি জাতীয় নবজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁহার সূচিস্থিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ ছলে তিনি লিখিয়াছেন। “যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন—তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওযালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্বোক্ত দুই উদ্দেশ্য পবস্পবেব পবিপূর্বক—সৌন্দর্য সৃষ্টি উপস্থানসেব বা কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেশের ও মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন ইহাব গোণ উদ্দেশ্য। এই আদর্শ অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থানসগুলি একদিকে, যেমন সৌন্দর্যেব চরম উৎকর্ষেব সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি গোণভাবে কিকপে লোকশিক্ষাব সহায়তা এবং সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মুখ্যতঃ লোক শিক্ষাব জগুই বঙ্কিমচন্দ্র অচ্যুত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে বাংলার নবজাগরণে তাঁহার অবদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

ধাবণা কবা সম্ভব নহে। ‘এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘কৃষ্ণ চরিত্র’, ‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘সাম্য’, ‘বিজ্ঞানবহুত্ব’, ‘লোকবহুত্ব’, ‘কমলাকান্ত’ ও ‘বিবিধ প্রবন্ধ’, এই সমস্ত তাঁহার সম্পাদিত মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাবণ ইহাই বাংলাভাষায় “সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক।”

বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা এবং ভাবতে যে নবযুগের আবির্ভাব আমবা স্পষ্ট উপলব্ধি কবি, কতকগুলি নূতন ভাবেব ও আদর্শেব উপবই তাহাব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইগুলিৰ সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। ইহাদেব মধ্যে কয়েকটি মুখ্য ও প্রধান, যেমন জাতীয়তা জ্ঞান, দেশাত্মবোধ, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারেব অন্ধ অনুসরণেব পরিবর্তে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নৈতিক আদর্শেব ভিত্তিৰ উপব চরিত্র ও সমাজ সংগঠন, উচ্চশিক্ষা, লোকশিক্ষা, দয়িত্র ও অবনত শ্রেণীৰ উন্নতি, প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসেব উদ্ধাব দ্বাবা লুপ্ত, বিস্মৃত, প্রাচীন গৌৰবেব উপলব্ধি, জড় বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মজ্ঞানেব অনুশীলন।

বঙ্কিমচন্দ্রেব বচনায় আমবা প্রায় এই সমুদয় ভাবধাবাবই অপূর্ব বিকাশ দেখিতে পাই। পরবর্তীকালে ইহাদেব অনেকগুলি বেগবতী প্রোতস্নিনীৰ আকাব ধারণ কবিয়া জাতীয় জীবন ক্ষেত্র উর্বব কবিয়াছে; কিন্তু ইহাৰ মধ্যে সম্ভবতঃ এমন একটিও নাই, যাহাৰ অন্ততঃ প্রথম ক্ষণ ধাবা বঙ্কিম সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ একথা বলিলে অতুক্তি হইবে না যে, আমাদেব বর্তমান জাতীয় জীবনে এমন কোন আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যেব মধ্য দিয়া প্রচার করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রেব গ্রন্থ ও প্রবন্ধেব বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতিপাদন কবা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মাত্র দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসেব পুনরুদ্ধাব যে আমাদেব জাতীয় জীবনেব ভিত্তি ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বাহাব তাবস্বরে ঘোষণা কবিয়াছেন। “বাঙ্গালাৰ ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যে বাঙ্গালীবা মনে জানে যে আমাদিগেব পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল অসার, আমাদিগেব পূর্বপুরুষদিগেব কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অশ্রু অবস্থাপ্রাপ্তিৰ ভরসা করে না, চেফা কবে না। চেফা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।” বাঙ্গালাৰ প্রাচীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রেব যে কি প্রবল অনুবাব ও তাহাব উদ্ধাবেব জ্ঞাত তাঁহাব যে কি অধীৰ আগ্রহ ছিল তাহা তাঁহাব ‘বাঙ্গালাৰ ইতিহাস’, ‘বাঙ্গালাৰ কলঙ্ক’, ‘বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার’ ‘বাঙ্গালাৰ ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ ‘বাঙ্গালাৰ ইতিহাসেব ভগ্নাংশ’, ‘বাঙ্গালীৰ উৎপত্তি’, ‘বাঙ্গালীৰ বাহুবল’ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পাঠে আমবা জানিতে পাবি। অবশ্য তখন বাঙ্গালাৰ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য প্রচলিত ছিল, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকব এবং ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু দেশেব প্রাচীন ইতিহাসেব মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র যেকপ উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, তাঁহাব পূর্বে কেহ তাহা

কবেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি বর্তমানের পথপ্রদর্শক। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লিখিত বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস ‘গৌড়বাজমালা’। ইহাব অনুক্রমণিকাব আবস্ত এইকপ : “বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়-ভান্ডালিঙ্গি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।” বর্তমানে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাব মূল প্রেবণা কোথায়, স্বর্গগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্তিই তাহা নির্দেশ করিতেছে।

আমাদের দেশের কৃষকের দাবিদ্র্য ও তাহাদের সহিত শিক্ষিতদের সমবেদনাব অভাব, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর বিবোধ প্রভৃতি আমাদের বর্তমান বাজনীতির প্রধান সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয়। “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে যে জলন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা ও তাহাব কাবণ নির্ণয় করিয়াছেন, আজ পর্যন্তও বঙ্গভাষায় তাহাব তুলনা নাই! বর্তমান যন্ত্রসভ্যতাব ফলে আমাদের শ্রীধ্বি ও অশন বসন ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয় দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, তাহাব অতি মনোরম বিশদ বর্ণনা কবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“এই মঙ্গল ছড়াছড়িবে মধ্যে আমাব একটি কথা জিজ্ঞাসাব আছে, কাহাব এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ, আব রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের বোঁদ্রে খালি পায়ের এক হাঁটু কাঁদাব উপব দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বুলদে ভোঁতা হাল ধাব কবিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে?” ষাঁহার মনে কবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন তাঁহাবা লক্ষ্য করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইবাব সময়ও হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতীয় কৃষকের নামই উল্লেখ কবিয়াছেন। তাবপব ইহাদের নিদাকণ দুঃখময় প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাব ককণ দৃশ্য অঙ্কিত কবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা কবিতেন, “বল দেখি চশমা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আব তুমি ইংরেজ বাহাদুর তুমি বল দেখি যে, তোমা হতে এই হাসিম শেখ, আব বামা কৈবর্তের কি উপকাব হইয়াছে?” তাবপব বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই প্রশ্নের উত্তব দিয়াছেন—“আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘণ্টায় উলুধনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গলে কাহার মঙ্গল? তোমাব আমাব মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আব এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ কবিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহাবাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পাবে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।” বাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহের পঞ্চাশ

বৎসব পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এত সংক্ষেপে ও এত স্পষ্টভাবে ও জোর গলায় আমাদের দেশের মূল সমস্যার কথা আব কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ধর্মমত, সমাজতত্ত্ব, সাম্য ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জাতীয় আদর্শ ক্রিকে ও কতটা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাব সবিস্তার উল্লেখ এই প্রবন্ধে সম্ভবপন নহে। প্রতি বাঙ্গালীকে আমরা তাঁহাব সমগ্র বচনাবলী পাঠ করিতে অনুবোধ কবি। তাঁহাব উপন্যাসের অনুপম সৌন্দর্যে আমবা যেন তাঁহাব অগাধ লেখাব কথা বিস্মৃত না হই। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগেব কেবল শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নহেন, সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকও বটেন। এই দিক দিয়া এক ববীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়িবাব ঝাঁহাদের অবসর অথবা অভিলাষ নাই, তাঁহাদিগকে আমবা অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুবোধ কবি—সেটি ‘কমলাকান্তেব দপ্তব’। একপ অপূর্ব গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্র দোহন কবিয়া গীতাকপ দুষ্ক অর্জুনকে পান করাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাব সর্বগ্রন্থ দোহন করিয়া দুর্বল বঙ্গবাসীব জন্ম এই মূলত খাদ ও পানীযের ব্যবস্থা কবিয়াছেন। সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং দার্শনিক ও অধ্যাত্তত্ব, রাজনীতি, লোকচবিত্র প্রভৃতি সকলেরই মূলসূত্রগুলি এই এক গ্রন্থে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবসমুদ্রে যে সমুদয় মণিমুক্তা ফুটিয়াছিল, অহিফেনসেবী কমলাকান্তেব যজ্ঞোপবীত সূত্রে তিনি তাঁহাব মালা গাঁথিয়া বঙ্গবাসীকে উপহাব দিয়াছেন। এই গ্রন্থেব সহিত যে বাঙ্গালীব পরিচয় নাই, সে হতভাগ্য। ‘দ্বীলোকেব কপ’ ও ‘বসন্তেব কোকিল’ হইতে আবস্ত কবিয়া বর্তমান যুগেব বাঙ্গলৈতিক ও আন্তর্জাতিক নীতি এবং সমাজতত্ত্ববাদ বা কমুনিজম প্রভৃতি কিছুই এই গ্রন্থে বাদ যায় নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্তী দিব্যচক্ষে তখনকাব ভারতের বাঙ্গলৈতিক আন্দোলনেব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিল যে, “পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু এ জাতিব পলিটিক্স নাই। জয় বার্ধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো—ইহাই তাহাদিগেব পলিটিক্স। তন্নিম্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশেব মাটিতে লাগিবাব সম্ভাবনা নাই।” এই দুই প্রকার পলিটিক্স কি তাহা কমলাকান্ত একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বাবা বুঝাইয়াছেন।

শিবু কলুব পৌত্রের ভোজ্যান্নেব প্রতি লুপ্ত কুঙ্কর ধীরে ধীরে নানা প্রকার আবেদন নিবেদনেব ফলে কয়েকখানি মাছেব কাঁটা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কলুগৃহিণী কর্তৃক লোষ্ট্রাহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্বক পলায়ন কবিল। ঠিক সেই সময়ে এক বৃহৎকায় বৃষ উক্ত কলুব জাবনা খাইতেছিল, কলুগৃহিণীব তাডনায় ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, ববং তাহাব হৃদয়মধ্যে নিজেব শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশেব সম্ভাবনা জানাইয়া দিল এবং কলুগৃহিণীকে বণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। কমলাকান্ত বঙ্গবাসীকে

এই ছরকমের পলিটিক্স দেখাইয়া মন্তব্য করিলেন, “বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বুযেব দলের পলিটিশন, আর উল্সী হইতে আমাদের পরমাঞ্জীয় বাজা মুচিরাম বায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্করের দলের পলিটিশন।”

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভাবতের পলিটিক্সের প্রকৃত স্বরূপ কমলাকান্তেব এই কয়টি কথায় আশ্চর্যকপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবতেব প্রকৃত উন্নতিব জন্ম কোন্ রকম পলিটিক্স আবশ্যক, সে বিষয়ে বুদ্ধ কমলাকান্তেব উপদেশ ভাবতবাসী তখনও উপলব্ধি কবিতে পাবে নাই। এই উপলব্ধির পবিচয় প্রথম পাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে। বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা। ভাবতেব মুক্তিসংগ্রামে এই গ্রন্থ বিশেষতঃ বন্দেমাতরম সঙ্গীত যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসিদেশেব ভলটেয়ার ও কসোব বচনা ও জাতীয় সঙ্গীত “লা মাসে’লিস” ব্যতীত তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পাবে এমন কিছু আমাব জানা নাই।

আন্তর্জাতিক পলিটিক্স সম্বন্ধেও বুদ্ধ কমলাকান্তেব দিব্যদৃষ্টি অতি আশ্চর্যকমেব আধুনিক : প্রসন্ন গোয়ালিনীব গোক চুবিব মামলায় তিনি ইউরোপের International Law এর সাবমর্ম ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন—“যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আব পৃথিবীই বুঝ, ইনি তঙ্করভোগ্যা।” এই প্রসঙ্গে কমলাকান্ত আবও প্রচার করেন যে, যে ধেনুব দুগ্ধ পান কবে সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অর্ধ শতাব্দী পবে রাশিয়াতে লেনিন ও ট্রটস্কি এই মহৎ নীতির প্রচাব ও অনুসরণ কবেন এবং ক্রমে পৃথিবীর বহুদেশ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করে। বঙ্গদেশেও ‘লাঙ্গল যার মাটি ভাব’ এই সুরে যে আন্দোলন আবস্ত হইয়াছে তাহা কমলাকান্তী নীতিরই ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ মাত্র। জগতেব অতি আধুনিক গণতন্ত্রবাদেব মূল সূত্রগুলি একটি বিডাল অতি সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় যেকপ ব্যাখ্যা কবিয়াছিল, কমলাকান্ত তাহা লিপিবদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছেন। গণতন্ত্রবাদীদিগের মধ্যেও যাহাবা চবমপন্থী সেই প্রচোন বাকুনিদের ‘অ্যানর্কিজম’ বা ‘স্বেচ্ছাচাবিতা-বাদ’ ও এই মার্জাব পণ্ডিতেব সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কি আশ্চর্যকপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা দিতেছি। “পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত কবিয়া একজনে পাঁচশত লোকেব আহাৰ্য সংগ্রহ কবিবে কেন? যদি কবিল, তাবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহাব নিকট হইতে চুবি কবিবে, কেন না অনাহাবে মরিয়া যাইবার জন্ম এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।” শতবর্ষপরে আজ এই মতবাদ কেবল বিডালের নয়, ভাবতেব জনগণেব মূলমন্ত্র হইতে চলিয়াছে।

কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন যে, “মনেব বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়।” হাবান মনেব সন্ধানে পাকশালায়, প্রসন্ন গোয়ালিনীব গবাক্ততলে এবং রূপসী যুবতীর পশ্চাতে ফিবিয়া দেখিলেন, কোথাও মনচোবেব সন্ধান পাইলেন না। তারপর তাহাব



দিব্যদৃষ্টি হইল, বুঝিলেন, “ধন যশ ইন্দিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। পবেব জন্ম আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।” কমলাকান্ত তারম্বরে ঘোষণা কবিলেন, “আমি মবিয়া ছাই হইব, আমাব নাম লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমাব এই কথা বুঝিবে যে, পবসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল্য নাই। এখন যেমন লোকে উন্নত হইয়া ধনমান ভোগাদিবি প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইকপ উন্নত হইয়া পরেব সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মবিয়া ছাই হইব। কিন্তু আমাব এ আশা একদিন ফলিবে। ফলিবে, কিন্তু কত দিনে? হায়, কতদিনে!”

কমলাকান্তের আশা আজ মানবজাতিবি একমাত্র আশা। জাতীয় স্বার্থেব সংঘর্ষে পৃথিবীতে যে প্রলয়েব বহি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাব উপশমেব জন্ম রোমাঁ রোল্লা, বাট্রাঁও বাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক মনীষিগণ নানাভাবে যাহা প্রচাব কবিয়াছেন, একশতাব্দী পূর্বে কমলাকান্ত তাহাবই মূল দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিষময় ফল আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কমলাকান্ত তাহাব প্রকৃত কারণ ও নিবারণেব উপায় নির্দেশ কবিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, “মেটিবিয়াল প্রস্প্যারিটি বা বাহুসম্পদ ইংরেজী সভ্যতাব প্রধান চিহ্ন। আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আব সব বিস্মৃত হইয়াছি। ভাবতবর্ষের অগ্ন্যাদ দেবমূর্তি সকল মন্দিবচ্যুত হইয়াছে, সিদ্ধ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহুসম্পদের পূজা আবন্ত হইয়াছে।

“তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদব নামে বৃহৎ গহবর, ইহা প্রতাহ বুজান চাই, নহিলে নয়। এই গর্ত যাহাতে সকলেবই ভাল কবিয়া বুজে তাহার চেষ্ঠা মঙ্গলেব কথা বটে, কিন্তু উহাব বাডাবাডিতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী। তাহাব বুদ্ধিবি কি কোন উপায় হইতে পাবে না? তোমরা এত কল কবিতোছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধিবি জন্ম কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেবল হইয়া যাইবে।”

কমলাকান্তের এই উপদেশ এখনও সভ্য সমাজেব মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসেব মুখ হইতে বাঁচাইবাব অন্য পথ নাই। বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যত বড বড আদর্শেবই প্রচাব হউক না কেন, কমলাকান্তেব প্রস্তাবিত পথ ভিন্ন মানব-জাতিবি উদ্ধাবেব উপায় নাই।

আব দৃষ্টান্ত বাডাইব না। ‘কমলাকান্তেব দণ্ডে’ যে কত দার্শনিক তথ্য, ধর্মতত্ত্ব, মানব মনেব গূঢ় বহু, মানব জাতিবি বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্যতেব আদর্শ সবল সবস রচনায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাব ইয়ত্তা কবা যায় না। এই গ্রন্থে কমলাকান্তেব ছদ্মবেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে মূর্তি দেখিতে পাই, তাহা প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, আদর্শে মহান,

সহৃদয়তায় মহাপ্রাণ এবং শিক্ষায় ও বুদ্ধির প্রাথর্থে ভাস্বর। লোক-শিক্ষক, যুগপ্রবর্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যে আদর্শ ও ভাবসম্পদ তাঁহার বিশাল রচনাবলীর মধ্যে পাই, এই একখানি মাত্র গ্রন্থে তাহার সারমর্ম নিহিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের আব একটি দিক এই গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বড় পণ্ডিত, দার্শনিক, লোকশিক্ষক ছিলেন সত্য, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী—বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান। তিনি বাঙ্গালা দেশকে নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, ইষ্টদেবীর ন্যায় ভক্তি কবিতেন, এবং প্রণয়িনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। সাতকোটি বাঙ্গালী যাহাতে মানুষ হইয়া আবার বাঙ্গালার লুপ্ত গোবব উদ্ধার করিতে পাবে, এই ছিল তাঁব জীবনের ব্রত ও সাধনাব লক্ষ্য। তিনি যে বাঙ্গালীর চরিত্রের কুংসা ও কলঙ্ক প্রচাব করিয়াছেন, তাহা কেবল মনের গভীর হুংখে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্ম। দুর্গা প্রতিমাব মধ্যে তিনি বঙ্গমাতাবই মূর্তি পূজা করিতেন, বঁধুয়ার বিরহ সঙ্গীতে তাঁহার মনে পড়িত বঙ্গভূমির অতীত গোববের সুখস্মৃতি। সে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন নাই তাই তিনি নবদ্বীপের শ্মশান ভূমির প্রতি চাহিয়া যে স্বগত বিলাপোক্তি করিয়াছেন—এমন কে বাঙ্গালী পাঠক আছে. যাহাব হৃদয়ে সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি জাগে নাই? ‘আনন্দমঠেব বিশাল পটভূমিকায় দেশের প্রতি যে বেদনাবোধ আত্মবিকাশ করিয়াছিল, কমলাকান্তেব দুর্গোৎসব ও বঁধুয়াব গীতেব মধ্য দিয়া তাহার মর্মভেদী রূপ পাঠকের অন্তরে চিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কেবল সাহিত্যের উচ্ছ্বাস নহে, তাঁহার হৃদয়ের অকপট-অভিব্যক্তি। এই দেশ-প্রেমেব স্বরূপ ও তাহার প্রকৃত ভিত্তি কি, তাহা আনন্দমঠে বিবৃত হইয়াছে। দেশেব জন্ম জীবনসর্বস্ব পণ করাই, আমবা দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া জানি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে এ আদর্শকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আনন্দমঠেব ভূমিকাব উপসংহার—“নিবিড় অন্ধকাবে বিস্তৃত অবগ্য মধ্যে দেশসেবকের আকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, আমাব মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?” উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?” প্রত্যুত্তর বলিল, “পণ আমাব জীবনসর্বস্ব”। প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পাবে।” প্রশ্ন হইল আর কি আছে? “আব কি দিব?” তখন উত্তর হইল, “ভক্তি।”

বাঙ্গালী যে দেশেব জন্ম জীবন দিতে পাবে, তাহার অগ্নি পবীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও উচ্চ ও যে মহৎ ভক্তি, দেশমাতৃকা তাঁহার সন্তানগণের নিকট হইতে তাহারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন। সেই ভক্তির মূলমন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত। যে ঋষি সেই অপূর্ব সঙ্গীতেব সৃষ্টি ও এই নূতন ভক্তি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার জন্মতিথিতে বাঙ্গালীমাত্রই যেন তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম কবিয়া তাঁহার নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়।

(১৬ আষাঢ় ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ)

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা

শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরাণ-ঐতিহ্যেব একটি বিশেষ প্রকরণ তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের পর ভারতচেননা পুবাণ বাহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবেব পর ভারতের পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে পড়লে খ্রীষ্টীয় শতকেব গোড়াব দিকে সংস্কৃত ভাষায় বচিত পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচাব-আচরণকে পুনবাঁয় নৈষ্ঠিক অনুশীলনেব মধ্যে ফিবিয়ে আনাব চেষ্টা কবে এবং সমাজে সদাচার ও ত্রির্দেবতাশ্রমী পৌবাণিক অনু-ভাবনাকে নানাভাবে ভবিযে তুলতে চেষ্টা কবে। কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, হব্যকব্য, যাগযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল—বৌদ্ধধর্মের nihilism ধবণেব সর্ববৈনাশিক শৃগতা, তত্ত্বের দিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনেব দিক থেকে মারাত্মক। বৌদ্ধধর্ম ভাঙল অনেক কিছু। ‘ত্রিশবণ’-এব ত্রিশূলের খোঁচায় বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নেতিবাদী শৃগতা মানুষেব মনে স্থায়ী সান্ত্বনা এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। সম্ভারাম গৃহজীবনেব সুখশান্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থী শাস্ত্রযাজী সম্প্রদায় যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ কবেননি, তাব সাক্ষী হচ্ছে পুবাণ ও উপপুবাণ নামে ছত্রিশখানি গ্রন্থেব প্রচাব। এই পুবাণ সাহিত্য বেদব্যাসেব রচনা বলে চললেও গুণলি বিভিন্ন সময়ে বহু জনেব চেষ্টায় বচিত হয়েছে। অনেকেব হস্তক্ষেপেব ফলে পুরাণগুলিব পৌবাণ্য, গঠন ও রচনাব মধ্যে অনেক স্থলে শিথিলতা প্রবেশ করেছে। কতকগুলি তো অর্বাচীন কালেব বচনা। তাই কেউ কেউ (উইলসন) পৌবাণিক সাহিত্যকে হাজাবখানেক বছরেব রচনা বলে উডিয়ে দিতে চান। কিন্তু একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্তারনিংজ স্বীকার কবেছেন যে, পুবাণেব ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। (১) অথর্ববেদে চতুর্বেদেব সঙ্গে পুবাণেবও উল্লেখ আছে। সূত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুবাণেব যথার্থ গডনটি ধরা পড়েছে। ‘গৌতমধর্মসূত্র’ এবং ‘আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে’ পুবাণেব স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি অতি প্রাচীন, খ্রীষ্টেব জন্মেব চাব-পাঁচ শত বংসব পূর্বেব বচনা। সূতবাং অনুমান পুবাণেব পূর্বকপ খ্রীষ্টেব জন্মেব পবে নয়, তাব অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালেব মহাকাব্যে, বিশেষতঃ মহাভাবতের গডনটিতে পৌবাণিক ছাঁদ লক্ষ্য কবা যাবে।

(১) M. Winternitz—A History of Indian Literature, Vol. I, Part II, 1963 (C U.) Pp. 455-56

ভারতীয় আৰ্যসমাজে খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশতাব্দিক বৎসব পূর্বথেকে পুরাণের ধারা বহমান থাকলেও, আমরা যে-আকারে পুবাণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব ১ম খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুবাণকে অর্বাচীন বললেও ভ্যান্স কেনেডি উইলসনের এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পুবাণগুলি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক। একাদশ শতকেব তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেকনী আঠাবটি পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুবাণ পড়ে ফেলেছিলেন। সুতবাং উইলসনের পুরাণের কাল-সম্পর্কিত অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। সে যাই হোক, পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানু-চরিত) পুরাণ গ্রন্থ আদৌ অর্বাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুবাণে কবিত্ব ও কপকেব ভাষায় এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে যাব যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা মূনি ও রাজবংশের তালিকা এবং আবও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু অংশ বালমূলভ মনে হতে পারে। (২) কিন্তু এর বাহ্য বিস্তার ও অতিবজ্জিত বর্ণনা ছেড়ে দিলে এর মধ্যে একযুগের সমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমৎকার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা স্বীকার করতে হবে। পুবাণ ইতিহাস না হলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের খনি। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ সমগ্র ভারত-মানসকে ধারণ করে বেথেছে। আধুনিক যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ ও আৰ্য-সমাজ প্রাক-পৌরাণিক শ্রোতযুগে ফিবে যাবাব চেষ্টা করলেও সেকাল এবং একালের হিন্দুভারত কতটুকুই বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? উপনিষদ, বেদান্তাদি ষডদর্শন তো কবাজুলি-গণনীয় মুমুম্বু মানবের আধ্যাত্মিক পলায়ন। বস্তুতঃ

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাই বলুন, একালের অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভারতীয় পুবাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিন্তাবনিংজ মণিলাল দ্বিবেদী নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে স্টকহলমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টালিস্ট কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখাবাব চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ভিন্তাবনিংজের মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্যঃ “As a man of Western education he spoke of anthropology and geology, of Darwin and Haeckel, Spencer and Quatrefages, but only in order to prove that the view of life of the Puranas and their teachings upon the Creation are scientific truths, and he finds in them altogether only the highest truth and deepest wisdom—if only understands it all correctly, i. e., symbolically.”

—Winternitz-Ibid, p. 464.

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আর্যধর্ম, পবে হিন্দুধর্ম, একালে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম,—যে ধবণেব প্রেবণা ও নির্দেশ ভাবতীয় হিন্দুসমাজকে চালনা কবেছে, তার প্রায় সবটাই পুবাণাশ্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র কবে যে ধর্মহামণ্ডল গড়ে উঠেছে, মুনি-ঋষি-দেবতাবা যে পবিমণ্ডলেব সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও ভূগোলে যে সমস্ত যক্ষ-বক্ষ-গন্ধর্বাদিব বিচিত্র শোভাযাত্রা খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে একাল পর্যন্ত প্রসূত—তাব মূলটা পৌরাণিক।

২

ইংবেজ আমলের গোড়াব দিকে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত সাহিত্যেব সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুবাণেব প্রতি তাঁদেব কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বোধ হয় উইলসন-ই সর্বপ্রথম তাঁর *Essays on Sanskrit Literature* (1832)-এ এবং তাঁব অনূদিত বিষ্ণুপুবাণে পুবাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কবেন। ভ্যান্স্ কেনেডি তাবও এক বছর আগে *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology*-তে পুরাণেব প্রাচীনতা স্বীকাব কবেন। ইউজেন ব্লুফ, জুলিয়াস এগেলিং, মনিয়ব উইলিয়ম্‌স্, উইনডিশ, লুডার্স, পার্জিটার, ফাকু'হাব—এঁবা নানাভাবে পুরাণেব প্রামাণিকতা ও অগ্ণ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা কবেন এবং এই বিশাল সাহিত্যেব অনেক বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত কবেন। এঁদেব কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও উত্তব-বৈদিক আচাবানুষ্ঠান ও ভাবধাবা ইদানীং ভাবতে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পুবাণ-কেন্দ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকটা বজায় আছে। সুতরাং হাজার দুই বছবেব ভাবতীয় মানসেব মূল বহন্য বুঝতে গেলে পুবাণসাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যেব সঙ্গে। প্রায় দেড়শ বছর ধবে তাঁবা নানাভাবে সে কাজ কবে চলেছেন।

বাংলাদেশে একালে পুবাণেব প্রভাব সম্বন্ধে দু'-এক কথা আলোচনা কবা যেতে পাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুবাণেব ঘোব বিকল্পতা করে দোম আন্তোনিও দো বোজাবিও নামে এক ধর্মাস্তবিত বাঙালী ক্যাথলিক খ্রীষ্টান 'ব্রাহ্মণ-বোমান-ক্যাথলিক সংবাদে' অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দুধর্মীয় আচাব-আচবণকে নিন্দা করেন। পববর্তীকালে খ্রীবামপুবেব প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীবা উইলিয়ম কেরীব নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যেব বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বচনা ও মুদ্রণেব ব্যবস্থা কবেছিলেন। কিন্তু এসমস্ত প্রচেষ্টাব মূল লক্ষ্য হল খ্রীষ্টানধর্ম প্রচাব। পুবাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ কবে তৎস্থলে 'মথিলিখিত সুসমাচার' প্রচাবেব দিকেই তাঁবা নিবন্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। তাঁবা কুক্তিয়াসক্ত ও পুতুলপূজক কৃষ্ণকায় হীদেনদেব, যিশুখ্রীষ্টেব ককণাব ধর্ম অর্থাৎ 'Religion of Mercy'-র ছায়াতেলে আনতে চেয়েছিলেন। এ কার্যে কিছুটা অগ্রসব হয়ে তাঁবা দেখলেন, সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত পুবাণেব অপ্রতিহত প্রভাব। তখন তাঁবা পুবাণকাহিনী ও *Motif*-এব

মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও দুর্নীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য হেলেনীয়, হিব্রু ও খ্রীষ্টানী শাস্ত্রসংহিতা ও পুবাণে যে অনুকপ ব্যাপার প্রচুর আছে (৩) এবং পৌরাণিক যুগের সাহিত্য ঐ বকমই হয়ে থাকে, একথা তাঁরা মানতে চাননি—ধর্ম-প্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিবোধ বাধে তাবও মূল কারণ—এই পৌরাণিক সংস্কারের মূল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ। মিশনারীরা হিন্দু পুবাণ তত্ত্বাদি নিন্দা করলে বামমোহন ‘ব্রাহ্মণসেবধি’-তে বলেন যে, মিশনারীরা হিন্দু পুরাণ-গ্রন্থকে যে জঘ নিন্দা কবছেন, ঠিক অনুকপ ব্যাপার খ্রীষ্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে ভাবতীয় পুবাণ সাধারণের জঘ উদ্দিষ্ট। সংস্কৃত পুবাণ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরবোপাসনার প্রাথমিক সোপান। উচ্চস্তরে উঠলে পুবাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনার সাবভাগ—মিশনারীরা যাব বিশেষ সংবাদ রাখতেন না। বামমোহন এইজন্ত ‘ব্রাহ্মণ-সেবধি’তে তাঁদের আক্রমণের প্রতিবাদ কবেছিলেন। পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী বামমোহন পুবাণের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখাননি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তের জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব ও বামমোহনের একেশ্বরবাদ তত্ত্বতঃ একবস্ত্র নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, যতুজয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মাতৃগণ্য ব্যক্তিরা সমাজসংরক্ষণের জন্ত পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অপর্বদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ‘ইয়ং বেঙ্গল’-দল, খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত মুর্খিমের বঙ্গ-সন্তানগণ এবং বামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীরা—একে অপরের সঙ্গে নানা বিষয়ে

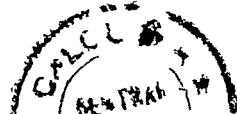
(৩) রামমোহন, বাইবেলের মধ্যে যে একই বকম পৌরাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন, “অতএব মিসনরি মহাশয়দিগের বিনয়-পূর্বক জিজ্ঞাসা কবি যে তাহারা মনুষ্যকপবিশিষ্ট যিশুখ্রীষ্টকে ও কপোতকপবিশিষ্ট হোলি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখ্রীষ্টের চক্ষুবাণী জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেঞ্জিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কিনা। তেঁহ আপন-মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কিনা ও তাঁহাব মৃত্যু হইয়াছিল কিনা এবং সাক্ষাৎ কপোতকপবিশিষ্ট হোলি গোস্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিত কিনা আর জীব সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কিনা যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার কবেন তবে পুবাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নামকপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে জীপুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকাববিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভূত্ব থাকে না যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভূত্ব সম্পূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।”—ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২

মতপার্থক্য অবলম্বন কবলেও, একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল। তা হল পুরাণাদি প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুবাণ অনুদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচাৰলাভ কবেছিল। বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণু-কৃষ্ণবিষয়ক পুবাণেব মুদ্রণ ও প্রচাৰ ধর্মীয় কৃত্যের অত্যন্ত অঙ্গ বলেই গ্রহণ কবেছিলেন। তাঁবাও একাধিক বৈষ্ণব পুরাণ প্রচাৰে আত্মনিয়োগ কবেছিলেন।

রাজনাবাষণ বসু উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মমত প্রভৃতি সিঁড়িগুলি একে একে পাৰ হয়ে ‘হিন্দুধর্মেব শ্রেষ্ঠতা’ পুস্তিকায় স্বীকাৰ করেন, “নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।” ‘বুদ্ধ হিন্দুব আশা’ পুস্তিকায় তিনি যে ‘হিন্দুমহাসমিতি’ গঠনেব কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীবা উপেক্ষিত হননি। তাতে তিনি প্রস্তাব কবেন যে, সমিতিব কার্য আৰম্ভেব পূর্বে “কুমাবিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে।” তাঁব মতে ভাবতবর্ষেব পৌরাণিক ধর্ম দু’দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথম—এই বিশেষ দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন কবে উপনিষদ-বেদান্তাদি নির্দিষ্ট ঈশ্বরবত্তে পৌছান সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয়—সমগ্র ভাবতবর্ষকে সংস্কৃতিব দিক থেকে একতাবদ্ধ কবতে হলে সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থাৎ পৌরাণিক মত, তাকেই অবলম্বন করতে হবে। বামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীব দল, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানের ‘কৈশবীদল’ ও ভাবতবর্ষীয় সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ—এঁদেব মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বর মতপার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই কমবেশী পুবাণবিবোধী ছিলেন। কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় ততটা পুবাণবিদ্রোষী ছিলেন না। তিনি ভক্তিব আবেগে পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন কবতে কুণ্ঠিত হননি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জস্য রক্ষা কবে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায সেই বীতিই অবলম্বন কবেছিলেন। পুবাণ-ঐতিহ্যেব প্রতি তাঁব বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে ব্রাহ্মসমাজ পাবম্পরিক বিবোধে কিছু হীনবল হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদাবনৈতিক ব্রাহ্ম পুবাণকে আৰ কুসংস্কাৰ বলে অবহেলা কবলেন না। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের যুব-সমাজেব উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ধর্মকে পবিত্যাগ কবে বাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবায় সঞ্চাবিত হল। এরই কিছু পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদেবা পুরাণের ইংবেজী অনুবাদ কবে এবং পুরাণেব উপব বৈজ্ঞানিক গবেষণা কবে শিক্ষিত ভাবতবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি এব প্রতি ফেবাত্তে সমর্থ হলেব। এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ধবণের শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত কবেছিলেন, কিন্তু ইংবেজী শিক্ষাব ঝোঁকে ব্রাহ্মসমাজ ও ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর দিকে ঢলে পড়েননি। তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কাৰেব প্রতি বিজাতীয়



বিশেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের পব এবং পববর্তীকালে ‘প্রচাব’ ও ‘নবজীবনে’ আলোচনা করার সময়ে হিন্দুধর্ম ও পৌরাণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে অনুসন্ধান কবেছিলেন। ‘বিবিধ প্রবন্ধ’, ‘কৃষ্ণচবিত্র’, ‘ধর্মতত্ত্ব’, গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, ‘দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম’ প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইমস্টিটিউশন-এর অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টিংস সঙ্গে তাঁর লিপিবদ্ধ থেকে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা কঁবা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পূর্বাণ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তও বোঝা যায়।

১২৯২ বঙ্গাব্দের আশাঢ় মাসের ‘প্রচারে’ “রাধাকৃষ্ণ” নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গোবদাস বাবাজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন :

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম স্থাপন কবিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকাব তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত কবিয়া এই ধর্মার্থরূপকটি গঠন করিয়াছিলেন।...কৃষ্ণ রূপক নহেন তিনি শবীবী, অগ্ন্যস্ত্র মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর।”

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত রূপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা স্বীকার করেননি। ‘ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

“ত্রিদেবের অস্তিত্বেব যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের সাকাব বলিয়া স্বীকার কঁবা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসে কোন কাবণ আমরা নির্দেশ করি নাই।”

এখানে লক্ষ্য কঁবা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিদেবের অস্তিত্বেব যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তাঁদেব সাকাব বলে গ্রহণ কবতে পারেননি। বরং সেই সমস্ত পৌরাণিক কথাকে “অদ্ভুত উপন্যাসেব বিষয়” বলে কিছু ব্যঙ্গই কবেছেন। তাঁর এই বক্তব্যেব মধ্যে একটু গভীরভাবে অনুপ্রবেশ কবলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকাবাস্তবে পৌরাণিক দেববাদ ও ঐতিহ্যকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু ‘কৃষ্ণচবিত্র’-এর প্রথম খণ্ডে তিনি “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” বলে স্বীকার কবেছেন—“আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পবিণাম আমাব এই হইয়াছে যে, আমাব সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।” এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসর্গিক, অসম্ভব ও অবাস্তব—এমন বিস্তব ব্যাপার অস্ত্রদেশেব প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজস্র আছে। লিভি, হেবোডোটস,

ফেবিশ্‌তা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকাবগণ সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা ও অতিবর্ণনের রং মেশাতেন। প্রাচীন ভাবতীয় পুবাণে, মহাকাব্যে ও ইতিহাসে এই ধরণের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যাবে। সেই অতিবর্ণন ও অলীক কথা থেকে পুবাণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে বক্ষা কবতে পাবলে তাব মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের নতুন স্বরূপ ফুটে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনেব পটভূমিকা আলোচনা কবলে দেখা যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংবেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার ঘোব বিকল্চারণ কবলেও নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্য—যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বেনেঙ্গাঁস বলা হয়, তার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ কবেছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নাট্যকাব গিরিশচন্দ্র—এরা সকলেই পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি কবেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পুবাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেববেই গ্রহণ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তিব দ্বাৰা চালিত হয়ে পুরাকথাকে মার্জিত করে নিয়ে সাহিত্যে তাকে গ্রহণ কবা—ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐনৈসর্গিকতা, অতিবর্ণন ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রক্ষেপেব ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুবাণে অনেক অবাস্তব ব্যাপার অনুপ্রবেশ কবেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ মানসিকতাব দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা কবে একালের অনেকে পুবাণেব বাগবাহুল্যের মধ্য থেকে প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধাবেব চেষ্টা কবছিলেন। কেউ প্রাচীন কাহিনীর অন্তবালে কপকাশ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ কবতে চাইছিলেন, কেউ-বা পুবাণেব মধ্যে একালের ইতিহাসেব অনুকপ ব্যাপাব সন্ধান কবছিলেন।

পৌরাণিক দেবমণ্ডলের দুই প্রধান কুলপতি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিষ্ণুকে কেন্দ্র কবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয়। এই নব্য বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা মধ্য যুগেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নয়। আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একধরণের মানবহিতবাদমূলক নৈতিক আদর্শেব পটভূমিকায় কৃষ্ণকে উপস্থাপনাব চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয়। নবীনচন্দ্র তাঁর ‘ত্রয়ী’ মহাকাব্যে কৃষ্ণচবিজ পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পাবে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সমাজ, যাঁরা মোটামুটিভাবে পবম্পবাগত ভাবত-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পুবাণেব কৃষ্ণকেই নতুন কবে যুগোপযোগী কবে নিতে চাইলেন। এই মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌরাণিকতা। পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন না দিয়ে তাব অতিবর্ণন ও কপকেব খোন্সেব মধ্য থেকে যথার্থ কপ আবিষ্কার কবা, ইতিহাসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুঁজে বার কবা—এই যুগের আধুনিক শিক্ষিতসমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাভ কবে। অবশ্য এর একটা উগ্র

chauvinistic কপ শব্দ তর্কচূড়ামণি (৪) প্রচারের মধ্যে ফুটে উঠল যা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেনি। সে যাই হোক, ব্রাহ্ম বাজনারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও খ্রীষ্টান মধুসূদন বাধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা করে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করেননি। তাঁর পূর্বে বিদ্যাসাগর, যিনি পৌৰাণিকতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না, তিনিও ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে ‘বাসুদেব চবিত’-এর কিয়দংশ রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাঁর অন্যতম ভক্ত ও পার্শ্বচর উপাধায় গোবিন্দগোবিন্দ, রায়কে কৃষ্ণচবিত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত করেছিলেন। জৈলোক্যনাথ-সাম্বাল (‘চিবঞ্জীব শর্মা’) তাঁরই নির্দেশে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কখনও কখনও আবেগ বশতঃ ‘নির্বিকার হবি’ এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন :

“মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তির দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক, পরলোক, মা আমার সম্পদ মুহূর্ত। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ কবিও না। এই মা তাঁহার আপনাব কোলে বাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল মুখে বাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ী জয়। জয় সচ্চিদানন্দ হবে।”
(‘আচার্যের প্রার্থনা’)

আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র পৌৰাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন একথা স্বীকার কবতে হবে।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করার জন্য একটি জীবন্ত বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কোং-পহী হলেও পরবর্তী কালে তাব সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সংযুক্ত করেছিলেন। এই সেশ্বর কোংদর্শনই তাঁকে অনুশীলন ধর্ম (*Religion of Culture*) (৫) অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যভূত মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল।

(৪) ‘দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম’ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের (‘প্রচারে’-প্রকাশিত) পাদটীকায় শব্দ তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন : “পণ্ডিত শব্দ তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার কবিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।” (‘বিবিধ প্রবন্ধ’—বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭)

(৫) লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক ম্যব জন ববার্ট সীলী (১৮৩৪-৯৫) মূলতঃ ছিলেন ইতিহাসে আসক্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ (*Ecce Homo*, 1865) খ্রীষ্টানধর্মসংক্রান্ত, যাতে তিনি খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই গ্রন্থেই

“গৌবদাস বাবজিব ভিক্ষার ঝুলি” (‘বিবিধ প্রবন্ধ’, ২য় খণ্ড) এবং ‘ধর্মভক্তে’ (ক্রোড়পত্র-খ) গুরু-শিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় বৈবাগ্যবাদ বা মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানী সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। মানববৃত্তি সমূহের সুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুরুষার্থে (ঈশ্বরভক্তি) উন্নয়ন—একথাই তিনি ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচবিত্র ও অজ্ঞান প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দু ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মার অন্তরে। এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, আচারসর্বত্র কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হিন্দু হিন্দু নয়, এবং আচারবিচারহীন ভক্ষ্যভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবনযাপনকারী ব্যক্তি—তিনিই যথার্থ হিন্দু। এই দুই ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, “এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি? একব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়” (‘দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম’)। অর্থাৎ আচার নয়, সন্ন্যাসগামী নবোত্তমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। সেই সর্বোত্তম নবোত্তমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য অনুশীলন করতে লাগলেন, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রম করে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে সেই আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধারণ করলেন। এ সম্পর্কে ‘কৃষ্ণচবিত্র’-এর উপক্রমণিকা থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে :

“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেব যথার্থ কিকপ চবিত্র পুরাণে ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবাব জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপহাসকার কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপহাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পবন পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।”

বলা বাহুল্য এই ‘পাপোপাখ্যান’-এর প্রায় সবটাই কৃষ্ণ-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। ‘কৃষ্ণচবিত্র’-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-বাধা-গোপীলীলার প্রতি অতিশয় প্রতিকূল

তিনি সবিস্তারে অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ অনুবাগী ছিলেন। ১২৯১ সালে প্রকাশিত “দেবীচৌধুরাণী” এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ধর্মভক্তে (১২৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর বচন উদ্ধৃত করেছেন—
 “The substance of religion is Culture, the fruit of it, the Higher Life”
 (Ecce Homo P. 145) তাঁর চিন্তায় সীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয়।

ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, “এ সকল পুবাণকাবকল্পিত উপাশাস মাত্র, ইহাব কিছুমাত্র সত্যতা নাই।” ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজ্যাম্যহম্’—গীতাব এই বাণী সত্ত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পবদাবাভিমর্ষণ বলে নিলিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব হানিকব উপাশাস অতিশয় অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনোভাবের উদ্দেশ্যে উঠতে পাবেননি। কাজেই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেব সাধ্যসাধন অনেক সময়ে তাঁর কাছে “কামকুসুমদামশোভিত” ইন্দ্রিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে। ‘গীতগোবিন্দ’ ও জয়দেব সম্বন্ধেও তাঁব ধাবণা এই ধরণেব প্রতিকূল—“যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীব হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।” তাঁব ধাবণা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে “কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য।” কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অযথ দূর্নীতিপূর্ণ গালগল্প স্থান পেয়েছে। হবিবংশ, বিষ্ণুপুবাণ, ভাগবতে যে ধবণেব কৃষ্ণ-গোপীলীলা বর্ণিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাব মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা কবেছেন বটে, কিন্তু মাঝখানে বাদ সেধেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এ পুবাণেব প্রাচীন বচনায় কি ছিল জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচাবিত হয়েছে তাতে বাধাকৃষ্ণের চরিত্র আদিবসেব উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে। তাঁদেব আচাব-আচবণ ভাববৃন্দাবনেব তুবীয়লোক ছেড়ে ভোমবৃন্দাবনেব ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেব প্রভাব দেখা যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: “ব্রহ্মবৈবর্তকাব সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি কবিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মেব নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অগ্ন পুবাণে নাই। বাধাই এই বৈষ্ণবধর্মেব কেন্দ্রস্বকপ।” সাময়িকপত্তে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচবিত্র এবং গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণেব অনৈসর্গিক বালালীলা এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পাবেননি। ‘ধর্মতত্ত্বে’ তিনি বাধাকৃষ্ণেব ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের এইভাবে ধমক দিয়েছেন—“যাহাবা বাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে কবে, তাহাবা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ” (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়)। এই ধবণেব লীলাকে তিনি ‘ধর্মতত্ত্বে’ আধ্যাত্মিক বলে শোধান কবেছেন—“সচবাচর লোকেব বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অগ্নীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে বাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপাবে পবিণত কবিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্ববোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তবজ্রিনী বৃত্তির চবম অনুশীলন, চিত্তবজ্রিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্ববযুখী কবামাত্র।” অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণেব গোপীলীলাকে তিনি ‘with a grain of salt’ গ্রহণ করতে চান—আদিবসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে বাধাকে প্রত্যক্ষ কবেন বঙ্কিমচন্দ্রেব দৃষ্টি যে অবিকল তাব মতো ছিল না, তা শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্ববে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন;

‘একজন ভক্ত বলিলেন, “শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চবিত্র লিখেছেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।” —কথায়ত, ৩য়।

পবে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, “ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা কবেন, একথা কেমন কবে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদেব ইংবেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।” তখন ‘প্রচাবে’ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে পূজার প্রাকালে কৃষ্ণচরিত্র ‘প্রথম ভাগ’ নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এব ছ’ বছর পবে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম সংস্করণে চেয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ও বিশাল আকারে ‘কৃষ্ণচবিত্র’-এব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ছ’ বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন :

প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ কবিয়াছিলাম, এখন তাহাব কিছু পবিত্যাগ এবং কিছু কিছু পবিবর্তিত কবিয়াছি। কৃষ্ণের বালালীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমাব বক্তব্য। একপ মত পবিবর্তন স্বীকার কবিতো আমি লজ্জা কবি না। আমাব জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পবিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত পবিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ‘বঙ্গদর্শনে’ যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আব এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকাবে যত দূর প্রভেদ, এতদ্বয়ে ততদূর প্রভেদ।”

‘আলোক অন্ধকাবে যত দূর প্রভেদ’ বাক্যাংশের অর্থ—প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ-চবিত্রের যাবতীয় অলৌকিকলীলা, যা নৈসর্গিকতাকে লঙ্ঘন কবে এবং বাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গোপীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত কবে তাকে প্রস্তুত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ‘বঙ্গদর্শনে’ (পৌষ) মানস-বিকাশ নামক একখানি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতা বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এব পব প্রায় দু’ বছর পবে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৮২, চৈত্র), ‘বঙ্গদর্শনে’ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’র সমালোচনা কবতে গিয়ে তিনি বলেন :

“বৈষ্ণব কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়েব পুষ্কির্ব—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাহারা এইরূপ বিবেচনা কবেন, তাহাবা নিতান্ত অসাবগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলাব এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়েব যথার্থ্য নিকপণ জন্ম আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।”

এবপর তিনি প্রশ্ন তোলেন—মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি এক চবিত্র ? “চারিজন গ্রন্থকারই (অর্থাৎ মহাভারতের ব্যাসদেব, ভাগবতকার, জয়দেব ও বিদ্যাপতি) কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক-প্রকার সে ঐশিক চবিত্র চিত্রিত করিয়াছেন ?” অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিৎ জবাব দেবার চেষ্টা করলেন ‘বিবিধ সমালোচন’ (১৮৭৬) গ্রন্থে “কৃষ্ণচবিত্র” নিবন্ধে। ‘বিবিধ প্রবন্ধে’ প্রবন্ধটি পবিত্যক্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁকে পবিত্যাগ করেননি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার মন্বন কবে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্ত মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাব প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দেব আশ্বিন মাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন ‘প্রচাবে’র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় কৃষ্ণচবিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দেব জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ‘প্রচাবে’ প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি কৃষ্ণচবিত্র লিখতে থাকেন। এর কয়েকমাস পবে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ‘কৃষ্ণচবিত্র প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকাবে প্রকাশের পব ঐ ‘প্রচাবে’-ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পবিচ্ছেদ (‘প্রস্তাব’ ও ‘যাত্রা’—দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডেব অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ’ বছর পবে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে ‘কৃষ্ণ-চবিত্রে’র সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণকপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ গোপী-লীলাদি আদিবসের কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্য আবিল আদিবসকে ভক্তিরসেব গঙ্গাদকে শোধন কবে নিয়েছেন। ‘কৃষ্ণচবিত্র’-এব প্রথম সংস্করণ যে বৎসর এবং যে মাসে (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই শ্রীবামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মর্ত্যলীলা নির্বাহ করলে দেখতে পেতেন, ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ‘কৃষ্ণচবিত্র’ এব দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার কবেছেন, এমনকি বস্ত্রহরণ, বাসলীলা প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার “আধুনিক কচির বিকল্প” হলেও এবং “সেই সকল বর্ণনার বাহ্য দৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে” (কৃষ্ণচবিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পবিঃ)। তাব পব তিনি গীতাব বচন উদ্ধৃত কবে বলছেন :

“যৎ কল্পোসি যদশ্মাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ—ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্বাৰ্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্ত তাহাবা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারী হইল।”

শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন :

“বাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পাদিত পবিগয়, শক্তিমানের শক্তিব স্তুতি, এবং শক্তিবই বিকাশ উভয়ের বিহাব। . . . বাধা, ধাতু আবাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা তিনিই বাধা বা রাধিকা।”

পৰিশেষে এই বলে উপসংহার কবেছেন : “রাধা কৃষ্ণাধিকা আদর্শকপিণী গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই।”

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে জগদীশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যভূত নরোত্তম, ভক্তের ভগবান, প্রার্থীর বাঞ্ছাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্মসংস্থাপনের জন্য চক্রধারী ‘কলয়সি কববালম্’। তাঁর মতে “খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কোপীনধারী নির্মল ধর্ম-বেত্তা।” কিন্তু কৃষ্ণই হচ্ছেন নবজাতির একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক। সে যাই হোক, এই সময়ে পূবাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে দুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেকে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন, “সংস্কৃতভাষায় যে কিছু বচনা আছে, যে কিছুতে অনুবাদ আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত।” প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এঁরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে “মহাপাতকী, নাবকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।” আর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্যের ‘ইণ্ডোলজিস্ট’গণ, যাকে বলতে পারি আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাঁদের অনেকেই ঔপনিবেশিক দস্ত বশতঃ প্রাচীন ভাবতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক ভাবতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে ‘পাণ্ডুবা’ প্রমাণ রয়েছে বলে সেটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রাচীনতা কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু হিন্দু ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের কাবও কাবও মানসিক ‘অ্যালার্জি’ আছে। “তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভাবত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভাবতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য।” (৬) আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দুই দলকে বাদ দিলেন। এ ছাড়া আর এক দল আছে। এঁরা হলেন ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণকারী। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঝাঝালো হলেও অর্থোক্তিক নয়— “যাঁদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা ইন্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়তে বিলাতী কুকুর, সকলেবই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূবে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না,”—বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেকদণ্ডী জীবদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁবা উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও “দেশবৎসল ও সত্যপ্রিয়”, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্যই কৃষ্ণচবিত্র বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথবা শাস্ত্রচর্চাৰ জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পূবাণালোচনা এবং কৃষ্ণচবিত্র ব্যাখ্যানের প্রবৃত্ত হননি। কৃষ্ণচবিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যাব মধ্যে দৈবী মহিমা নয়, মানুষের মর্ষাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(৬) ‘লোকবহুত্বে’ “বামাধনের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত”
কৌতুক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের পল্লবগ্রাহী বিলাতী পণ্ডিতদের সবস ব্যঙ্গ করেছেন।

পুৰাণাদি বিশ্লেষণে প্ৰস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুৰাণকাবোৰা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে ভূতলচাৰী সামান্য মানুহে পৰিণত কৰেছেন, মানুহেব নানা ধৰণেৰ চাৰিত্ৰিক দুৰ্বলতাও তাঁৰ চৰিত্ৰে বয়েছে। মহাভাৰত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুৰাণেৰ পুংথানুপুংথ বিশ্লেষণ কৰে বঙ্কিমচন্দ্ৰ দেখলেন, যে পুৰাণ যত অৰ্বাচীন, তাতে কৃষ্ণচৰিত্ৰেৰ অনৈসৰ্গিকতা ও মানবিক দুৰ্বলতাৰ ভাগ তত বেশী। (৭) শুধু কৃষ্ণকেন্দ্ৰিক পুৰাণ কেন, শৈব পুৰাণেও এমন অনেক প্ৰসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালেৰ পাঠক চমকে উঠবেন। বলা বাহুল্য পুৰাণগুলি একসময়ে বা একহাতেৰ লেখা নয়। হাজাৰখনেক বছৰ ধৰে পুৰাণেৰ বহু পুঁথি ও তাৰ নকল হয়েছে, অনেক অপ্ৰাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপাৰ উচ্চতৰ দাৰ্শনিকতাব সঞ্চে অবিবোধে এৰ মধ্যে বাস কৰে আসছে। একথা মনে বাখতে হবে যে, দেবভাষায় লেখা পুৰাণমাত্ৰেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দৰ্শন, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্ৰে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁৰ পক্ষে পুৰাণকথাকে পুৰোপুৰি হজম কৰা কঠিন। তাই বঙ্কিমচন্দ্ৰ কৃষ্ণচৰিত্ৰেৰ যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে ততুল ও তুষ আলাদা কৰবাব চেষ্টা কবলেন। তিনি কালানুক্রমিক পৰ্যায় নিৰ্ণয় কৰে, কোথায় তুসেৰ ভাগ অধিক তা নিৰ্দেশেৰ জন্ত সাধাৰণ জ্ঞান, বাস্তব চেতনা ও যুক্তিবুদ্ধিৰ যৌক্তিকতাৰ উপৰ বেশী গুৰুত্ব আৰোপ কবলেন। যেখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উদ্ভট অলৌকিকতাৰ বাহুল্য প্ৰবেশ কৰেছে, সঙ্গতিবোধেৰ অভাব ঘটেছে, পুৰাণেৰ সেই অংশকে তিনি প্ৰক্ষিপ্ত বলে পৰিত্যাগ কৰবাব পক্ষপাতী। অবশ্য পুৰাণেৰ মধ্যে কতটুকু প্ৰাচীন ও যথার্থ, আৰ কতটুকু অৰ্বাচীনকালেৰ প্ৰক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তাৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা কঠিন। আমবা যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সম্ভাব্যতাৰ মাপকাঠি দিয়ে পুৰাণসাহিত্য বিচাবে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহৃত। কিন্তু গ্ৰীক, হিব্ৰু ও খ্ৰীষ্টানী পুৰাণেও এমন অনেক গালগল্প আছে যে, তাৰ মধ্যেও যুক্তিবুদ্ধিৰ বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্ৰ-অবলম্বিত গজকাঠি দিয়ে মাপলে পশ্চিমেৰ তামাম পুৰাণ-গ্ৰন্থকে বাতিল করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষ পঁচিশ বৎসৰ—যখন প্ৰাচীন ভাৰতীয় ব্যাপাবেৰ প্ৰতি স্বাদেশিক ভাৰতবাসীৰ দৃষ্টি ফিৰছিল, তখন পুৰাণকেও অশ্ৰদ্ধাৰ আঘাত থেকে উদ্ধাৰ কবাব চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্ৰ দেখলেন, তাৰ পৰতে পৰতে ধুলোবালি জমেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেৰা সে মলিন আন্তৰণ ভেদ কৰতে অপাৰগ হয়ে পৌৰাণিক ঐতিহ্যেৰ শুধু দোষকীৰ্তন কৰেছেন। পুৰাণকে যুগসঞ্চিত

(৭) ভিন্তাৰনিংজ্‌ও এই মতে বিশ্বাসী। তিনি এ সম্পৰ্কে স্পষ্টই বলেছেন, “The later the Purāṇa—this may be regarded as a general rule—the more boundless are the exaggerations.” (*Indian Literature*, Vol. I, Part II, P. 465, Calcutta University, 1963)

মালিন্য থেকে বক্ষা কবতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে মধ্যস্থ মেনে অগ্রসব হলেন। পুরাণ ভক্তিগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলেই নয়,—বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা কবলে এবং তুলনাকণা থেকে তুষ বেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। (৮) এহ দুকহ কর্মে ত্রুতী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক হাতে পাশ্চাত্য দোষদর্শী গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদের নয়নে জ্ঞানাজ্ঞান শলাকা প্রয়োগ কবতে হয়েছে। পুরাণকে নবীকবণ নয়, পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথার্থ বর্ণনা স্মীত হয়ে মূলকে আবৃত কবেছে, কোথাও কোথাও বিকৃত কবেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাবই বিকল্পে যুক্তিব অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাভোর বিকল্পে এভাবে যুদ্ধ কবা মহাসম্ভবান পুরুষেব পক্ষেই সম্ভব। ‘বঙ্গদর্শন’গোষ্ঠী ও তাঁব শিষ্য সম্প্রদায় এদিক থেকে তাঁব বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র গেনেব মহাকাব্যত্রয় আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেননাথ শীল এই যুগকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসবকে ‘Hindu religious revival’-এর যুগ বলেছিলেন। (৯) কিন্তু revival শব্দটিতে পুরাতনের অনুসৃতি বোঝায়। বঙ্কিম-প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুয়ানিকে কি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ কবেছিল? এ যুগে যখন যবে ফেরাব পালা শুরু হল, তখন স্রোতোধারা গোমুখীগহ্নবে ফিবে যাবাব বুধাচেষ্টা করেনি; জীবন ও ঐতিহ্য নতুন পথেই চলতে শুরু কবল। পুরাতন সাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচাব করে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে অনুঘর্ষ-বিসর্গেব টঙ্কাব সৃষ্টি কবতে চাননি। বুদ্ধি ও বিবেকেব বক্ষয়ত্রে চোলাই কবে পুরাণকে গ্রহণ কবতে হবে। বেদব্যাস, বোপদেব বা অশ্বাশ্ব লেখক, যাঁবাই পুরাণ রচনা ককন না কেন, এর মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপাব প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাব থেকে পুরাণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কল্মষ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয় যুগধর্ম-সন্ধানেরও উপযুক্ত পবাবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে পুরাণকে নব্যজীবনের পাশাপাশি দাঁড কবাতে হলে এই গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত্ন মহিমায় স্থাপন কবতে হবে। নাবাসণ, নর, নবোত্তম ও দেবী সবদ্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসব হলেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডেই পুরাণকে বিচার-বিলেপণ ও গ্রহণ-বর্জন কবেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনেব মূল কথা হল মানবিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণেব মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান কবতে লাগলেন। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায নেই, যা যুগধর্ম বিরোধী, পুরাণেব সেই অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেলে না—অনেকটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেব উপনিষদ-আনুগত্যেব মতো। যদিও উপনিষদ মহর্ষিবে আত্মার খাদ্যপানীয়ে পর্যবসিত হয়েছিল, তবু তিনি বহু-

(৮) দ্রষ্টব্য : *Indian Literature* (Winternitz), Vol. I, Part II, Pp. 464-65 (Calcutta University Edition, 1963)

(৯) B. N. Seal—*New Essays in Criticism*

প্রচারিত এগাবখানি উপনিষদের সব মন্ত্রই ব্রাহ্মসমাজের অনুকূল বলে গ্রহণ কবতে পারলেন না। বৃহদাবগ্যকেব 'সোহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যেব 'তত্ত্বমসি' নিয়ে মহর্ষি বড়োই চিন্তায় পড়লেন। আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্যসহ উপনিষদগুলি কি ব্রাহ্মসমাজেব দার্শনিক বীজ হতে পাবে? উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৃত্তিব দ্বারা পবিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছা বাছা ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তা তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন। (১০) এইভাবে ষষ্ঠী তিনেকেব অনুলিখনে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ বচিত হল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহর্ষি স্বানুভাবানুকূল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ কবেছেন, সমগ্র উপনিষদকে নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি? এ-ব্যাপাবে দেবেন্দ্রনাথ অক্লেব মতো গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখাননি। তাঁব আদর্শ ও উদ্দেশ্য যাব দ্বারা সিদ্ধ হবে, তিনি উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচাবে নিয়োগ করেন। বঙ্কিম যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্ডিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্ত কার্যকাবণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতাব যৌক্তিকতা নির্ধাণে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মোটকথা পূর্বাণ ও পুরাণজাতীয় ভাবতীয় ঐতিহ্যেব যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও স্বাভাবিকতা-অনুমোদিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌকিকতাব মোহযুক্ত, তাকেই আমরা নব্যপৌরাণিকতা বলতে পাবি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁব শিষ্য-প্রশিষ্যেব দল সেই পথেব পথিক। কৃষ্ণচবিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতাব অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বেদানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বুদ্ধিমাগীয়া বাস্তব নীতিকে অনুসরণ কবেছিলেন। পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারেব এই বীতিটি বাংলাদেশ থেকেই সাবা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ও ষড়দর্শনেব প্রভাব একালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনেব সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তব জনসমাজে প্রচলিত। এখনও আমবা মুখে বেদান্ত-উপনিষদের কথা বললেও আচাবে আচরণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোবতব পৌরাণিক। ইদানীং সার্বজনীন পূজাপার্বণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমবা যে কোনও সুদূব ভবিষ্যতেও স্থূল পৌরাণিকতা ছেড়ে সূক্ষ্মতব উপনিষদ-বেদান্ত তত্ত্বে উপনীত হব এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত নব্যপৌরাণিকতার একটি দুর্বলতব দিক আছে। শুধু যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেনে নিলে পৌরাণিক ব্যাপাবেব মধ্যে বহু ছিদ্র আবিষ্কার কবা যাবে। স্বাভাবিকতা ও লৌকিকতাব দ্বাবা বিচাব কবলে এবং প্রাকৃত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে পূর্বাণেব বহু অংশ পবিত্যাগ কবতে হবে। পরিত্যাগ না কবলে দোটানায় পড়তে হবে। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই ধবনের বিপদে পড়তে হয়েছে।

(১০) দ্রষ্টব্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব আত্মজীবনী (পৃ: ১৩৪), বিশ্বভাবতী সংস্করণ, ১৯৬২।

লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী পরিপাক কবা দুষ্কর হবে। এই জন্ম ভক্ত বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাকৃত এবং অচিন্ত্য বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ঠ, রাধা—সবই রূপক। (১১) তাঁর মতে, নিদিধ্যাসন কবলে ঈশ্বরোপাসনার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য কবা যাবে। তাঁর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করি :

“যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিগূহণ এবং সর্ব-জগতেব আধার বলিয়া চিন্তা কবি, তখন তাঁহাব নাম ব্রহ্ম বা পবব্রহ্ম বা পবম্যাদ্ভা। আব যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্ম চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তারূপক চিন্তা করি, তখন তাঁহাব নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আব যখন এক-কালীন তাঁহাব উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পাবি, অর্থাৎ যখন তিনি আমাব হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্ভিত হন, তখন তাঁহাব নাম শ্রীকৃষ্ণ।” (১২)

এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন : ‘ধর্মেব প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা, দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান, নিকাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মেব চরম কৃষ্ণোপাসনা।’ এই যে জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, এতে কি তাঁর অন্তবেব ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছিল? ‘ধর্মতত্ত্বে’ গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন :

“অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমাব মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি কবিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহাবই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহাব সত্যাসত্য নিকপণ জন্ম অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগেব ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তিবে ঈশ্ববানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।” (১৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমাগীয়া নব্য পৌৰাণিকতা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর পবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় এসে পৌৰাণিকতাব নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবলেন। পৌৰাণিক বিশ্বাস ভাবতেব শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সর্বযুগেব শবণ্য, এবং শুধু বুদ্ধিবিচাব নয়, জীবনেব সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম সত্তায় পৌৰাণিক ভাবমূর্তিকে যথাযথভাবে পবিস্থাপনা—এই আদর্শ স্বামী বিরেকানন্দেব দ্বাবা ভারবতীয় সমাজ ও বিশ্ব-সভায় অত্যন্ত দক্ষতাব সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সে আব এক যুগেব কথা।

(১১) দ্রষ্টব্য : বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ড (‘গৌবদাস বাবাজিবে ভিক্ষাব বুলি’)

(১২) গৌবদাস বাবাজিবে ভিক্ষাব বুলি (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়)

(১৩) ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায় (‘ঈশ্ববে ভক্তি’)

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালীসমাজকে ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহলী কবেছিলেন, পুরাণের প্রতি আধুনিক ভাবতীষের হাবানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন, এম জন্ম ভাবতবর্ষ তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবে।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমজন্মোৎসব সভায় পঠিত)

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

॥ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া ॥

ডঃ হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনের তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীযাদেব জীবনকথা। কয়েকটি ছবি। [১০ ০০]

॥ কালিকট থেকে পলাশী ॥

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্যজাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। ১০ টি বিবল মানচিত্র। [৬'০০]

॥ বাঁকুড়ার মন্দির ॥

শ্রীঅগ্নিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার তথা বাঙলাব মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শৈলী ও ইতিহাস। ৬৩টি আর্ট প্লেট। [১৫'০০]

॥ উদ্বাস্তু ॥

শ্রীহিবগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা পববর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা। বাঙলায় একমাত্র বই। [১০'০০]

॥ উপনিষদের দর্শন ॥

শ্রীহিবগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহে নিহিত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। [৭'০০]

॥ উপনিষদের কথা ॥

শ্রীহিবগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহের ইতিহাসগত আলোচনা। [৪ ০০]

সা হি ত্য - স ং স দ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯ (৩৫-৭৬৬৯)

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ দেশে অঙ্গসজ্জা বা অলঙ্কার কোন্ কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হল তা স্থির নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু আমাদের দেশ নয়, মিশরে, চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অঙ্গাভরণ ব্যবহার চলছে।

উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথমেই একথা পরিষ্কার কবে নেওয়া দরকার— অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ কি। শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কার, তার মধ্যে আবার স্বর্ণালঙ্কারই একমাত্র অলঙ্কার পদবাচ্য—এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কার। অলঙ্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে এই পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতুশ্রেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতুসাব হিসাবে সোনার যে মর্যাদা তা অলঙ্কারের সঙ্গে এক কবে ফেললে আলাদা কথা। ধাতুর ব্যবহার খুব প্রাচীন হলেও মাত্র হাজার দশেক বছর তাব বয়স, আর সোনার আবিষ্কার তাবও হাজার তিনেক বছর পূর্বের কথা। কিন্তু তাবও অনেক অনেক কাল আগে থেকে মানুষ অলঙ্কার ব্যবহার করে আসছে, কিছুটা অঙ্গসজ্জার তাগিদে, কিন্তু বেশিভাগটাই সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীবদেহাবশেষ অঙ্গে ধারণ করে অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তিকে প্রসন্ন বা শান্ত করার আধিদৈবিক প্রয়োজনে। ইতিহাসধারার এই বিষয়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম মানুষ যখন অঙ্গাবরণের ব্যবহার শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তাব অঙ্গে। এই প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্কারের উপাদান, বলাই বাহুল্য, উজ্জ্বল ও মহার্ঘ ধাতু কিংবা মণিমুক্তা নয়, পবন আধিদৈবিক শক্তিসম্পন্ন আপাততুচ্ছ উপাদান, যেমন, বিশেষ ধরণের ফুল, ফল, বীজ, রক্তনির্ধাস, প্রাণীর অস্থি (মাছ, উট, হাতিব)। পোড়ামাটির টুকরো, চকচকে বঙীন কাঁচের প্রলেপ লাগানো পুঁতি, হবিদ্রাবর্ণ কঠিন অম্ব বা কৃষ্ণবর্ণ খনিজ জেট ইত্যাদি ধাতু ও বস্তুর ব্যবহার পববর্তীকালের ব্যাপার। অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রকৃতির দান সত্যিকারের ফুল থেকে সুরু করে মূল্যবান ধাতু, মণিবস্ত্র, দক্ষমৃত্তিকা সবকিছুই অঙ্গাবরণের জন্য আবহমানকাল ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণী দেহের অবশিষ্ট, সবাসরি গাত্র-চিত্রণ বা বঙ্গোলির মধ্য দিয়েও বহুক্ষেত্রে বিবিধধরণের অলঙ্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ইঙ্গিত আবেক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে উদ্ভিদ মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটের বহিঃবেথা যে যে মাধ্যমে এখনো অস্তিত্ব বক্ষা করছে সাম্প্রতিককালের উদ্ভিদ তাব অন্যতম।

মানুষের আদিমতম অলঙ্কার যে শোভন, নয়নাভিরাম ধাতুজ কিংবা মণিময় অঙ্গসজ্জা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। নিছক সৌন্দর্যপ্রেমণা নয়, আধিদৈবিক কারণেই প্রথম যুগের মানুষ তাব সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবচের মত যে অলঙ্কার অঙ্গে

ধারণ কবত তা ছিল জীবজন্তব দাঁত, অস্থিপঞ্জর কিংবা কেশাবশেষ দিয়ে রচিত বন্ধনী বা মালা। অঙ্গাভরণেব শোভাবর্ধনকল্পে তাব বহির্বাঁকৃতির মৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আনয়নে কিংবা বর্ণবৈচিত্র সংযোজনে অভিনিবেশ পববর্তী যুগেব সৌন্দর্যবুদ্ধি বিকাশেব ফলশ্রুতি। এমনকি সুদৃশ্য মণিমুক্তা ও দ্যুতিমান্ ধাতুর ব্যবহাবও সুক হয় আদিতে ঐ একই আধি-দৈবিক সংস্কারেব প্রেবণায়। বস্তুত চিরদিনই জডোয়া ছাড়া আবও একটি পথ ধবে বত্ৰপ্রস্তুত অঙ্গাভরণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব বেষ কয়েকটি দেশে অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা এবং কল্যাণকে স্বাগত জানাতে বত্ৰপ্রস্তুত ব্যবহৃত হয়েছ। এই বিশ্বাসে আমাদেব দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক বত্ৰ এবং শেষপর্যন্ত নববত্ৰ ব্যবহাব ঘটেছে। মানুষেব কল্যাণেব জন্ম সূর্য, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, বাহু, বৃহস্পতি ও শনিকে অনুকূল কবতে একেক ব্যক্তিব কোষ্ঠী ঠিকুজী বিচার কবে নয়টি বত্ৰ কে কোথায় বসবেন তার নির্দেশ দিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। এব মধ্যে আবাব কোন কোন বত্ৰ নিয়ে নানান্ জল্পনা দেখা গেছে, কি জানি নীলা ধাবণে বাজা হব, না সরাসরি যমবাজেব দরবাবে হাজিব হব। শাস্ত্র বলে, শনিকে কাটাতে নীলা হল অমোঘ মহাবত্ৰ। এসব ছাড়া মিশ্রিত ধাতু-অলঙ্কারেব কথা বলা হয়েছ। অনেক দেবদেবীও তৈবি হয়েছ মিশ্রিত ধাতুব, তাব কোনটি পঞ্চধাতু কোনটি বা অষ্টধাতু ইত্যাদি।

অলঙ্কারেব নান্দনিক আবেদননিরপেক্ষ এবং প্রথা ও বিশ্বাসেব উপরে একান্ত নির্ভব-শীল অগ্ৰাণ্য কয়েক ধবণেব ব্যবহাবেব মধ্যেও অলঙ্কারেব উৎপত্তিব সাধারণ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আয়ুর্বেদ পর্যন্ত সর্বজ বিশেষ বিশেষ মণিবত্ৰকে বোণাবোণ্যে ব্যবহাবেব জন্ম পবামর্শ দেওয়া হয়েছ। এখনো অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হযত আঙ্গুলে পবেন শাঁখের আংটি কিংবা বাহুবন্ধ হিসাবে লোহা বা তামার তাব ব্যবহাব কবেন। প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেঁদা কবলে চোখ ভালো থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কার উঠেছ। আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবাবে হযত শুধুমাত্র কাঠি গোঁজা থাকে। কানেব কথায় একটি প্রাসঙ্গিক পূর্বাণেব গল্প এসে পডছে। এখনকার অলঙ্কারজগতে বারাগসী ঘরণাব কথা নতুন কবে বলার প্রয়োজন কবে না। সেই বাবাগসীব স্নানেব ঘাটে নাকি দেবী দুর্গাব কানেব অলঙ্কার হাবিয়ে যায়। হাবানো অলঙ্কারেব নামানুসাবে সেই ঘাটেব নাম হয় মণিকর্ণিকা। বর্ণানুযায়ী মণিমুক্তা ও মূল্যবান্ ধাতুব আবোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে চীন, পাবস্ত, আবব, মিশব, সুমেব, ভাবত প্রভৃতি দেশেব প্রাচীন এবং আজও প্রচলিত বিশ্বাসেব কথা এই সূত্রে স্মরণীয়। পৃথিবীব সবদেশেই তুকতাক বা যাদুব সঙ্গে জডানো গাছলি আদিয়েগের সংস্কৃতি নমুনা। এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাপাবে বিশেষ বিশেষ বঙ বেছে নেওয়াব প্রথা আছে। অথর্ববেদে নীলের সঙ্গে লালেব মিশ্রণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা হয়েছ। ওদিকে, হিব্রু ধর্মধাজক লাল আর নীলেব মেশানো পোষাক না পবে ভবিষ্যৎবাণী কবতে পাবতেন না।

॥ দুই ॥

অলঙ্কারের বিবর্তনে বিশেষতঃ এদেশে, লৌকিক ধারাব অবদানের কয়েকটি দিকেব তাৎপর্য অনুধাবনীয়। অলঙ্কারজগতে লোকাযত সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে—এক, উপাদান নির্বাচন ও রূপকল্পনায় অর্থাৎ বহিবৃদ্ধ সাজে; দুই, অলঙ্কারেব্যবহার সম্পর্কিত গুণকল্পপূর্ণ সামাজিক আচরণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মাণে যাব উৎস লোকসমাজের সুদূর ও অজ্ঞাত অতীতযুগ। বিবর্তনের সাধারণ বিধি অনুসারে যেমন সমাজেব কোন কোন স্তরে কোন কোন রীতি বা প্রণালী একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে আব রূপান্তরিত হতে চায়না এবং কালক্রমে এক সনাতন ও অক্ষয় ঐতিহ্য-শ্রমী মর্যাদা লাভ কবে সমাজেব পূজ্য পোতে থাকে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায় যে সমাজের অন্যান্য অংশে অলঙ্কাররীতির বহুল বিবর্তন ঘটে চললেও সমাজেব একটি বৃহৎ অংশ কমবেশি সেই প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাস বাঁচিয়ে বেখে চলেছে, কিছুটা অর্থনৈতিক কাবণে, কিন্তু অনেকটাই ঐতিহ্যমুখী অনড় অভ্যাস ও সংস্কারেব দায়ে। আবার এই সংস্কারেব চেউ কিছুটা চেহাৰা পাণ্টে সমাজেব অগ্রসর স্তরগুলিতেও জায়গা করে নিয়েছে দেখা যায়। তবে মানবজাতিব প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাসেব অবিকৃত বাহু অনুসৃতি লোকাযত সমাজেই বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ এখনো সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদ-সৃষ্টি বা প্রাণিদেহাবশেষ নির্মিত অলঙ্কার পবিধান কবা হয় যা লোকসমাজের আদিতম পূর্বপুরুষ অঙ্গে ধারণ কবতেন। অবস্থা সুযোগ পেলে কৃত্রিম অর্থাৎ প্রাঙ্গসব সমাজেব অলঙ্কারেব সুলভ অনুকবণেও ঘটে যায়। তবু বলব, লোকসমাজ অঙ্গপ্রসাধনে প্রকৃতির দানেব উপবেই বেশি নির্ভরশীল, এমনকি প্রথাগত কৃত্রিম গহনা ব্যবহাবেব মধ্যে তাংদেব যে মনোভাব ও অভীপ্সা ফুটে ওঠে তাব সঙ্গে অভিজাত-বিদগ্ধ-নাগবজনেব পবিশীলিত ও কৃত্রিম কচিবোধও পাবিপাট্যপ্রিয়তাৰ চাবিত্রিক প্রভেদ ঐকান্তিক।

এখনো পর্যন্ত এ দেশেব সামগ্রিক অলঙ্কার সম্ভাবেব মধ্যে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ উপাদানসৃষ্টি লোকাযত অলঙ্কারেব অনুপাত চেব বেশি হলেও অলঙ্কারশিল্পেব বিবর্তনে লোকাযত ধাৰাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উপাদানেব বৈচিত্র্যে নয়, যদিও তা তুচ্ছ কবে দেখাব মত নয়। এমনকি সাধারণভাবে দেখতে গেলে মূল্যবান ধাতু বা প্রত্নালঙ্কারে লোকাযত শিল্প হয়ত তেমন কিছু সৃষ্টি হয়নি, 'কিন্তু লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগী অলঙ্কার যে তৈরি হয়নি তা নয়। আমাদের অলঙ্কার ধাৰায় লোকশিল্পীব অবদান স্বল্প-মূল্যেব অলঙ্কারেব মধ্যে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়েছে। -এইসব সুলভ অলঙ্কারেব ব্যাপক প্রচলনেব পেছনে বয়েছে আমাদের সর্বস্তবে লোকাযত বিশ্বাস ও সংস্কারেব অলঙ্কিত ব্যাপক প্রসাৰ। কিন্তু লৌকিক শিল্পবীতিব যেটি সর্বাংপেক্ষা গৌরবময় অবদান, তা হল অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদেব অনুকবণে এমন কয়েকটি চিরন্তন ও উদ্দীপক নকশা ও মোটিফেব সৃষ্টি যা অভিজাত ও প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারশিল্প শুধু গ্রহণই কবেনি উপরন্তু

পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিল্যাসান্তরের সাহায্যে তাদের গৌরব এমনি বাড়িয়ে দিয়েছে যে গভীরভাবে অনুধাবন না করলে তাদের লোকায়ত উৎস আমাদের নজরে আসে না। লৌকিক অলঙ্কারের অস্বতম প্রধান উপাদান ফুল ও লতাপাতা। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ফুল বা পাতার আকৃতি অনুকরণ করে কতো যে ধাতুময় ও মণিমুক্তাখচিত অভিজাত অলঙ্কার হয়েছে তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন শিবোদ্যার অলঙ্কারের মধ্যে মালা ছিল ফুলের মালারই ধাতব অনুকৃতি, ললমক ছিল তিন সারি সোনার পাতা দিয়ে তৈরি নক্ষত্রশোভিত, মালাবিশেষ, আব আপীড হল সিঁথির উপরে বিলম্বিত হাব। ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুল পাতার অনুকরণে রচিত সোনার হংসভিলক। চুড়ামণ্ডন ও চুড়িকা হল যথাক্রমে পদ্মপাতা ও পদ্মফুলের মত দেখতে শিবোদ্ভূষণ। মুসলমান আমলে উত্তরভারতে শিসফুল, চৌক বা ছোটফুল নামে যে গোলাকৃতি উচ্চাচ শিরো-ভূষণটি ললাটের ওপর কেশব শোভা বর্ধন করত তা ছিল চন্দ্রমল্লিকার অনুকরণে খাঁজকাটা। একটি খাঁটি বাঙালী চুলের কাঁটার নাম হল পান-কাঁটা। কর্ণভূষণের অধিকাংশ আবার ফুলের অনুকরণে বচিত। প্রাচীন কর্ণপুর বা তাব আধুনিক সংস্করণ যথা কর্ণফুল, চম্পা, বুমকা, ঝাপা ইত্যাদি গহনা পুষ্পাকৃতি। বুমকা এসেছে ধুতুবা ফুল থেকে, চম্পার পরিচয় তাব নামেই। যাবতীয় ঘণ্টাকৃতি কর্ণভূষণ আমলে পদ্মফুলকে উল্টে দিলে যেমন দেখায় তারই অনুকরণে বচিত। পদ্মকোবকের সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে কাশ্মীরেব বস্ত্রাভ শঙ্কুসদৃশ কর্ণভূষণে। বাঙলাব পিপুলপাতার নামটিও অবিকৃত রয়েছে। প্রাচীন প্রথাগত অলঙ্কার কর্ণিকা হল তালপত্রের হৈম অনুকরণ। এক সময়ে কচি তালপাতার কর্ণভূষণ জনপদবধূর লাভ্যকে মনোরম করে তুলেছে। আজ লোকসমাজে ও আদিবাসীসমাজে এব বহুল প্রচলন রয়েছে। ওদিকে নেকলেস জাতীয় হারটি লোকায়তধারার কাছে ঋণী। মহারাজের পশ্চিমঘাট পর্বতমালাব অধিবাসীরা যে ধরণেব টুকবো ঘাস গোট বেঁধে হারের মত করে গলায় পবে, আমাদের অভিজাত গহনা নেকলেসে তার প্রভাব প্রমাণিত সত্য। উত্তরভারতের চম্পাকলি বা তাব সহজ সংস্করণ জওয়াহর-এ চাঁপাফুলের মত ছোট ছোট পেগেট থাকে। বাঙলাব কামরান্ধ হার কামরান্ধ ফুলের আকৃতি অনুসারী। বাঙালী খাঁটি কচিভূষণ বটফল ও নিমফলের বেলাতেও একই কথা। কপোব তৈরী পিপুলপাতার যে কচিভূষণ অভিজাতসমাজে চালু আছে তা ভাবতেব কোন কোন আদিবাসীসমাজে প্রচলিত অনুরূপ পিপুলপাতার পোষাকটুবা অলঙ্কার থেকে আহৃত। গোড়ালিতে পরবাব নৃপুজাতীয় অধিকাংশ গহনাই আসলে পাকানো ঘাসেব তৈরি লোকায়ত গহনার পরিমার্জিত উন্নত সংস্করণ। বাঙলাব নিজস্ব গহনায় বহুবিধ শস্যদানাব অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন মটবমালা হাব, যবদানা ব্রেসলেট, চালদানা ব্রেসলেট, খোয়ে-নো ব্রেসলেট (খৈ সদৃশ), লবঙ্গদানা ব্রেসলেট ইত্যাদি।

বস্তুত, অভিজাতধর্মী ও লোকায়তধর্মী অলঙ্কার উভয়েরই উৎসস্থল একই এবং মূলতঃ

একই ঐতিহ্য উভয়কে পুষ্ট কবেছে। তাই এই দুই ধারাব মধ্যে মাঝেমাঝেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছে। বাহ্য গঠনচাতুর্য ও পাবিপাট্যের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেটা ছাপিয়ে এক মৌলিক আত্মীয়তা সহজে অনুভব করা যায়। অভিজাত অলঙ্কার শিল্প যেখানে আদিম অলঙ্কার-উপকরণকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, শুধু তাদের থেকে সংগৃহীত মৌল নকশা ও মোটিফগুলি নিয়ে নব নব সৃষ্টির কৌশলে মেতে উঠেছে, লোকায়ত শিল্প সেখানে বড়ো জোর সুলভ ধাতু ও উপকরণের সাহায্যে ঐ সব আকবক্ষকপ প্রাকৃতিক নকশা ও মোটিফের অমার্জিত ও অনিপুণ অনুকরণেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে এখনো লোকসমাজ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে অলঙ্কারের সাধ মেটায়। 'এখনো-গাছের বীজ, কাঠ, নির্যাস, পাতা, শস্যদানা, এমনকি কার্পাস, বজন, শোলা, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অলঙ্কার বচিত হয়—সেই নির্মাণ ক্রাজে কৌশলগত উৎকর্ষ না থাকলেও লোকশিল্পীর সহজ সবল সৌন্দর্যবোধ, অনাড়ম্বর শিল্পকচি এবং সর্বোপরি সুনিশ্চিত নিজস্বতাব ছাপ গায়ে মেখে তা এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ কবে। কাঠের তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক কণ্ঠাভরণ তৈরি হয়েছে। অভিজাত ধর্মেও কদ্রাক্ষ, তুলসী এবং ঘুগির দানা এসে গেছে। অভিজাত সমাজে ঐ ধরণের লোকায়ত অলঙ্কারধারাব এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শুধু শিল্পসৌন্দর্যের খাতিবেই ঘটেছে তা নয়। আসলে এই জাতীয় প্রভাববিস্তারের মূলে রয়েছে এমন কতকগুলি গভীরমূল বিশ্বাস ও সংস্কার যার উৎস মানবসমাজের শৈশবকালীন ভয়-ভাবনাব ইতিহাসে লুকোনো থাকলেও যাকে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় এখনো লালন কবে চলেছে সাধাবণভাবে লোকায়ত সমাজ এবং বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়।

এই সংস্কার এবং বিধিনিষেধের মধ্যে কোন কোনটির গুঢ়, অলক্ষিত আবেদন অভিজাতসমাজের অবচেতনমানসে যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত ও সক্রিয় হয়ে আসছে। এই জাতীয় সংস্কারবাদি সামাজিক ব্যবধান নির্বিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে বিধিনিষেধগুলি অভিজাতধর্ম নির্দেশিত বলে মনে হলেও এরা আসলে সেই অলঙ্কার অতীতের স্মৃতিচিহ্ন যখন মানুষ অজানা অচেনা বিকপ শক্তি-সমূহের নিয়ন্ত্রণে তার পার্থিব অস্তিত্ব যে সদা বিপন্ন এই আশঙ্কায় অনেক আপাত অর্থহীন বিশ্বাস ও সংস্কারে, অধীন হয়ে পড়েছিল। হয়ত বা যে ধরণের আধিদৈবিক সংস্কার তাকে আত্মরক্ষার্থে কবচকপ অলঙ্কার পরিধানে উৎসাহিত কবেছিল, তাবই স্বগোত্র কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে কিছু কিছু বিধিনিষেধ রচনা কবেছিল। পরবর্তী যুগে অভিজাতধর্ম এগুলিকে সামান্য পরিশোধন করেছে হয়ত, কিন্তু আদৌ নাকচ কবতে পারেনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যুগে যুগে আমাদের দেশে লোকায়ত সমাজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় অনুশাসন প্রচলিত ছিল। এই অনুশাসন থেকে পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংস্কারের জন্ম



হয়। কিছু কিছু সংস্কারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত আমবা দেবার চেষ্টা কবি, কিন্তু বেশিব-
ভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় না। অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কয়েকটা প্রাচীন বিধি-
নিষেধ নজরে আসে। বিয়েব আংটি সংক্রান্ত অজস্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে।
বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত অনন্ত বিছা, বাঙলার নোয়া, মাদ্রাজের থালি, কুর্গেব
পুঁতিমালা কোন কুমারী বা বিধবাব অঙ্গে ওঠা নিষেধ। এই সূত্রে কোন কোন অলঙ্কারের
অতীতকথা ও জন্মবৃত্তান্ত এসে পড়ে। লৌহবলয়কে মেয়েদেব বন্দীদশার চিহ্ন বলা ঠিক
কি না, যাবতীয় পদাভরণকে বেড়ি বলা শোভন কি না, বাহুবলয় বোম ও গ্রীসের
যোদ্ধাদেব ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটির প্রাচীন ব্যবহার নামমুদ্রা বা পাঞ্জাতে সীমাবদ্ধ
কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্ত্বের পাহাড় তৈরি হতে পারে। আমবা বিধিনিষেধ
প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। বাদশাহেব অনুপস্থিতিতে
বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে অলঙ্কার সম্পর্কিত
কয়েকটি সংস্কার বিধিনিষেধের পর্যায়ে পড়ে।

॥ তিন ॥

ভাবতবর্ষে অলঙ্কারের ইতিহাস অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর পুরনো। এদেশের
আর্যোক্ষ জলবায়ুতে গায়ে জামাকাপড়ের বোঝা না চাপিয়ে অলঙ্কারের বাহুল্যই মানায়
ভালো। এখানে অলঙ্কারের উপাদান যেমন ছড়ানো এদেশেব মানুষ তেমনি প্রাচীনকাল
থেকে আত্যন্তিক অলঙ্করণপ্রিয়তাব জন্ম প্রসিদ্ধ। বহু বিচিত্র জাতিব সমাবেশে এবং
বহিবাগত সংস্কৃতিব যাত্ অভিঘাতে এদেশেব অলঙ্কারশিল্পে বৈচিত্র্য এসেছে। তবু,
ইতিহাসেব অল্প ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি বৈচিত্র্যেব মধ্যে এক মূলগত ঐক্য বিবাজ-
মান। এই ঐক্য শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। যুগে যুগে ভারতেব আলঙ্কারিক
প্রতিভা কতকগুলি প্রধান প্রধান আকর শিল্পনমুনাকে নতুনভাবে বিকশিত কবাব সাধনায়
সার্থকতা লাভ কবতে চেয়েছে, প্রাচীন ও নবীনেব মধ্যে তাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বচিত
হয়েছে। এরও পেছনে রয়েছে সেই সনাতন হুবপনেষ ঐতিহ্যবায়গতা।

আমাদেব দেশের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণা প্রধানতঃ দুটি পথ ধবে এসেছে।
প্রথম পুরাতত্ত্বের সাহায্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খনন কাজে
যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের অঙ্গে যে সব অলঙ্কার আছে সেগুলি অর্থাৎ পবোক্ষ
ধারণা, যে সব অলঙ্কার সবাসবি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন
মাল্যাদানা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে ঋগ্বেদ থেকে সুক করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ
পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত
নাযক-নাযিকাব অঙ্গাভরণ, মৌর্যযুগ থেকে সুক করে প্রাগাধুনিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনেব
বহুবিধ মূর্তিতে উৎকীর্ণ অলঙ্কার—সব মিলিয়ে অলঙ্কারের ধারা অনুসন্ধান করা যেতে

পাবে। এছাড়া লোক-সাহিত্যেৰ বিভিন্ন শাখায়, প্ৰায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্যে, পুথি ও পটচিত্ৰণে এবং ধৰ্মীয় তিলক ও গাত্ৰ আলপনায় অলঙ্কাৰেৰ অনুসন্ধান চলতে পাৰে।

বেদে নিষ্ক নায়ে একবকম হাৱেৰ উল্লেখ আছে। স্বৰ্ণবচিত্ৰ শ্ৰু বা মালাবও উল্লেখ পাওয়া যায়। গোভিলেৰ গৃহসূত্ৰেৰ এক টীকা অনুসাবে শ্ৰু বলতে পুষ্পৰচিত্ৰ শিবোভূষণ এবং স্বৰ্ণময় কণ্ঠাভৰণ দুইই বোঝাত। অশ্বলায়নেৰ গৃহসূত্ৰে আছে যে, শিক্ষা সমাপন অন্তে ব্ৰহ্মচাৰী যখন গুৰুৰ কাছৰে বিদায় নিতে উপস্থিত তখন তাঁৰ অঙ্গে শোভা পাছে বৈভৱচিত্ৰ কণ্ঠহাব ও দুটি কৰ্ণভূষণ। কঠোপনিষদে বহুকপযুক্ত মুষ্ণা নামক হাবৰ উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি যাবতীয় অলঙ্কাৰেৰ তালিকা দিযেছেন, স্বৰ্ণকাব যদি সোনাৰ ভেজাল দেয় অথবা তাৰ কাৰিগৰীতে যদি কোন দোষ ধৰা পড়ে তাহলে সেই কাৰিগৰেৰ সামাজিক শাস্তি কি হব মনু তা সবিস্তাবে বলেছেন। বামায়াণে সীতাৰ অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কাৰেৰ উল্লেখ আমাদেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। এই সময়কাৰ অলঙ্কাৰেৰ শিল্পগত মান ছিল খুবই উন্নত। বামায়াণে উল্লেখিত অলঙ্কাৰ হাব, হেমসূত্ৰ, বসনা, অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয় এবং কেশ্য প্ৰভৃতি আজও কোন না কোন নামে চালু আছে। লঙ্কাৰ ৰমণীকুল পবতেন বৈদ্যৰ্ষমণি ও হীৰক-খচিত্ৰ স্বৰ্ণকুণ্ডল। অঙ্গদ ও কুণ্ডল ছিল স্বৰ্ণনিৰ্মিত এবং তাৰেৰ যথাক্ৰমে ‘বিচিত্ৰ’ ও ‘শুভ’ এই বিশেষণে ভূষিত কৰা হৈছে। ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰে অঙ্গাভৰণকে সাধাৰণভাবে ‘আবেধ্য’ যেমন কুণ্ডল, ‘বক্ষনীয়া’ যেমন অঙ্গদ, ‘ক্ষেপ্য’ যেমন নূপুৰ ও বস্ত্ৰাভৰণ এবং ‘আবোধ্য’ যেমন হেমসূত্ৰ ও বিবিধ হাৰ—এই চাৰ শ্ৰেণীতে ভাগ কৰা হৈছে। এছাড়া মস্তক, কৰ্ণ, গ্ৰীবা, আঙ্গুল, কটিদেশ ইত্যাদিৰ জন্তু স্ত্ৰী-পুৰুষ উভয়েৰ ব্যবহাৰ্য নানান আভৰণেৰ বৰ্ণনা দেওয়া হৈছে। গুৰুত সংহিতায় চিকিৎসা ও আভৰণ ধাৰণ উভয় উদ্দেশ্যে বালকেৰ কৰ্ণবেধেৰ কথা আছে। মুছকটিক নাটকে একটি কৰ্মচঞ্চল গহনাৰ দোকানেৰ ঐ যুগেৰ এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধৰা হৈছে। শকুন্তলাৰ আংটি, কালিদাসেৰ অশ্বাশ্ব কবিদেৰ বৰ্ণিত পুষ্পালঙ্কাৰেৰ আকৰ্ষণ আজও বিন্দুমাত্ৰ কমেনি। দশকুমাৰ চৰিত, জাতককাহিনী, বিনয় পীটক, বনেৰ কাদম্বৰী ও হৰ্ষচৰিতে, মাঘেৰ শিশুপালবধে, হৰ্ষেৰ নৈষধ চৰিত্ৰে, বৃহৎ সংহিতায়, অমৰ কোষে এবং যাবতীয় পুৰাণাদিতে অলঙ্কাৰেৰ বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমাদেৰ দেশে পৌৰাণিক সাহিত্যে আদিম সমাজেৰ অনুকৰণে কণ্ঠাভৰণেৰ ওপৰ বিশেষ জোৰ দেওয়া হৈছে। সেই আভৰণ হৃদয়েৰ কাছাকাছি বাখাৰ নিৰ্দেশ দেওয়া আছে। কাবণ, হৃদয় ব্ৰহ্মতত্ত্বেৰ সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। হৃদয় বয়েছে গ্ৰীবাদেশেৰ নিচে, নাভিদেশ থেকে বাবো আঙ্গুল ওপৰে। পদেৰ মুকুলেৰ মত ঐ হৃদয় নাভীগুলো দিযে জড়ানো। ঐখানে ছোট একটি ফুটো আছে যাৰ মধ্যে সমস্ত জগৎ প্ৰতিষ্ঠিত।

দেবতাদেৰ স্তবগানে তাঁদেৰ ৰূপ বৰ্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কাৰেৰ কথা বলা হৈছে। কৃষ্ণেৰ ৰূপ বৰ্ণনায় (বৰ্হাপীড) ময়ূৰেৰ পালক দিযে শিবশোভনেৰ কথা, বল্লবীনয়নাভোজ

মালিনে) পদ্মেব মালাব কথা বলা হয়েছে, শ্রীবামবহস্বে-‘শঙ্খভূষণ’ উল্লেখিত হয়েছে। চিব-কালের ছাইমাথা শিবকে পর্যন্ত রক্ত-আকল-উজ্জল-অঙ্গ, মন্দার-পুষ্প পূজিতায়, রঞ্জিত সং মুকুটং, মঞ্জীব-পাদ যুগলায় ইত্যাদি স্তব করা হয়েছে। দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই যেখানে যত ভালো অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময় বস্ত্র থেকে মুক্তামালা সবকিছু পরিয়ে তবে শাস্ত হয়েছে স্তব বচয়িতা। বলা বাহুল্য, এই বর্ণিত বিবিধ অলঙ্কার স্তোত্রকারের মনগড়া ব্যাপার কিছু নয়।

আমরা সাহিত্যে দেবদেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কারের বর্ণনা পেয়েছি শিল্পশাস্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেই কারণে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য ছাড়া বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অত্যাশ্রয় মূল্যবান অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অলঙ্কারে স্থানকালের বিশেষ শৈলী দৃষ্টি এড়ায় না। যেহেতু নির্দেশানুসারে সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অলঙ্কার কোন বিশেষ দেবদেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মানুষের ব্যবহারে অলঙ্কারেই তার পরিচয় বিধৃত। এ কথা শুধু হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর ‘অভিধান চিন্তামণি’তে যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর কথা বলেছেন তাঁদের অঙ্গাভরণ এবং শ্বেতাশ্বরী ২৪ শাসনদেবীর অঙ্গাভরণ থেকে সুক কবে বৌদ্ধ অমিতাভকুল, অক্ষোভ্যকুল, বৈবোচন, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধিকুলের যাবতীয় দেবদেবীর অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। জৈন ধনপালের তিলকমঞ্জরী এবং নাবদশিল্লের ভৌমিক, ভিত্তি ও প্রস্তরচিত্র আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণার সহায়ক।

ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার আবেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাটলিপুত্র, বৈশালী, বাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদের খননকৃত অগণিত মূর্তি, খেলনা এমনকি মণিমুক্তা ও অলঙ্কার। যে বাঙলাদেশের ভূমির প্রাচীনতা সম্পর্কে সে দিন অবধি পণ্ডিতদের দ্বিধার অন্ত ছিল না, আজ অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও যে সব প্রত্নদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভারতীয় অলঙ্কার সম্পর্কিত একটি চিত্র পরিস্ফুট। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনাবায়ণপুর, দেউলপোতা (২৪ পরগণা), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাসাপাড়া (বীরভূম) থেকে বর্তমান আলোচক শুষ্ক যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির যক্ষ্মণী সংগ্রহ করেন। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিতে রত্নজালি, টিকা, পর্যায়ক, হেমসূত্র এবং কিবীট কুণ্ডল অতি স্পষ্ট। এ ছাড়া পাওয়া গেছে নানান আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিবিধ মাল্যদানা। এ মধ্যে আগেট, কালসিজনীয়, গারনেট, জেম্পার এবং কোয়ার্টজ্জ পবিমাণে বেশি। হরিনাবায়ণপুর এবং দেউলপোতায় পাওয়া গিয়েছিল অগণিত পোড়ামাটির মাল্যদানা যাব বড়গুলিকে মাছের জালে ব্যবহারের গুটি বলে মনে হয়।

ভারতীয় নাবীমূর্তির প্রাচীনতম নমুনা ঝোব ও কুল্লীর দক্ষয়তিকা থেকে সুক করে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি আকব অলঙ্কারের (যুগে যুগে তার অভিধান্তর

ঘটলেও) কথা-জানতে পারি। ১। রত্নজালি অর্থাৎ রত্নখচিত কেশ আবরক ২। কিবীট-কুণ্ডল অর্থাৎ শিবোভূষণ ৩। হেমসূত্র অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ ৪। জনপদবধূর করশোভা বলয় ও অঙ্গুলীয়ক ৫। হেমমেষলা ও কিঙ্কিণী, সজ্জিতা ললনাব কটিবন্ধ ৬। নাগরিকাব পদাভরণ নুপুর।

শিল্পশাস্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে বিভাজন আছে তদনুসাবে বিবিধ অলঙ্কার যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিসিদ্ধভাবে এইরকম ভাগ করা হয়েছে। মস্তক থেকে কণ্ঠ : শিবোরত্ন, ললাটিকা, তাড়ঙ্গ, যুক্তামালা, গ্রৈবেয ও উর্মিকা। কণ্ঠ থেকে কটি বা নাভিদেশ : প্রালম্বিকা, বহুসূত্র, উত্তংস ও শঙ্কমালিকা। পার্শ্ব ও হস্তালঙ্কার : পার্শ্বোদ্যত, নখোদ্যত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাভূষণ ও অঙ্গিকা। কটিদেশের অলঙ্কার : ভ্রাস, প্রাগণ্ডবন্ধ, নাভিপূর, নাভিমালিকা। এ ছাড়া মাণবক, ললন্তিকা, কটিলগ্ন ও উর্ধ্বতারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে শৃঙ্গাল ব্যবহৃত হত। সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কার : কাঞ্চী, অক্ষয়ম্ভিকা, বসনা ও কলাপ।

॥ চার ॥

সিন্ধু সভ্যতাব যুগ থেকেই ভারত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশলের মানে, দক্ষতায়, গঠনবৈচিত্র্যে ও উপাদানব্যাপ্তিতে বিশ্বের সেবা দেশগুলি অগ্রতম ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ, খোদাই, ঠোকাই, ছাঁচালাই প্রভৃতিতে দক্ষতা, জালি কাজ, ঠাণ্ডা পাথরবসানো কাজ, বড়ী উজ্জ্বল কাচের কাজ, বড় ঢেলে এনামেলের কাজ, পুঁতি ছেঁদা করার কাজ—সব ব্যাপাবেই আশ্চর্য অগ্রগতি চোখে পড়ে। আর্যবা ধাতুর ব্যবহারেই সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্বর্ণ ও কখনো কখনো বোঁপা ব্যবহার করে বিবিধ অলঙ্কার নির্মাণ করতেন তাঁরা। তক্ষশীলা থেকে উদ্ধার করা অলঙ্কারে গ্রীক ও ভাবতীয় বীতির সংমিশ্রণে বচিত গঠনবৈচিত্র্য ও নকশার যে পাবিপাট্য দেখা যায়, তাব প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সোনার সূক্ষ্ম জালি কাজ ও অত্যুন্নত এনামেলিংয়ের জন্য তক্ষশীলা খ্যাত। মৌর্যযুগে প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারী গহনাও এল, আর দেখা দিল সোনাকিপোর বাসনকোসন এবং বাজার হাতির অঙ্গে সোনা কপোব অঙ্গাভরণ। ভারতবর্ষের সমাজ আর্থনীতিক যাবতীয় ব্যাপাবের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসেব প্রত্যেকটি মোড় ঘোবার সঙ্গে ছোটবড় বাস্তবিক ও ব্যক্তিক অভিকচি নতুন নতুন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণের পর গুপ্তযুগ মোহনমাল্যাব ব্যবহারে যেন বলমল করে উঠেছিল। পূর্বের তুলনায় আয়তনে বড় হলেও গুপ্তযুগীয় অলঙ্কার ছিল ওজনে হালকা, বৃহদায়তনের উপযোগী জটিল নকশায় সমৃদ্ধ এবং সব মিলিয়ে অনেক বেশি মার্জিত।

গুপ্তযুগ ও মুসলমান যুগের মধ্যবর্তীকালে এই শিল্পটি অলঙ্কার প্রাচুর্য ও তক্ষণাদি কৌশলে মার্জিত সূক্ষ্মতা অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মানসাম্য লাভ কবেছিল যাকে প্রকাবান্তরে অগ্রগতির দিক থেকে অচলাবস্থা বলা চলে। আসলে, ভাবসমৃদ্ধ গুপ্তযুগের

পব থেকে কাক ও শিল্পের বাজ্যে এক বন্ধ অবস্থা এসে গিয়েছিল। অলঙ্কারশিল্প ইতিপূর্বে নকশা, পবিকল্পনা ও রূপায়নে শ্লাঘনীয় পবিগতি লাভ করলেও, এই অলঙ্কার যুগে অলঙ্কারশিল্পে গণকটিকে যা নিয়ন্ত্রিত কবত তা বিস্তৃত শিল্পস্পৃহা নয়, পবস্ত অলঙ্কার-সমূহের বিবিধ আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ও ধর্মীয় সংস্কার, কখনো বা তাদের নিছক ঐশ্বর্যমূল্য। মুসলমান আক্রমণের ফলে এই অচলায়তন ভাঙতে সুক কবে এবং ক্রমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পবিগতিস্বরূপ অলঙ্কার শিল্পেও যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সমন্বয়-প্রক্রিয়া চবম সার্থকতা লাভ কবে মুঘল আমলে এবং এব মূলে কাজ করেছিল আববীয় নয়, পবিসিক বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য মৌন্দর্যকটি, কাবণ অভিজাত শাসককুল তখন পারিসিক আদর্শে মগ্ন ছিলেন।

প্রাক-মুঘল যুগের তুর্কি অধিপতিদের কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজসভায় ঠাঠ-ঠমক ও আডম্বর হয়ত কম ছিল না, কিন্তু মুঘলযুগের অলঙ্কারের অভিজাত মনোভঙ্গী, চরমোৎকর্ষপব্যয়গতা, রুচিসৌকুমার্য, গীতিময় মৌন্দর্যপ্রেম ও নিটোল দীপ্তিব পাশে পাঠান বিস্তবস্তার নয় প্রদর্শন অনেক ঠুনকো ও নিস্প্রভ বোধ হয়। পাঠান যুগের কারুকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা বিবরণে। ‘ভোজসভা শেষ হলে রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটি, সোনার কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আব সোনার পেয়ালা উপহাব দেওয়া হল। সহকারীরা ঐ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব কপোর তৈরী।’ ‘তারা পাযে দেয় সোনালী জবীব কাজ কবা চটি। কানেতে তাবা দামী পাথর বসানো সোনার হুল পরে। তাদের গলায় দোলে হার। হাতেব কজী এবং পায়ের গোডালিতে তারা সোনার বালা ও মল পবে, হাত এবং পাযের আঙ্গুলে আংটি পবে।’ গোঁড়েশ্বর বৃহস্পতি মিত্রকে ‘রাজমুকুট’ উপাধি দেবার সময় ‘তাকে উজ্জল মণিময় সুন্দর হাব দ্যতিমান দুটি কুন্তল রত্নখচিত দশ আঙ্গুলেব বতনচূড় দিয়েছিলেন।’ বন্দাবন দাসেব দৃষ্টিতে, ‘কেবল নাবীরা নয়, পুরুষেরাও নানাবকম অলঙ্কার পরতেন, যেমন—অঙ্গবলয়, আংটি, নুপুব, কুণ্ডল, এইসব, গয়না সোনায় তৈবি হত, তার সঙ্গে সময় সময় কপাও থাকত এবং মবকত, প্রবাল, মুক্তা, বিভালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।’ [সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলাব ইতিহাসেব দুশো বছর, পবিশিষ্ট]

॥ পাঁচ ॥

বস্তত আজ অধিকাংশ ম্যাজিষামের অলঙ্কার-সম্বল হল মুঘল অঙ্গাভবণ। এখানে আমাদেব প্রাচীন ধারা পাবসিক ধারাব সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি কবল পরবর্তীকালেও তাকে এতটুকু স্নান করা যায়নি। পাঠানেব পব থেকেই সমবন্দ ও হীরাটকে আমবা খুব কাছে পেতে থাকি। সৈয়দ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদেব নান্দনিক দৃষ্টির একটা বিবটি পরিবর্তন তখন

এসে গেছে। মুঘল বাদশাহের অর্থকৌলীন্ডের সঙ্গে পারসিক কচির বিবাহবন্ধনে আমাদের চোখের বিপ্লব পুরোপুরি ঘটে গেল। ক্ষুদ্র চিত্রের কাবিগরীতে, দিল্লী আগ্রাব প্রাসাদ হর্ম্যে, সিদি সৈদেব জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তাবই আরেক দিক, মুঘল অলঙ্কার। এ অলঙ্কারে ধাতু ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গঠনশৈলী প্রায় ঐতিহ্যবাহী কিন্তু জডোয়ার এমন নয়নাভিরাম সমাহার এর আগে পবে কখনো দেখা যায় নি। সর্বোপরি যোগ হল পাবসিক মিনাকাবি। মুঘলযুগের এই মিনাকারি আমাদের আবহমানকালের অলঙ্কারধাবাকে নতুন নতুন পথে চালিত কবল। গোঁড়ের লোটন মসজিদের মিনাকাবি শুধু যে আমাদের অঙ্গভরণকে চঞ্চল কবল তা নয়, এর টেউ সাগবপাবে গিয়েও পডল। প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে সাদা মিনাব কাজ ইংলণ্ডে চালু হয়েছিল (জয়পুবেও তা চলছিল) কিন্তু পাবসিক বঙদার মিনাকাবি বাণী এ্যনকে অস্থি কবে তুলল। দেখতে দেখতে বামধনু মিনা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁডাল। চিত্রকলায় জয়পুবে যেমন গুজবাটি প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক মুঘলগন্ধী হয়েছিল তেমনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও বৃন্দন-মিনাকারির অঙ্গ থেকে মুঘলগন্ধ আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকাযত সমাজেব ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে।

মুঘল আমলের মূল ধাতু অলঙ্কার কিন্তু এদেশেব প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই কাবণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মোটিফগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মন্দিবগাড়ে, দৈনিক ব্যবহাবেব সামগ্রীতে ও অশ্রান্ত হাজাবো বস্তুতে প্রতিফলিত তার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। তবু ধর্মীয় অনুশাসনানুসারে যখন শিল্পীকে ফুল-লতা-পাতার কেয়াবির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু চক্রজাতীয় নতুন মোটিফ সেখান থেকে বেবিয়ে এসেছে। এই মোটিফের টেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দু মন্দিবেও দেখা গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনেব ব্যবহাব সামগ্রীতে। পিতৃপূজার মোটিফ, হাঁটু মোডা মোটিফ, চক্র মোটিফ এবং নাগ ও ড্রাগন মোটিফের বিচিত্র মিলনে এগুলি জন্ম নিয়েছে।

মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাঁপ্টা প্রথম বালকেই আমাদের চমকিত করেছিল। এই চমক থিতিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধান্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহাবে। মাথায় নতুন করে এল চৌক, শিসফুল ও ছোট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি। ছোটদের মাথায় বোডা এবং অশ্রান্তদের শিরুমার্গ শোভা পেতে লাগল। কপালে দোনি বা দম্নি, কুটবি, টিকা, চাঁদ, তাওইট, ঝুমর, গুছই, বিন্দলি ও বাবওয়াটেব প্রচলন হল। কানে উঠল গোসওয়াডা, বাহাডুরি, ঝমকা, বালা, খুঁরিদার, মহলিয়ান, পতং, তানডুব এবং মোব ফুলওয়াব। নাকের অলঙ্কার নথ, বুলক, লটুকান এবং লং একেবারে নতুন বস্তু হিসাবে দেখা দিল। দাঁতের ক্ষেত্রেও বখন অভিনবত্ব আনল। হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, জুগনু, মোহরন, হাউলদিল, হাঁসলি,

গুলুবন্ধ, ইতবাদন, কান্দি, শিলওয়াটা, লরি (পাঁচ, সাত)—অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন অভিধা মাত্র। হাতের গহনায় বাজুবন্ধ, জোঁশন, তাওযিজ, অনন্ত, ভাওটা, এলাচি, কম্পন, গোথক, কাঁবা, চুড, গইবা প্রভৃতি আকৃতি ধাবানুসারী, তক্ষণকর্মের পুরনো মোটিফ পর্যন্ত বয়ে গেল। আংটিব ক্ষেত্রে সামান্য অভিনবত্ব দেখা গেল ছল্লা ও আরশিতে। কটিদেশে এল পাহ্‌জেব, চঞ্জর, ঘুংক ও জাজ্জিবি। ঔবঙ্গজীবের দববাবের চিকিৎসক ভিনিসবাসী মানুচ্চি মুঘল অন্তঃপুকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারের কথাও জানা যায়। শাহজাদীরা চাদবের মত কবে গাঁথা মুক্তাব জাল দুই কাঁধেব ওপব দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পুরুষেবা অঙ্গাভরণ ব্যবহার থেকে নিবত ছিলেন না। মোহনমালা জড়োয়া বৈচিত্র্যে এ সময়ে এক নতুন রূপ নিয়েছিল। মানুষের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবাব এল পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছডিতে, অস্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোড়াব অঙ্গে ও বেল্টে, পতাকাদণ্ডে, পানপাত্রে, আলবোলায়, ফুলদানি, মুবাট্টা ও পিকদানি প্রভৃতিতে। বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে প্রাচুর্য থেকে এই অলঙ্করণ এসেছে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির তাগিদে নয়।

মুঘল শাসনের অবসানের দিনেও মুঘল প্রভাব অলঙ্কারক্ষেত্রে থেকে মুছে যায় নি। দেশীয় রাজাবা ঐ ধাবা অনুসরণ কবেছেন, এঁদের পৃষ্ঠপোষণায় জয়পুর্ব ও বারাগসীতে নতুন করে কুন্দন ও গুলাবী শিল্পদক্ষতাব চরমে উঠেছে। সামন্তবাজা ও জমিদারশ্রেণী কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান কবে আঞ্চলিক এক একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন। এই সূত্রে শিল্পীব যে স্থানান্তর ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীব সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

পরবর্তীকালে ইংবেজের প্রভাবে ভাবতীয় অলঙ্কারের অনেকগুলি সনাতন ধাবণা পরিবর্তিত হয়। নতুন গড়ে ওঠা সহবের কচিতে ভাবি ওজনের অলঙ্কার সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ দেখা দেয়। নতুন নাম এক্ষেত্রে যা শোনা গেল তা ঐ আঞ্চলিক মিশ্রণের অবদান। মুঘল চিত্রেব আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানাব অলঙ্কার এল।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিল কুমার কাজিলাল সম্পাদিত

রামেন্দু রচনা সংগ্রহ

মূল্য—২৫.০০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বিবিধ প্রবন্ধ

(নূতন সংস্করণ)

মূল্য—১৫.০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বোড,

কলিকাতা-৬, ফোন—৩৫-৩৭৪৩

পরিষৎ সংবাদ

অশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন

১৩৮০ বঙ্গাব্দে ৮ই শ্রাবণ, অপবাহ ৪-৩০ ঘটিকায় পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের অশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

• সভাপতি মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণে পব সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার মহাশয় গত বৎসরের কার্যবিবরণ, আয়ব্যয় বিবরণ এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয় বিবরণ অনুমোদনের জন্ম সভায় উপস্থিত করেন।

আলোচনান্তে এই বিবরণগুলি সভায় উপস্থিত সভাগণ কর্তৃক গৃহীত হয় (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য)।

অতঃপব সভাপতি মহাশয় ৮০তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সংবাদ ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে ‘বিশিষ্ট সদস্য’ পদে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের নির্বাচন সংবাদও ঘোষিত হয়।

• ৭৯ বর্ষের আয় ব্যয় পরীক্ষার জন্ম শ্রীমলয়কুমার দেব ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু মহোদয়গণকে ধন্যবাদ গ্রহণের একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই দুই ভদ্রমহোদয়কে ৮০তম বর্ষের জন্ম হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত করা হয়।

এই অধিবেশনে ২১৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (ইং ২৪ জুলাই, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পরিষদ মন্দিরের সভাকক্ষ বমেশভবনে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যিক, মুখী ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুবাগী বিদ্বজ্জনৈব সমাবেশে সভাকক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। এই দিবস পরিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বার মঙ্গলকলস, কদলীবৃক্ষ, আশ্রপল্লব এবং পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সভাকক্ষ রমেশভবন ধূপ-ধূনা ও পুষ্প-স্তবকে সুরভিত ও সুসজ্জিত ছিল। এই পুণ্যদিবসে সাহিত্যিক ও পরিষদানুরাগীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহও প্রদর্শিত হয়। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে, “যা কুন্দেন্দু-তুষাব-হার-ধবলা” সংকৃত শ্লোক আবৃত্তির দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন বৈষ্ণবসাহিত্য্যচার্য ডক্টর শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলাচরণান্তে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পরিষদের অতীত স্মৃতিচারণ করেন এবং পরিষদের উত্তবোত্তব শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অতঃপব পরিষদ কর্তৃক পুনঃ প্রবর্তিত সাহিত্য বিষয়ক বচনার জন্ত পুরস্কারগুলির প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল তন্মধ্যে বিচারকগণের বিবেচনায় যে সব প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সেই সমস্ত প্রবন্ধেব লেখকগণকে সভাপতি মহাশয় পুরস্কার গ্রহণেব জন্ত আহ্বান করেন এবং এই সুত্রে তিনি বলেন যে এই সমস্ত সাহিত্য পুরস্কার সমূহের প্রদান দীর্ঘকাল হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমান বৎসব হইতে পুরস্কারগুলির পুনঃপ্রবর্তনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

পুরস্কার ও পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণের নাম

১। হেমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার

বিষয় : হেমচন্দ্রেব কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ

লেখক : শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি পুরস্কার

বিষয় : বাংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল

লেখক : শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি পুরস্কার

বিষয় : বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিকপমা দেবী

লেখিকা : শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

৪। লীলাদেবী স্মৃতি পুরস্কার

বিষয় : কবি কামিনী বায়

লেখিকা : শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়

অতঃপব সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কোষ গ্রন্থ (Encyclopaedia) 'ভারতকোষ' ৫ম খণ্ড, প্রকাশেব সংবাদ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার অগ্রজপ্রতিম ববেণ্য ঐতিহাসিক শ্রীব্রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েব হস্তে 'ভারতকোষ' ৫ম খণ্ডেব, প্রথম গ্রন্থখানি পবিষদেব পক্ষ হইতে তুলিয়া দেন। সমবেত সুধীবৃন্দ এই সময়ে হর্ষধ্বনি করেন। শ্রীমজুমদার ভারতকোষেব ৫ম খণ্ড প্রকাশেব সংবাদকেই এই উৎসব দিবসের সুসংবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড আব প্রকাশিত হইবেনা সাধাবণেব মধ্যে এইরূপ একটি নৈবাশ্চ দেখা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও পবিষদেব মন্থব কর্মপন্থায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভারতকোষেব ৫ম খণ্ড, তাঁহাব জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন, আজ 'ভারতকোষেব' আবন্ধ কার্য শেষ হইল, ইহা তিনি দেখিয়া যাইতে পাবিলেন—ইহা তাঁহাব পক্ষে পরম আনন্দেব বিষয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পরিষদেব বর্তমান সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাবেব অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যে

ভারতকোষ ৫ম খণ্ডের প্রকাশ সম্পন্ন হয়। এই কৃতিত্বের জন্য আচার্য শ্রীমজুমদার শ্রীমদনমোহন কুমারের প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে আচার্য শ্রীমজুমদার পবিত্র পুনরুজ্জীবন লক্ষণ প্রত্যক্ষ কবিতা আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন প্রতিষ্ঠা উৎসবে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভারতকোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ কবিতা বলেন যে ভারতকোষ সম্পূর্ণ কবিতা পবিত্র একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য পালন করিলেন। ডঃ সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতকোষে কিছু প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ স্থান পায় নাই সেজন্য ভারতকোষের পবিত্রক আবে একখানি খণ্ড প্রকাশের জন্য তিনি পরিষদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা উৎসবের সভাপতিকপে, তাঁহার লিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বাঙ্গালাভাষার বিশুদ্ধতা বক্ষা ও বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গালার আলোচনা ও উন্নতিবিধান, বাঙ্গলা সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পবিত্রন এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনুশীলন ও পরিপোষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন। বাঙ্গালা ভাষাচর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বিবোধী শক্তি কাজ কবিতােছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং ইহার প্রতিবিধানকল্পে পবিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের কথাও একাশীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাইয়া দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন বিগত বৎসবে বহুবিধ বাধার সন্মুখীন হইয়াও পরিষদ যেটুকু করিতে পাবিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। সম্পাদক শ্রীমান মদনমোহন কুমারের নিষ্ঠা ও অগ্রান্ত পরিশ্রমে এবং বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল ধবিয়া অর্থাভাবে পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবন সংস্কার হয় নাই। বিগত বৎসবের চৈত্রমাসে রমেশ-ভবনের সংস্কার সুসম্পন্ন হয়। অনেকেই ধাবণা করিয়াছিলেন যে ভারতকোষের পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ হইবে না। সেই ভারতকোষের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড বামমোহন গ্রন্থাবলী, বাজনাবাষণ বসু (সাহিত্যসাধক চবিতমালা) এই বৎসর পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৯ম সং) বঙ্কিমচন্দ্রের “বিবিধপ্রবন্ধ” ও ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পবিত্রদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য ‘স্মারকগ্রন্থের’ মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্য পবিত্র পত্রিকা, পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলনের সঙ্কল্প, গ্রহণ কবিতােছে। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য পরিষদ আবতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ৫০০ টাকা) এবং বামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ১৫০ টাকা) প্রবর্তন কবিতাে সক্ষম হইয়াছে।

পরিষদের উন্নয়নে তিনি সাহিত্যানুবাগী সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

পরিশেষে পবিষদ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই প্রতিষ্ঠা উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত কবাব জগৎ সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবত্ত, শ্রীসুকুমার সেন প্রতিষ্ঠা দিবসেব এই উৎসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবায় এবং পবিষদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় পথ নির্দেশ কবায় তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে পবিষদ সম্পাদক বলেন যে অদ্যকার এই পুণ্য দিবসে ষাঁহাবা-পবিষদের স্রষ্টা ও প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও পবিষদের শ্রী বুদ্ধি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে প্রণাম কবিয়া, অন্তবেব শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, তিনি তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা কবিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের স্বপ্ন আমাদের মধ্য দিয়া সফল হইয়া উঠুক।

বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও উন্নয়নে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অবদান

(আকাশবাণী, কলিকাতা কেন্দ্রের আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের পক্ষ হইতে ৪ শ্রাবণ ১৩৮০ (২০ জুলাই ১৯৭৩) তারিখে প্রচারিত সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের বক্তার-ভাষণ)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার আশী বৎসব পূর্ণ হ'ল। ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জুলাই ১৯৭৩) পবিষদের একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের গত আশী বছরের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৮০ বছর আগে বাংলার মনীষীরা পবিষদের উদ্দেশ্য স্থির কবেছিলেন—“বিবিধ উপায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিসাধন।” এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তাঁরা ৭টি উপায় নির্দিষ্ট করেছিলেন :—

- (১) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন।
- (২) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ের পবিভাষা সংকলন।
- (৩) প্রাচীন, পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ।
- (৪) প্রভবস্ত সংগ্রহ, সংবক্ষণ, গবেষণা ও তাব ফল প্রকাশ।
- (৫) ভাষান্তর থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি অনুবাদ

(৬) বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখার আলোচনা ও সে সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশ।

(৭) 'সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা' নামে বাংলাভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ।

গত ৮০ বছর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই পবিষদ্ কাজ করেছে। খুব সংক্ষেপে এক এক কবে সেগুলি উল্লেখ করছি।

বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের কাজ পবিষদ্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করেন। পবিষদ্ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই তাঁদের সংগৃহীত উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেন্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি, বসন্তবঙ্গন বায় বিদ্বৎসভা, সতীশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ মনীষীগণ তাঁদের সংগৃহীত উপকরণ পরবর্তী বংশধরদের জন্ত পবিষৎ পত্রিকায় বেখে গেছেন। কটক রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনার অবসর সময়ে যোগেশচন্দ্র বায় দীর্ঘ ১৫ বৎসর অক্লান্ত পবিত্র ক'রে বাঙলা ভাষার যে ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেছিলেন পবিষদ্ ১৩২০ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন। বর্তমানে সে গ্রন্থ ছুপ্রাপ্য। গত ৬০ বছরে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা ও বাঙলা ভাষার বহু-বিচিত্র বিকাশের ফলে বাঙলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গক অভিধান রচনা বঙ্গীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ গ্রহণ করেছেন। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, বাংলার সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক সমস্ত শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগের কালানুক্রমিক নিদর্শন সেই অভিধানে থাকবে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারী যেমন ইংরেজী ভাষার সর্বজন-স্বীকৃত আদর্শ অভিধান পরিষদ্-সম্পাদিত অভিধানও তেমনি বাংলাভাষার সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ অভিধান হবে।

পরিভাষা সংকলনের কাজের গোড়াপত্তন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্। ৮০ বৎসর পূর্বেই পবিষদ্ একাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষাগুলি পরবর্তী পরিভাষা-বচসিতাদের উপকরণ জুগিয়েছে।

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, পবিষদের কর্মী ও সদস্যেরা ৮০ বছর পূর্বে শুরু কবায় বহু দুর্লভ জুপ্তপ্রায় পুথি রক্ষা পেয়েছে। প্রায় ৭ হাজার প্রাচীন পুথি পবিষদ্ সংগ্রহ করেছেন। এগুলির থেকে বাছাই কবে বহু মূল্যবান পুথি প্রকাশ করা হয়েছে। পবিষদ্ প্রকাশিত চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের নষ্ট কোণী উদ্ধারে সাহায্য করেছে। সংগৃহীত সমস্ত পুথি মাইক্রোফিল্ম ক'বে না বাখলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল কালক্রমে নষ্ট হবে। এ-কাজ সবকাবেব সহায়তায় সম্ভব হ'তে পারে। -

পরিষদের মিউজিয়মে বাংলা তথা ভাবতের নানা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে যে সব প্রত্নবস্তু, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ধাতুমূর্তি, প্রস্তরমূর্তি, পোড়ামাটির কাজ, বিচিত্র শিল্পকর্ম রাখা হয়েছে তা অমূল্য। বাংলার মনীষীদের অনেকেবই ব্যবহৃত

ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, সাজপোষাক, পাণ্ডুলিপি, ডায়েবি ইত্যাদি পবিষদ্ সযত্নে রক্ষা করছে। পরিষৎ পত্রিকায় এগুলির পরিচয় প্রকাশ করা ছাড়াও পবিষদ্ প্রকাশিত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোবজ্রন গুপ্ত প্রণীত ৩ খানি গ্রন্থে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় আছে। এগুলির সচিত্র বর্ণনাত্মক একখানি পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

ভাষান্তর থেকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিষদ প্রকাশ করেছেন। বিনয়কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথবাণ্য'বোষ, সুধাকান্ত দে প্রভৃতি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ আলোচনা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থপ্রকাশ পবিষদ্ ৮০ বছর ধরে করবে আসছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক 'ক্লাসিক্স'-এর পবিষদ্-সংস্করণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ।

সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হবে পবিষদের কার্যাবল্যেই তা নির্ণীত হয়েছিল। বাঙলাব ইতিহাস, পুৰাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু নূতন তত্ত্ব ও তথ্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি অতীতে গবেষকদের উপকরণ জুগিয়েছে, ভবিষ্যতেও জোগাবে।

সর্বশেষে একটি শুভ সংবাদ। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিষদ বাঙলাভাষায় একখানি বিবট কোষগ্রন্থ বা এন্সাইক্লোপীডিয়া—'ভারতকোষ' চার খণ্ডে প্রকাশের সংকল্প করেন। বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য ৪ খণ্ডে 'ভারতকোষ' সম্পূর্ণ করা যায় নি। ১৪ বছর ধৈর্যসহস্কাবে পবিত্রমেব পর আজ ভারতকোষের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রণ শেষ হল। মঙ্গলবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জুলাই) পবিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতকোষের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে।

বাঙলার মনীষীদের পাদস্পর্শপূত, বাঙলাব প্রাচীনতম সাবস্থত প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যে অমূল্য সম্পদ পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশালা, পুথিশালা ও প্রত্নশালায় সঞ্চয় করে গেছেন তাব সংরক্ষণ ও ত্রীভূক্তিসাধন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। সেই পবিত্র বিকৃত রক্ষা কবাব দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করতে হবে।



৮০তম বর্ষের বিভিন্ন শাখা সমিতি

সাহিত্য

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীহীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাদন দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ।

দর্শন

ডঃ শ্রীমতী বসু চৌধুরী (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীহীবেন্দ্রনাথ বায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীবকুমার নন্দী, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅমিয়কুমার সেন ।

বিজ্ঞান

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীচাকচন্দ্র হোম, শ্রীউষা সেন, শ্রীবিমলেন্দুনাথ বায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীঅকপবতন ভট্টাচার্য, শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যচরণ লাহা, ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ।

ইতিহাস

ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সর্কর (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীত্রিদিবনাথ বায়, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্ব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরানন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ শ্রীসুধীববজ্ঞন দাশ, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীনির্মল সিংহ (চেতলা) ।

অর্থনীতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীকানাইচন্দ্র পাল, শ্রীজ্ঞানশংকর সিংহ, শ্রীবল্লুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীকিবণশংকর সিংহ ।

৮০তম বর্ষের বিভিন্ন উপ-সমিতি

ছাপাখানা

শ্রীজ্ঞানশংকর সিংহ, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারাদন দত্ত, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবল্লুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

পুস্তক প্রকাশ

শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীমদন-মোহন কুমার, শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীত্রিদিবেশ বসু, শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীঅতীশ সিংহ, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

গ্রন্থশালা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীবিজ্ঞনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅকণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীঅনিলকুমার কাজিলাল।

চিত্রশালা

শ্রীত্রিদিবনাথ বায়, শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ বায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীসুধীকুমার নন্দী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনির্মল সিংহ, শ্রীসুনীল সিংহরায়, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীসুধীরবজ্র দাস।

আম্রব্যয়

শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ বায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণশংকর সিংহ, শ্রীব্রহ্মনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীগোবিন্দ দত্ত, শ্রীকমলকুমার ঘটক।

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রীসুখময় শাস্ত্রী স্মৃতিার্থ	প্রবোধ চন্দ্র বাগচী সম্পাদিত
জৈমিনীয় জ্যায়মালাবিস্তার : ৫.৫০	সাহিত্য প্রকাশিকা ১ম খণ্ড ১০.০০
মহাভারতের সমাজ । ২য় সং ১২.০০	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি
মহাভারত ভাবতীয় সভ্যতার নিত্যকালের ইতিহাস । মহাভারতকাল মানুষকে মানুষ রূপেই দেখিয়াছেন, দেবত্বে উন্নীত করেন নাই । এই গ্রন্থে মহাভারতের সময়কাল সত্য ও অবিকৃত সামাজিক চিত্র অঙ্কিত ।	দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলার নাথ সাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত ।
শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস	শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত
শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা ৫০.০০	সাহিত্য প্রকাশিকা ২য় খণ্ড ৬.০০
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শ্রীকপ গোহাষ্মী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থেব
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা ১২.০০	বসময় দাস কৃত ভাবানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লী'র আদর্শ পুঁথি ।
কৃতবিদ্য নাট্যকাব্য ও সুবসিক সাহিত্য-আলোচক রাজশেখরের জীবন চবিত ।	শ্রীহর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত	সাহিত্য প্রকাশিকা ৩য় খণ্ড ৮.০০
পরশুরাম রায়ের মাধব সংগীত ১৫.০০	এই খণ্ডে নবাবিকৃত যাদুনাথের ধর্মপুর্বাণ ও বামাই পণ্ডিতের অনাদেব পুঁথি মুদ্রিত ।
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) ১৫.০০	সাহিত্য প্রকাশিকা ৪র্থ খণ্ড ১৫.০০
বিশ্বভাবতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহেব ১৮২, মোট ৬৩২ খানি চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজের সংকলন গ্রন্থ ।	এই খণ্ডে হরিদেবের বায়মঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল বিশেষভাবে আলোচিত ।
পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড ১০.০০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৫.০০, তৃতীয় খণ্ড ১৭.০০	সাহিত্য প্রকাশিকা ৫ম খণ্ড ১২.০০
বিশ্বভাবতী-কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথির বিবরণী ।	সাহিত্য প্রকাশিকা ৬ষ্ঠ খণ্ড ২০.০০
শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি	সম্প্রতি প্রকাশিত :
রবীন্দ্ররচনা-কোষ	স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য—
প্রথম খণ্ড : প্রথম পর্ব ৬.৫০	শ্রীপদ্মপতি শাশমল
প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব ৭.০০	Urban Growth in Rural Areas—
প্রথম খণ্ড : তৃতীয় পর্ব ৮.০০	Chittapriya Mukherjee

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ কবে লিখুন—

বিশ্বভারতী

পোঃ শান্তিনিকেতন, বীহভূম ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ

গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ প্রত্যহ ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার ও অগ্নাহ্ন ছুটিব দিন বন্ধ থাকে।

কমিশনের হার

পরিষদ-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থাগার পক্ষে

১—৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ১৫%

৫০০ এবং তদুর্ধ্ব পর্যন্ত ২০%

সর্বক্ষেত্রে প্রেবণ খবচ স্বতন্ত্র এবং তাহা ক্ষেতাকে বহন করিতে হইবে।

ডিঃ পিঃ পি-ব ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য অগ্রিম প্রেবিতব্য।

ভারতকোষ

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য : ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড ২০ ০০ (কুড়ি টাকা) হিসাবে প্রতি খণ্ড,

৪র্থ খণ্ড ১০ ০০, পঁচ খণ্ড একত্রে ৯০ ০০ টাকা।

অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেবণ করা যায়। অন্যান্য ১০ খণ্ড লইলে গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড,

কলিকাতা—৬

ফোন—৩৫-৩৭৪৩

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ক্রেডিটপত্র

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা [বাংলা সাহিত্যেব একমাত্র নির্ভরযোগ্য
জীবনীকোষ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে সকল
স্ববর্ণীয় সাহিত্যসাধক ইহাব উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন
তাহাদেব নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থপরিচয়। রবীন্দ্র-পুৰস্কার প্রাপ্ত।]
সুদৃশ্য কাপড়ের বাঁধাই। মোট ১১ খণ্ড একত্রে মূল্য ১০০'০০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সম্বন্ধে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যানিধি বলেন

‘ মালাকার ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানব, পবিত্রমেব ও
সমাহবণ নৈপুণ্যেব প্রশংসা করিতেছি।...তিনি দেশজ্ঞান প্রচারেব নূতন পথ
দেখাইলেন। তাহাব সোনাব দোয়াত-কলম হউক।’

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ।

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) ॥

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত

৯ম সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাগ

—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) ॥

স্মারক-গ্রন্থ

পরিষদের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসবে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং
পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা হইতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন।

মূল্য—পনের টাকা মাত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

২৪৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

উনাশীতিতম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ৭৯তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদব সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিয়া ৭৯তম বার্ষিক কার্যবিবরণ উপস্থাপিত কবিতৈছি।

আলোচ্য বর্ষেব মধ্যে যে-সকল সাহিত্য-সেবী ও দেশেব কৃতী সন্তান পবলোক গমন কবিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদেব স্মৃতিব প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন কবি।

পবিষদেব ৭৯তম বর্ষেব সভাপতি অধ্যাপক নির্মলকুমাৰ বসুৰ পবলোক গমনে পবিষদেব অপূৰণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সুদীৰ্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন ও পবিষদেব উন্নতি সাধনেব চেষ্টা কবিয়াছিলেন।

মনীষী চক্রবর্তী বাজাগোপালাচাৰী, কবি নিশিকান্ত, উত্তবা-সম্পাদক স্নবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক দীপক চৌধুরী (নীহাববজ্ঞন ঘোষাল), ঐতিহাসিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, বৈজ্ঞানিক সতীশবজ্ঞন খাস্তগীৰ, কথাসাহিত্যিক সমুদ্র (অমূল্যকুমাৰ দাশগুপ্ত), কবি কৃষ্ণধন দে, পবিষদেব ভূতপূৰ্ব সহঃসম্পাদক স্নবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সদস্য নবসিংহদাস আগবওয়ালা, সাধাবণ সদস্য কৰুণাকুমাৰ হাজৰা ও মৃগাক্ষমৌলি বসু আলোচ্য বর্ষে পবলোক গমন কবিয়াছেন।

দেশবন্ধু-তনয়া অপৰ্ণা দেবী সম্প্রতি পবলোক গমন কৰিষাছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব অকৃত্রিম সুহৃদ ও শুভামুধ্যায়ী ছিলেন। বোগশ্যালয় দেহে পবিষদ-কর্তৃক প্রেবিত মনোহবশাহী, গডেবহাটী, বেনেটী ও ঝাডখণ্ডী বীতিব পদাবলী-কীর্তনেব একখানি পাণ্ডুলিপি অশেষ পবিশ্রম সহকাৰে তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহাদেব সকলেব পবলোকগত আত্মাব শাস্তি কামনা কবি।

আর্থিক অবস্থা

আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব শোচনীয় আর্থিক অবস্থাব কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দীৰ্ঘ কাল পরে এই বৎসব পবিষদেব সমস্ত ব্যয় নির্বাহ কবিয়া কিছু উদ্ধৃত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। সুখেব বিষয় পবিষদেব শোচনীয় আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও পরিষদেব বেতনভুক্ত কর্মীদেব দুই দফা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কৰা হইয়াছে।

পবিষদেব আর্থিক অবস্থাব কথা সদস্যগণেব সুবিদিত। গত কয়েক বৎসব পবিষদেব আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় ব্যয় সঙ্কুলানেব জন্ত বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলেব টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় কৰা হইয়াছিল। ফলে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল হইতে কৰ্জেব পবিমাণ ৬০,২০০ টাকা ৬৭ পয়সা দাঁড়ায়। গচ্ছিত তহবিলেব এই টাকা পূৰণ কৰা

পবিষদেব পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সবকারেব নিকট সহায়তা প্রার্থনা কবা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সবকারেব প্রদত্ত অর্থে ১৫৭৯ বঙ্গাব্দে একদফা ২৫,০০০ টাকা এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দেব প্রথমে একদফা ২৫,০০০ টাকা মোট ৫০,০০০ টাকা গচ্ছিত তহবিল পুৰণ কবা হইয়াছে। এজন্ত পশ্চিমবঙ্গেব শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা-সচিব ও অর্থ-সচিবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অবশিষ্ট ১০,২০০ টাকা ৬৭ পরসী পবিষদকে নিজ চেষ্টায় ঋণ শোধ কবিত্তে হইবে। আমবা ইতিমধ্যে গচ্ছিত তহবিলে ৯৫০ টাকা ঋণ পবিশোধ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছি। ঋণশোধেব জন্ত পবিষদ-সদস্য ও জনসাধাবণেব সাহায্য প্রার্থনা কবি। আয়বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচ দ্বাবা আমবা পূর্ব পুরুষদেব ত্রাস ও গচ্ছিত তহবিল অটুট বাখিত্তে পাবিব আশা কবি।

গৃহ-সংস্কার

দীর্ঘকাল ধবিয়া অর্থাভাবে পবিষদ-ভবন ও বমেশ-ভবন সংস্কাব কবা যায় নাই। ১৫৭৯ বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে পবিষৎ-সম্পাদক এই কার্যে সহায়তােব জন্ত বাংলােব ছাত্র-সমাজেব নিকট আবেদন কবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব জাতীয় শ্রম প্রকল্পেব কর্তৃপক্ষেব নিকট ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকগণেব সাহায্য প্রার্থনা কবেন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শ্রম প্রকল্পেব গুণদাস কলেজ ইউনিটেব ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বমেশ-ভবনেব সভাকক্ষ এবং পবিষদেব বিভিন্ন অংশেব সংস্কাবেব কার্যে শ্রমদান কবেন। পবিষদ-ভবন ও বমেশ-ভবনেব সংস্কাব প্রয়োজনীয় উপকরণ শ্রম ও অর্থ দানেব জন্ত পবিষদেব সভাপতি শ্রীশ্রীতিলকুমাব চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার ও পবিষৎ-সম্পাদক বঙ্গ-সাহিত্যাব্দবাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণেব নিকট সংবাদপত্র ও বেতােব মােবফৎ আবেদন কবেন। স্নেহেব বিষয়, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী বহু ব্যক্তিেব নিকট হইতে এই আবেদনে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। জন-সাধাবণ ও পবিষৎ-সভ্যগণেব দানে এবং সবকারী সহায়তােব আগামী বর্ষে পবিষদ-ভবন ও বমেশ-ভবনেব সংস্কাব ও উন্নয়নকার্য সম্ভব হইবে বলিয়া আশা কবি। পবিষদেব গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুথিশালােব ও জন্ত বর্তমান পবিষদ-ভবনেব উপব তৃতীয় তল নির্মাণেব বিশেষ প্রয়োজন। পবিষদেব প্রাচীন পুথি পট ও চিত্র, দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীষীদেব চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে বক্ষাব জন্ত ত্রিতলে অন্তত একখানি বাতাসকুল (এয়ােব কণ্ডিশং) কক্ষ নির্মাণ কবা প্রয়োজন।

কার্য-নির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব যাবতীয় কার্য সূচাক্রমে সম্পাদনেব জন্ত কার্যনির্বাহক-সমিতিেব ১৪টি অধিবেশন হইয়াছে। ৭৯তম বৎসবেব কর্মাদ্যক্ষ ও কার্য-নির্বাহক-সমিতিেব সভ্যগণেব নাম পবিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লিখিত হইল।

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীৰ সদস্যগণেৰ বিবৰণ পৰিষ্টিত 'খ'-এ প্ৰদত্ত হ'ল।

সভাসমিতি

আলোচ্য বৰ্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হ'ইয়াছে :

- ১। চিন্তাহৰণ চক্ৰবৰ্তী ও ভেৰা নোভিকোভাৰ স্মৃতিসভা : (২৪ আষাঢ় ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীসুশীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়
বক্তা : সৰ্বশ্ৰী দিলীপকুমাৰ বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, যতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচাৰ্য্য,
ত্ৰিদিবনাথ বায়
- ২। ইউৰোপে পুৰুলিয়াৰ ছোম্ভ্য প্ৰদৰ্শন : (৩০ আষাঢ় ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্ৰীআশুতোষ ভট্টাচাৰ্য্য
- ৩। অশীতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিবস : (৮ শ্ৰাবণ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীসুকুমাৰ সেন
প্ৰধান অতিথি : শ্ৰীহৰেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবন্ধু
বক্তা : শ্ৰীদিলীপকুমাৰ বিশ্বাস, শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ
- ৪। শ্ৰীঅবিনন্দ জন্মশতবাৰ্ষিকী ও স্বাধীনতাৰ বজত-জয়ন্তী উৎসব : (৩০ শ্ৰাবণ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্ৰীঅমিয়কুমাৰ মজুমদাৰ, শ্ৰী নীৰদবৰণ চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰী ত্ৰিদিবনাথ বায়,
শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ
- ৫। শ্ৰীঅবিনন্দ জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা সভা : (১ ভাদ্ৰ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্ৰীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰীনীৰদবৰণ চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰীশ্ৰামসুন্দৰ
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত, শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ,
শ্ৰীধীৰাজ বসু
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ জন্মোৎসব : (৩০ ভাদ্ৰ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীসুকুমাৰ সেন
বক্তা : শ্ৰীমনোজ বসু, শ্ৰীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্ৰীগজেন্দ্ৰকুমাৰ
মিত্ৰ, শ্ৰীসুখনাথ ঘোষ, শ্ৰীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- ৭। অধ্যাপক নিৰ্মলকুমাৰ বসুৰ স্মৃতিসভা : (১১ কাৰ্ত্তিক ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্ৰীশৈবাল গুপ্ত, শ্ৰীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য্য, শ্ৰীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য্য,
শ্ৰীহৰিপ্ৰসন্ন সেনগুপ্ত, শ্ৰীভবতোষ দত্ত, শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ

- ৮। কবি শশাঙ্কমোহন সেন জন্মশতবার্ষিকী : (৮ পৌষ ১৩৭৯),
 সভাপতি : শ্রীত্ৰিদিবনাথ বায়
 বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন,
 শ্রীস্বধীবকুমার বসু, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীত্ৰিদিবনাথ বায়
- ৯। কবি ভূজঙ্গধর বায়চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী : (৭ মাঘ ১৩৭৯)
 সভাপতি : শ্রীত্ৰিদিবনাথ বায়
 বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত
- ১০। নূতন ছাত্রসবক্ষক-সমিতি নির্বাচন : (১৭ মাঘ ১৩৭৯)
 সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ১১। ৮০তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচনে ভোট পরীক্ষক নির্বাচন :
 (১৮ চৈত্র ১৩৭৯)
- ১২। শ্রীভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী : (১৮ চৈত্র ১৩৭৯)
 সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 বক্তা : সর্বশ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল),
 অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- ১৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্ত আবতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি
 ও বামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তন : (২৬ বৈশাখ, ১৩৮০)
 সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
- ১৪। ববীন্দ্র-জন্মোৎসব : (২৬ বৈশাখ ১৩৮০)
 সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 প্রবন্ধপাঠ : সর্বশ্রী সুরকুমার সেন, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
 বক্তা : সর্বশ্রী ধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, কালীকিঙ্কর
 সেনগুপ্ত
 সঙ্গীত পরিবেশন : বৈতানিক-শিল্পী-গোষ্ঠী (শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
 নির্বাচিত সঙ্গীতাজলি)।
- ১৫। মাইকেল মধুসূদনের তিবোধান শতবার্ষিকী : (১৪ আষাঢ় ১৩৮০)
 স্থান : মধুসূদনের সমাধিপ্রাঙ্গণ
 বক্তা : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
- ১৬। বঙ্কিম-জন্মোৎসব : (১৬ আষাঢ় ১৩৮০)
 সভাপতি : শ্রীব্রমেশচন্দ্র মজুমদার
 প্রবন্ধপাঠ : (১) বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা : শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
 (২) যুগপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র : শ্রীব্রমেশচন্দ্র মজুমদার

কবিতাপাঠ : শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বক্তা : সর্বশ্রী সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশবন্ধন ভূঞা, মদনমোহন কুমাৰ

পুস্তক-মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে

- ১। বাংলা সাময়িক পত্র ১ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। বাগমোহন-গ্রন্থাবলী ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড
- ৩। বাজনাবাগ্ন বন্ধু (সাহিত্য সাধক চবিতমালা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতকোষ

ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের ব্যয় নির্বাহেব জন্ত আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় ও শেষ কিস্তি ৪৬ ০০০ ছেচল্লিশ হাজার টাকা অল্পদান মঞ্জুর কবিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদেব মাধ্যমে- ১৯ আষাঢ় ১৩৮০ (৪ জুলাই ১৯৭৩) ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থপ্রাপ্তিব পৰ ভাবতকোষ পঞ্চম খণ্ডেব মুদ্রণ কার্য্য জ্ঞত শেষ করা সম্ভব হইয়াছে। অচিবেই ভাবতকোষ প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সহায়তাব জন্ত পশ্চিম-বঙ্গেব শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গেব শিক্ষা-কমিশনার ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকুমাৰ গুহ ও শিক্ষা-অধিকর্তা অধ্যাপক শ্রীনিখীথবন্ধন কবকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্মারক-গ্রন্থ

৭৫তম বর্ষ পুঁতি উপলক্ষে পবিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থ শ্রীসবস্বতী প্রেস লিমিটেডে মুদ্রিত হইতেছে। উহাব মুদ্রণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে।

সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে উনাশীতিতম বর্ষেব (১-৪ সংখ্যা) সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

একসপ্ততিতম বর্ষেব (১৩৭১) পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় উহাও আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

অশীতিতম বর্ষ (১৩৮০) হইতে সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা পুনবায় ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে। অর্থাভাবে দীর্ঘ কাল পবিষৎ-পত্রিকা ত্রৈমাসিক স্থলে বার্ষিক রূপে প্রকাশিত হইতেছিল। অশীতিতম বর্ষেব পত্রিকাৰ প্রথম সংখ্যা (১৩৮০ বৈশাখ—আষাঢ়) মুদ্রিত হইয়াছে। অচিবেই প্রকাশিত হইবে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পবিষদ পুথিশালায় ২৮৯৬ খানি বাংলা পুথি মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। ছইখানি বাংলা পুথি পাওয়া যায় নাই—(১) ৭৬৯ নং পুথি (কাশীবাম দাসেব মহাভাবত

—বনপর্ব), (২) ২৫৬ নং পুথি (সীতাবাম দাসেব ধর্মমঙ্গল, আখড়া ও ফলানির্মাণ পালা)। ৭৬৯ নং পুথি কানীবাম দাসেব মহাভারত বনপর্ব পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ তারিখে পুথিশালাব তৎকালীন কর্মী তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য পবিষৎ-কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন।

পবিষদ্ পুথিশালায় বক্ষিত ২৭৩ খানি সংস্কৃত পুথি মিলান হইয়াছে। ১ খানি পুথি ৭৫৭ নং পদ্মপুবাণ স্বর্গখণ্ড পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীমদনমোহন কুমাবেব অভিযোগক্রমে পবিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি তদন্ত কবিতোছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৫৪ খানি বাংলা পুথি ও ২৮৫ খানি সংস্কৃত পুথিব তালিকা কবা হইয়াছে। বর্তমান বৎসবে মোট ৪০ খানি পুথি ৭ জন গবেষক ব্যবহাব কবিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালাব সর্কপ্রকাব পুথিব সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ৬৭২২। ইহাদেব বিষয় ভাগ নিম্নরূপ : বাংলা ৩৫৩৯ (সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ৩০৫০ + ৪৮৯), সংস্কৃত ২৯২৬ (সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ২২৭৩ + ৬৫৩), তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩। বিভিন্ন সংগ্রহেব মধ্যে আছে বাংলা পুথি : চিত্তবজ্ঞান—৪১১, বামেদ্রসুন্দব—২১ এবং গোপালদাস চৌধুরী—৫৭ এবং সংস্কৃত পুথি : চিত্তবজ্ঞান—১৩, বামেদ্রসুন্দব—৬০, গোপালদাস চৌধুরী—২৫৬, বিভাসাগব—৩২৪।

পবিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি

পবিষদেব ৭৮তম বর্ষেব সভাপতি ও সম্পাদকেব নিকট লিখিত ১৯শে মে ১৯৭২ তাবিখেব পত্রে কার্যনির্বাহক-সমিতিব অন্ততম সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমাব দ্বলত ও দুপ্রাপ্য প্রভুবন্ত ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ পবিষদেব চিত্রশালা পুথিশালা প্রভৃতি যথোচিতভাবে সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন কবিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে ৭৮তম বর্ষেব কার্যনির্বাহক-সমিতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ (১১ জুন ১৯৭২) তাবিখেব সভায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীদিলীপকুমাব বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীদিলীপকুমাব মিত্র সদস্যগণকে লইয়া ‘পবিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি’ গঠন কবিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি পবিষদেব চিত্রশালা, পুথিশালা, প্রাচীন মুদ্রা, প্রভুবন্ত এবং গ্রন্থাগাবেব সাধাবণ ও বিশেষ বিশেষ সংগ্রহেব দুপ্রাপ্য গ্রন্থাদি সম্পর্কে অহুসন্ধান কবিয়া পবিষদেব কি কি সম্পদ স্থানান্তবিত অথবা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যবহৃত অথবা অপহৃত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাব যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিববণ প্রস্তুত কবিয়া তাহাদেব সংগৃহীত তথ্যাদি ও ব্যবস্থা গ্রহণেব সুপাবিশ লিপিবদ্ধ কবিয়া যথাসম্ভব কার্যনির্বাহক-সমিতি ও শ্রাসবক্ষক-সমিতিব নিকট উপস্থিত কবিরাব দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। দুঃখেব বিষয়, উক্ত তদন্তকমিটি অতাবধি তাহাদেব সংগৃহীত তথ্যাদি, কাগজপত্র ও কার্য-বিববণ পুনঃপুনঃ অহুবোধসত্ত্বেও কার্য-নির্বাহক-সমিতি ও শ্রাসবক্ষক-সমিতিব নিকট দাখিল কবেন নাই।

নূতন শ্ৰাসবক্ষক-সমিতি

দীৰ্ঘকাল ধৰিষা পৰিষদেৰ শ্ৰাসবক্ষক-সমিতিৰ কোনও সভা আহুত হইত না। শ্ৰাসবক্ষক শ্ৰীফণিভূষণ চক্ৰবৰ্তী নিয়মাবলী অনুসাবে অবসৰ গ্ৰহণ কৰায়, শ্ৰাসবক্ষক লীলামোহন সিংহ বায় ও নিৰ্মলকুমাৰ বসু পবলোকগমন কৰায় এবং শ্ৰাসবক্ষক শ্ৰীসোমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নন্দী পদত্যাগ কৰায় শ্ৰাসবক্ষক-সমিতি কাৰ্য্যকৰ ছিল না। যাবতীয় স্বাবয়ব ও নিয়মাবলীৰ তপশীলভুক্ত অস্থাবৰ সম্পত্তিসমূহেৰ মালিকানা শ্ৰাসবক্ষক-সমিতিতে বৰ্ত্তমানয পৰিষদেৰ সম্পদাদি বক্ষণাবেক্ষণেৰ জন্তু শ্ৰাসবক্ষক-সমিতি নিৰ্বাচন কৰা একান্ত প্ৰয়োজন ছিল।

আলোচ্য বৰ্ষে শ্ৰীঅশোককুমাৰ সবকাৰ, শ্ৰীস্বকুমাৰ সেন, শ্ৰীপ্ৰমথনাথ বিশী, শ্ৰীসোমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ও শ্ৰীবিমলেন্দুনাৰায়ণ বায় পৰিষদেৰ নূতন শ্ৰাসবক্ষকসমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হইয়াছে। পৰিষদেৰ সম্পদ ও স্বার্থ বক্ষাব জন্তু তাঁহারা প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰিয়াছেন।

ৰামকমল সিংহ স্মৃতিবক্ষা সমিতি

পৰিষদেৰ ভূতপূৰ্ব কৰ্মী ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক ৰামকমল সিংহেৰ স্মৃতিবক্ষাব জন্তু গঠিত কমিটি তাঁহাব গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও সাধাবণেৰ নিকট হইতে আলোচ্য বৰ্ষে ২৫,০০০ টাকা দান সংগ্ৰহ কৰিয়াছেন।

আৰতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি ও ৰামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি

দানবীৰ মতিলাল শীলেৰ দৌহিত্ৰ-বংশীয় শ্ৰীকালিদাস মল্লিক তাঁহাব প্ৰতিষ্ঠিত 'কালিদাস মল্লিক চ্যাবিটেবল ট্ৰাষ্ট' হইতে মাসিক ৫০০ টাকাৰ অনুদান আৰতি মল্লিক গবেষণাস্মৃতি প্ৰবৰ্ত্তনেৰ জন্তু বেজেশ্বীকৃত ট্ৰাষ্ট ডীডেৰ দ্বাবা বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ অনুকূলে অৰ্পণ কৰিয়াছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ আৰতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি' নামে আলোচ্য বৰ্ষে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্ৰবৰ্ত্তন কৰা হইয়াছে।

আলোচ্য বৰ্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ ৰামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি' নামে-মাসিক ১৫০ টাকাৰ একটি গবেষণা-বৃত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিয়াছেন।

বাঁহাদেব দানে ও বদান্ততায় বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ 'কতৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গবেষণাব জন্তু বৃত্তি প্ৰবৰ্ত্তন কৰা সম্ভব হইল' তাঁহাদেব সকলকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কৰিতেছি।

স্মৃতি-পুৰস্কাৰ

আলোচ্য বৰ্ষে 'হেমচন্দ্ৰ স্মৃতি-পুৰস্কাৰ', 'অক্ষয়কুমাৰ ৰডাল স্মৃতি-পুৰস্কাৰ', 'স্বৰ্ণকুমাৰী দেবী স্মৃতি-পুৰস্কাৰ' ও 'লীলা দেবী স্মৃতি-পুৰস্কাৰ' পুনঃপ্ৰবৰ্ত্তন কৰা হইয়াছে।

‘হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ’, ‘বাংলা কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল’, ‘বাংলা কথাসাহিত্যে নিকপমা দেবী’ ও ‘কবি কামিনী বায়’ বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বচনাবলী যথাক্রমে উক্ত পুস্তকগুলি পবিষদেব ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে অল্প ৮ শ্রাবণ দেওয়া হইবে।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কার্য যথাবীতি পবিচালিত হইয়াছে। এ বৎসব গ্রন্থশালা মোট ২৬৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯,০৯৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৪.৩২ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার কবিয়াছেন (পূর্ব বৎসব ২৯.১০ জন গড়ে দৈনিক উপস্থিত ছিলেন)। ইহাব মধ্যে লেন-দেন-বিভাগে ২৬৫ দিন কাজ হয় এবং ৪,৪২৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬.৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বৎসব ইহাব দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪.৬০ জন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৫ দিন কাজ হয় এবং ৪,৬৭০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৭.৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বৎসব ইহাব দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪.৫০ জন। পাঠকক্ষে ও লেন-দেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১ ও ৩০ জন। ইহা ছাড়া এ বৎসব সদস্য নছেন এমন ৪২ জন ভাবতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা মোট ১৪৯ খানি পুস্তক ব্যবহার কবিয়াছেন।

এ বৎসব গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৮,২০৪ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬৮.৬০ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহাব মধ্যে লেন-দেন-পত্রকের সাহায্যে ৭০৪৪ (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬.৫০) ও পাঠকক্ষে ১১,১৬০ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪২.১০ খানি) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। পূর্ব বৎসব গড়ে দৈনিক ৪০.৫ খানি পুস্তকের লেন-দেন হইয়াছিল। বিষয়-আখ্যায়ী ও ভাষা-আখ্যায়ী এই আদান-প্রদানের-সংখ্যা পবিশিষ্ট ‘গ’-এ দেওয়া হইল।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (ইনডেক্সড) পুস্তকতালিকা পবিশিষ্ট ‘ঘ’-এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থশালাব পুস্তক-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাও আলোচ্য বৎসবে যথাসাধ্য অগ্রসব হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (Fumigation chamber-এ) এ বৎসব ৩০২ খানি পুস্তক পবিশোধিত হইয়াছে। অবিবত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাভাববশতঃ বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে পবিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ১,০২৮ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ‘ইহাদেব’ আনুমানিক মূল্য ৪,২৪০.২০ টাকা। ষাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ কবিয়াছেন আমবা তাঁহাদেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি।

পরিষদ বাঙলা অভিধান

আশী বৎসব পূর্বে বাঙলাব মনীষীবা বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব উদ্দেশ্য স্থিব কবিয়াছিলেন : “বিবিধ উপায়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেব অমুশীলন ও উন্নতিসাধন।” এই উদ্দেশ্য সাধনেব অল্প যে সাতটি উপায় তাঁহাবা নির্দিষ্ট কবিয়াছিলেন তাহাব প্রথমটি হইল “বাঙলা ভাষাব ব্যাকবণ ও অভিধান সঙ্কলন।” ১৫ বৎসব পবিশ্রম কবিয়া যোগেশ-চন্দ্র বায় বিদ্যানিধি বাঙলা ব্যাকবণ ও অভিধান সঙ্কলন কবেন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পবিষৎ কর্তৃক দুই খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হয়। ৬৫ বৎসব পূর্বে প্রকাশিত সেই অভিধান বর্তমানে দুপ্রাপ্য।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলা ভাষাব একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গক অভিধান বচনাব কাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব পক্ষ হইতে গ্রহণ কবাব প্রস্তাব হইয়াছে। সাধু, চলিত, আঞ্চলিক সমস্ত বাঙলা শব্দেব অর্থ, যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিকল্পি, সাহিত্যিক ও মৌখিক প্রয়োগেব কালানুক্রমিক নিদর্শন এই অভিধানে থাকিবে। এই কার্যে প্রভূত শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়েব প্রয়োজন। এই বিবাট কার্যে বাঙলাব প্রবীণ ও নবীন গবেষকদেব সহায়তা আমবা প্রার্থনা কবিতেছি।

প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

১৩০০ বঙ্গাব্দেব ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেব ২৩ জুলাই) Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাব কয়েক মাস পবেই “বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহাব নামকবণ কবা আবশ্যক” এবং “অপব ভাষা দেশেব লোকেব কাছে আত্মপবিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা হয়” বলিয়া Academy নামটি পবিবর্তন কবিয়া “বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ” কবা হইয়াছিল।

Bengal Academy of Literature-এব প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ শ্রাবণ তাবিখেই বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব ববাবব পালিত হইত। কয়েক বৎসব যাং এই অবগণীয় পুণ্য দিবসটি আমবা পালন কবি নাই, প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রতিষ্ঠাদেব অবগণ কবি নাই। আলোচ্য বর্ষে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব ৮ শ্রাবণ, পবিষদেব অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদাব সহিত আমবা যথা শক্তি পালন কবিয়াছি এবং প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবেব পুনঃ প্রবর্তন কবিয়াছি।

অল্পকাব এই পুণ্য দিবসে, তাঁহাবা পবিষদেব স্রষ্টা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, পবিষদেব সেবায় তাঁহাবা তন্ময় হইয়া আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন, পবিষদেব শ্রী বৃদ্ধি কবিয়াছিলেন তাঁহাদেব সকলকে প্রশংসা কবিয়া, অন্তবেব শ্রদ্ধা নিবেদন কবিয়া, তাঁহাদেব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবি। তাঁহাদেব শক্তি আমাদেব মধ্যে সঞ্চারিত হউক, তাঁহাদেব স্বপ্ন আমাদেব কর্মেব মধ্য দিয়া সফল হউক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ

৮ শ্রাবণ ১৩৮০ ॥

২৪ জুলাই ১৯৭৩ ॥

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ

পরিশিষ্ট—‘ক’

৭৯তম বর্ষের কর্মাদ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি

শ্রীবমেশ চন্দ্র মজুমদার

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীঅনাথ বসু দত্ত

শ্রীত্রিদিবনাথ বাবু

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহাবাধন দত্ত

শ্রীস্বধীষ কুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দুনাথ বাবু

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীভবতোষ দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীগোবাত্তগোপাল সেনগুপ্ত

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ২। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
- ৪। শ্রীকামিনীকুমার বাবু ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৬। শ্রীকুমারবিশ্ব ঘোষ
- ৭। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৯। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
- ১০। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
- ১৩। শ্রীদেবকুমার বসু ১৪। শ্রীদীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫। বেতাগী ফাদাব পি.
ফালো এস জে. ১৬। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ ১৭। শ্রীমনোমোহন ঘোষ
- ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহবাবু ১৯। শ্রীসন্তোষকুমার বসাক ২০। শ্রীহীবেন্দ্রনাথ বাবু
মুখোপাধ্যায়।

শাখা-প্রতিনিধি

- ১। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুৰ) ২। শ্রীস্বধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুৰ)



পরিশিষ্ট—‘খ’

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

বাক্যব : বাজা শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য : সর্বশ্রী বমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ কবিবাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ ।

আজীবন সদস্য : সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, প্রশান্তকুমার সিংহ, বসুধীষ সিংহ, মুবাবিমোহন সাইতি, বীবেন্দ্রনাথ বায়, হিবনকুমার বসু, সমীবেন্দ্রনাথ সিংহবাঘ ইন্দুভূষণ বিদ্য, ত্রিদিবেণ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাববজ্ঞন বায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মধাকান্ত দে, বিভূভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রাঘচৌধুরী আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদাব, ফণিভূষণ চক্রবর্তী স্বধীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, ক্লপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, বজ্রিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীবেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, বজ্রিতকুমার দাস, শিবেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীবোদকুমার বসু, সবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শঙ্কুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সবকাব, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখার্জি, গিবীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হবিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অববিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, দ্বজপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাশ, অরুণকুমার সেন, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, বমেশচন্দ্র ঘোষ, নবসিংহ দাস আগবওয়াল ।

সাধাবণ সদস্য সংখ্যা : ৮৮৭ জন

পরিশিষ্ট—‘গ’
পুস্তক আদান প্রদান—১৩৭৯
বিষয়ানুযায়ী

১৩৭৯	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	১০৭	৮৬	১৯৩
ধর্ম (২০০)	২১৩	৪৫৭	৬৭০
সমাজবিজ্ঞান (৩০০)	৫৪	২৪৭	৩০১
শিক্ষা (৩৭০)	৪২	৩৪	৭৬
ভাষা (৪০০)	৪৭	১২০	১৬৭
বিজ্ঞান (৫০০)	১৯	৪৯	৬৮
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	৬	২৬	৩২
শিল্পকলা (৭০০)	২০	৩৭	৫৭
সঙ্গীত (৭৮০)	৭১	৬২	১৩৩
সাহিত্য (৮০০)	৫৭৪৩	৩৭৮৫	৯৫২৮
ভূগোল বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১২	৮৬	২১০
জীবনী (৯২০)	৩৯৫	৭০৮	১১০৩
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১৫৮	৪১৩	৫৭১
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৪৫	৩৯১	৪৩৬
পত্র পত্রিকা		৪৬৫৯	৪৬৫৯
	৭০৪৪	১১১৬০	১৮২০৪

ভাষানুযায়ী

১৩৭৯	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৬৯১৭	১০২৩৯	১৭১৫৬
ইংবাজী	৮৯	৮৭৯	৯৬৮
সংস্কৃত	৩৮	৪০	৭৮
হিন্দী	-	২	২
	৭০৪৪	১১১৬০	১৮২০৪

পরিশিষ্ট—‘ঘ’
মোট পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৭৯)

গ্রন্থাগারে মোট পঞ্জীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা = ২,৬৯৬

(১৩৭৮ এ পঞ্জীকৃত পুস্তকের সংখ্যা—৫২০) ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

একাদশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব

মঙ্গলবার ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জুলাই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীমুন্সীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র মানবজাতি এখন বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিখা চলিতেছে। ভাবতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ—
বঙ্গভাষী জনগণের বাসভূমি ভাবত বাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য “পশ্চিমবঙ্গ” এবং স্বাধীন বাষ্ট্র
“বাংলা দেশ”—ও—সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা, বিভ্রান্ত, জ্ঞানহীন,
আত্মবিস্মৃত এবং চরম দুর্দশার কবলে। মনে হয়, এই অবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে
আমরা বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইব। এই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিপজ্জ্বালের মধ্যে জড়িত
হইয়া গিয়াছে—আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকের মধ্যে নিহিত প্রতিটি সমস্যা। আধুনিক
যুগের জগৎ-জোড়া বিপত্তির প্রধান কারণ হইতেছে, মানুষের সংখ্যার অতিক্রান্ত ক্রমবর্ধমান
ক্ষীতি। মাতা ধবণী আর বেশী দিন মানুষের ভাব বহন করিতে পারিবেন না—বহু
চিন্তাশীল ধীমতি বিচক্ষণ ব্যক্তি আশঙ্কা করিতেছেন, আর দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই
একটা কিছু ঘটবে। তাহার নানা লক্ষণ চারিদিকে দেখা দিতেছে। জীবনে
দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার, এবং অত্যাচার ও অবিচারের
বিকল্পে বিক্ষোভ ও পালটা অত্যাচার ও অবিচার, সমাজে নিষ্ঠুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, এ-সব কারণ-ও
আছে। এগুলির বিধ্বংসী শক্তিও বাড়িতেছে। জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণে খাদ্যাভাব,
জীবন-সংগ্রামে অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা, আপনাকে বাঁচাইবার আকাজক্ষায় প্রচণ্ড স্বার্থপরতা
আনুমানিক নীতিহীনতা, এখন-ই হাতে-হাতে যাহা পাওয়া যায় সেইরূপ সুখ-সুবিধা
লাভের জন্য দুর্বৃত্তি ও ভবিষ্যৎ-চিন্তার কথা একেবারে পবিত্র কব্যা—ব্যক্তিগত বা
ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা জাতিগত উভয়-বিধ জীবনেই—এই-সব এবং সঙ্গে-সঙ্গে আর ও
অনেক কিছু মিলিয়া আমাদের জীবনে একটা নৈতিক বিপর্যয় আনিয়া দিয়াছে।
সুসভ্য সমাজের উপযোগী মূল্য-বোধকে আমাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে,
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সমাজের সমস্ত দেহে গলিত
ক্ষত আশ্রয় করিয়াছে। ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে,
ইহাই অভাবের কথা, আর সব কিছুই বাহ।

এই অভাবনীয় অবস্থার কার্যকারণাত্মক আলোচনা জাতীয় জীবনে একটি প্রাথমিক
আবশ্যক বিষয় হইলে-ও, উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও আমাদের

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ এবং পবিষদেব সমক্ষে স্থাপিত ও বক্ষিত আমাদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা, এখনকার ভাবতীর্থ এবং বিশেষ কবিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণেব জীবন-বৃত্তের এবং জীবন-চর্য্যায় সমস্ত অঙ্গের মত, এই নৈতিক বিপর্য্যয় কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, এবং মূল্য-বোধ, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাব পূর্ণ অভাব এ ক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছে। পরিষদের এই আশী বৎসবেব জীবনে, সাম্প্রতিক কালের কয়েক বৎসবেব ইতিহাস আমাদের পক্ষে আদৌ গোঁববেব পরিচায়ক নহে। সুখেব বিষয়, আমাদের কেহ-কেহ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া, আমাদের মধ্য হইতে পবিষদেব কার্য্য সম্বন্ধে অমনোযোগ, স্বার্থসিদ্ধিবা আগ্রহ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীতিহীনতা প্রভৃতি, অধুনাতন কালের অভিশাপ-স্বরূপ এই-সমস্ত অবগুণ বিদূষিত কবিয়া দিয়া, আবাব যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ জাতিব সেবায় তাহাব পূর্বকাব কৃতিত্ব ও সাফল্য এবং মর্য্যাদা ফিবিয়া পায়, এই দুঃখেব দিনেও যাহাতে বাঙ্গালীবা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক গোঁববেব কিছুটাব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবা যায়, সেই জন্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, পবিষদেব হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায়, পবিষদেব কতকগুলি কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীবা সহযোগিতায়, এবং দেশাত্মবোধেব আদর্শে অনুপ্রাণিত কতকগুলি ছাত্রেব ও ছাত্রীবা নিঃস্বার্থ এবং অতল্ শ্রমদানেব ফলে, পরিষদ তাহাব মুমূর্ষু অবস্থা হইতে এখন একটু সামলাইয়া উঠিতে পাবিতেছে। ইহাব ছোট-বড় নানা প্রমাণ আপনাদের সামনে আমবা উপস্থাপিত কবিতে পাবিব, ইহাই পবিষদেব বর্তমান পবিচালকদেব পক্ষে বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা।

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীবা কিশোব ও তকণদেব মধ্যে এবং তাহাদের পবিচালক ইদানীন্তন কালেব বহু শিক্ষকেব মধ্যে, যে মানসিক ও সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক অবনতি স্থায়ী আসন কবিয়া লইতেছে, তাহা জাতিব পক্ষে ভয়াবহ। অলস এবং শ্রমবিমুখ হইয়া ও চিন্তাশীলতা বর্জন কবিয়া সকলেই এখন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে, নূতন-নূতন বিচাৰ-ধাৰা ও কর্ম-প্রচেষ্টাব স্থাপনা কবিতে ব্যগ্র। বিশেষ কবিয়া গণতান্ত্রিক অধিকাবেব দোঁহাই দিয়া (যে অধিকাৰ এখন আব নাই) এই নিত্য-নব-নব মত প্রচাৰিত হইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ যে কাজে আত্মনিযোজিত হইয়া যথা-শক্তি এই আশী বছর ধবিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণেব সেবা কবিয়া আসিতেছে, তাহাব স্তূৰ্ণ পবিচালনায এবং মৌলিক আদর্শগুলিবা সংবক্ষণে, আমাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক অবনতি, আলস্য ও শ্রমবিমুখতা, শৃঙ্খলা-ভঙ্গেব নিবোধ প্রবৃতি ও নূতনত্বেব অন্ধ আবাহন—এই-সবে মিলিয়া, নানা প্রকাৰ অন্তবায় সৃষ্টি কবিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ আশী বছর পূর্বে যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইয়া ছিল যে, সব দিক্ দিয়া বাঙ্গালীবা মাতৃভাষা বাঙ্গলাব আলোচনা ও উন্নতি-বিধান, বাঙ্গলা সাহিত্যেব সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন, এবং বাঙ্গালীবা সংস্কৃতিব

অমূল্যলন ও পৰিপোষণ কবাই হইবে পৰিষদেৰ কৰ্তব্য। দেশবাসীৰ সহায়তায় যথা-জ্ঞান যথা-শক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ এই কাৰ্য্য কৰিয়া আসিয়াছে, এবং এ যাবৎ পৰিষদ ষেটুকু কবিতো পাবিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। হয়তো তাহা সৰ্বতো ভাবে গোবৰময় নহে, কিন্তু পৰিষদেৰ গবেষণাত্মক, পুস্তক-প্ৰকাশাত্মক, নিৰ্দেশাত্মক কৃতিত্ব আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰশংসনীয়ই বলিতে হইবে, এবং বহুশঃ অল্পকবণীয়ও বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতীতেৰ কথা লইয়া কালক্ষেপ কবিবাব আবশ্যকতা নাই। বাঙ্গালা ভাষাৰ সেবা, ইহাৰ চৰ্চা ও উন্নতি-সাধন—এইটাই হইতেছে পৰিষদেৰ অল্পতম প্ৰত্যক্ষ ও মুখ্য কৰ্তব্য বিষয়। নূতন-নূতন সাহিত্য-সৰ্জনা, সাহিত্যে কাব্যজীৱী প্ৰতিভাৰ সন্ধান ও তাহাৰ উন্মেষে সহায়তা দান—পৰিষদেৰ আৰ্থিক শক্তি সক্ষীৰ্ণ ও সীমায়িত বলিয়া, এবং সাহিত্যিক প্ৰতিভা স্বত-উৎসাবিত ঈশ্বৰীয় বিভূতি, ইহা কেবল মানুহেৰ উৎসাহ-সাপেক্ষ ও পৃষ্ঠপোষকতা-সম্পন্ন নহে এই কাৰণেও, প্ৰত্যক্ষ ভাবে ইহা পৰিষদেৰ কৰ্মক্ষেত্ৰেৰ বাহিৰে—যদিও সাহিত্য-বচনাব ক্ষেত্ৰে পৰিষদেৰ আগ্ৰহ সদাবিচক্ষমান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ সঙ্গে আমাৰ ছাত্ৰ-জীৱনেৰ অবসানেৰ সময় হইতেই সংযুক্ত থাকিবাব সৌভাগ্য আমাৰ হইয়াছে, এখন হইতে প্ৰায় পঁয়ষষ্ঠি বৎসৰ হইয়া গেল। এই সেবা-কাৰ্য্যে প্ৰত্যক্ষভাবে হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী ও বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী, এবং পৰোক্ষ ভাবে ববীন্দ্ৰনাথ, গুৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত প্ৰমুখ মনীষীদেৰ ভাৰশিষ্য ও অনুগামী হইতে পাবিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কলেজে পাঠ কবিবাব সময়ে ইংবেজী ও অল্প ইউৰোপীয় ভাষায় প্ৰবৰ্ত্তিত বিজ্ঞান-সম্বন্ধ নবীন আলোচনাবীতি অধ্যয়ন কৰিয়া ও তাহাৰ যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া, বাঙ্গালাৰ মনীষীদেৰ আশীৰ্বাদ লইয়া, মাতৃভাষাৰ আলোচনাতেও সেই বীতিৰ প্ৰয়োগেৰ আকাঙ্ক্ষা ও প্ৰচেষ্টাই হইয়াছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং অনুগামী শিষ্যদেৰ দেশনায় নিযোজিত আমাৰ সুদীৰ্ঘ শিক্ষক-জীৱনেৰ মুখ্য প্ৰেৰণা। এই কাৰ্য্যে আমি আশাতীত এবং নিজ যোগ্যতাৰ তুলনায় অধিক উৎসাহ এবং সুযোগ সুবিধা পাইয়াছি। কতকগুলি বিষয়ে নূতন আলোকেৰ সন্ধান পাইয়া আমি পুলকিত হইয়াছি, মনেৰ গভীৰে আশ্চৰ্য্য লাভ কৰিয়াছি, এবং ভক্তকবি তুলসীদাসেৰ কথায়, অপূৰ্ব “স্বাস্তঃ স্তুত্ব” পাইয়াছি। মাতৃভাষাৰ যৎকিঞ্চিৎ সেবাৰ অধিকাৰী হইয়া, জীৱনেৰ সায়াহ্ন-কালে এই ৮৩ বৎসৰ বয়সে এখন চাবি দিকেই দুঃখ কষ্ট স্বাৰ্থান্ধতা নীতিবোধেৰ অভাব আমাকে পীড়া দিতেছে, জীৱনেৰ সাৰ্থকতা যেন আব খুঁজিয়া পাইতেছিনা, এখন প্ৰাথমিক যুগেৰ খ্ৰীষ্ট-ভক্তেৰ কথায় বলিতে চাই—*nunc dimittis servum tuum, Domine, in pace*—“এইবাব, প্ৰভু, শান্তিতে তোমাৰ দাসকে বিদায় দাও।”

গীতাৰ কথা আমাৰ কি ভুলিয়া যাইতেছি? “শ্ৰদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্”—গুৰুজনেৰ প্ৰতি, বিষয়-বস্তুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিলে তৰে জ্ঞানলাভ হয়, এবং “প্ৰণিপাতেন, পৰিপ্ৰস্নেগে,

সেবয়া”—পূর্বাচার্যদেব ও পথিকৃৎদেব প্রণাম কবিয়া, নানাভাবে চতুর্দিক হইতে প্রশ্ন কবিয়া, এবং বিজ্ঞা অর্জনের জন্ত সেবা বা পবিত্র কবিয়া তবে জ্ঞান আহরণ কবিতে হয়। আন্তরিক প্রশ্ন হাবাইতেছি, পবিত্রমে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি, নানা প্রকারেব বাজনৈতিক মতবাদেব বুলি আওড়াইতে শিখিয়াছি—মনে কবিতেছি, তুড়ি দিয়া “ফোকেটে সব মারিয়া দিব”—বিবেকানন্দেব উপদেশ ভুলিয়া যাইতেছি—“চালাকি দ্বাৰা কোনও মহৎ কার্য হয় না।” কোন্ দিক্ সামলাইব ?

“ও তোব শিবে কৈল সর্পাঘাত—তুই তাগা বান্ধিবি কোথা ?”

“বুদ্ধন্ত বচনং গ্রাহম্ আপৎকালে হুপস্থিতে”—এই নীতিবাক্য অবগণ কবিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিত্রদেব প্রধান-কার্য্য, বঙ্গ-ভাষাব সেবা—সংবক্ষণ, উন্নয়ন, প্রসাধন,— ইহা কী কবিয়া কবিতে পাবা যায়, সে বিষয়ে দুই-একটি কথা এই আপৎকালে নিবেদন কবিব।

বাঙ্গলা ভাষাব সেবা কল্পে প্রথম কথা—সত্যাকার প্রশ্নাতাব এই ভাষাব সম্বন্ধে না আসিলে, কার্য্যকর কোনও কিছু কবা সম্ভবপব হইবে না। উপব-উপব কতকগুলি Slogan বা “নাবা”—বা “দলীয় নাদ” দিয়া কোনও লাভ নাই। “বাঙ্গলা-ভাষা বাঙ্গলা দেশেব জীবনে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক,”—কেবল এই চীৎকাবেই কি প্রার্থিত প্রতিষ্ঠা হইতে পাবিবে ? কি কবিয়া ইহাকে সম্ভবপব কবা যাইতে পাবে, ইহাব অন্তবায় কোথায়, আমাদেব-ই বা শক্তিব অভাব কোথায়—এ-সব কথা কি ধীর ভাবে বিচাব কবিব না ? খালি ইংবেজি ভাষাকে বিতাড়িত কবিতে পাবিলেই—যেমন কতক শিক্ষক-বৃত্ত ব্যক্তিও বলিতেছেন, এবং ছাত্রদেব আশ্বাবা দিতেছেন—কি বাঙ্গলা-ভাষাব পক্ষে সর্বাধ-সিদ্ধি হইবে ? একটু এ বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবেন না কি, যে এই যুগে জাতীয় মানসিক জীবনে, মাতৃভাষাব এবং মাতৃভাষাব সাহিত্যেব ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-বচনাব জন্ত, Physical Sciences অর্থাৎ “ভৌতিকী বিজ্ঞা” এবং Human Sciences অর্থাৎ “মানবিকী বিজ্ঞা”, এই উভয়-বিধ জ্ঞান বা বিজ্ঞাব প্রবর্ধনেব জন্ত, যাহাবা এই কাজে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদেব পক্ষে এক সঙ্গে ইংবেজি ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাতেই প্রাণীণ্য অর্জন কতটা অপবিহার্য্য ? ইংবেজি কবি Richard Lovelace বিচার্ড লভলেস্ তাঁহাব প্রণয়িনীকে উদ্দেশ কবিয়া যে ভাবটি প্রকাশ কবিয়াছিলেন—

I could not love thee, dear, so much,
Loved I not Honour more,—

তাহাব আশ্রয় লইয়া বিষয়টিব অন্তর্নিহিত গুরুত্ব প্রশিধান কবিয়া, মাতৃভাষাব প্রতি সত্যাকার প্রশ্না দ্বাৰা প্রণোদিত হইয়া, কেবল অজ্ঞান ও অহেতুক ইংবেজি বিদ্বেষ ও সংস্কৃতেব প্রতি অবজ্ঞাব দ্বাৰা চালিত না হইয়া, আমবা মনে প্রাণে বলিতে শিখিব, এবং তদনুসাবে কার্য্য কবিব—

I could not love thee, my Mother Bengali, so much,
Loved I not English and Sanskrit more.

“হে মাতা বঙ্গ-ভাষা, যদি আমি ইংবেজি আব সংস্কৃতকে তোমাব চেয়ে বেশি ভালো না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এত ভালো বাসিতে পাবিতাম না।”

এই কথাব অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রাণধান কবিতে পাবিলে আমবা সহজেই বুঝিব, আমাদেব ভাবতীয় ভাষাব সংবক্ষণ ও পুষ্টি-সাধনে “অংবেজী হটাও” নীতি এবং “মৃত ভাষা সংস্কৃত বর্জনে কোনও ক্ষতি নাই” এই চিন্তায় কার্য্য কবা, কি ভীষণভাবে হানিকর হইবে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে, পবিষদেব কর্তব্য বিচাব কবিতে-বসিয়া, আমাদেব উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত ও ইংবেজিব অপবিহার্য্য আবশ্যকতাৰ বিচাব একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এই মনোভাব এবং অল্প নানা প্রকাৰেব মনোভাব আসিয়া দেশে যখন শিক্ষাকে কলুষিত কবিতেছে, পঙ্গু কবিয়া দিতেছে, তাহাব দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ কবাব ঔচিত্য আছে বলিয়া মনে কবি।

পবিষদেব কতকগুলি মহাপ্রাণ হিতৈষীৰ অল্পগ্রহে কিছু মাসিক সাহায্য নিয়মিত ভাবে পাওয়া যাইবে, স্থায়ী আয় হইবে—“আবতি মল্লিক বৃত্তি” মাসিক ৫০০ টাকা, এবং “বামকমল সিংহ বৃত্তি” মাসিক ১৫০ টাকা এই দুইটি মিলিয়া। পবিষদেব স্থাপনাৰ সময়েই একটি কার্য্যভাব পবিষদ গ্রহণ কবিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাভাবে স্বেচ্ছায়গেব অভাবে এই স্নদীৰ্ঘ আশী বছৰেও তাহা পবিষদ হাতে লইতে পাবেন নাই। সেটি হইবে বাঙ্গলা-ভাষার একখানি বিবাট, সম্পূর্ণ অতিধান—প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক বাঙ্গলাৰ সাহিত্যিক লিখিত এবং আঞ্চলিক কথ্য সব প্রকাৰেব রূপেব সম্পূর্ণ শব্দসংগ্রহ। স্বাধীন পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ “বাংলা-দেশে”, ভাবতান্তর্গত পশ্চিম-বঙ্গে, বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে, যত প্রকাৰ ভাষা প্রচলিত ছিল বা আছে সেগুলিব পূবা শব্দ একখানি মহা কোষগ্রন্থস্থ ধবিয়া বাখিবার চেষ্টা হইবে। সাহিত্য হইতে এবং মৌখিক ভাষা হইতে বাক্য উদ্ধাব কবিয়া, ধাবাবাহিক রূপে প্রয়োগও প্রদর্শিত হইবে। এই বিষয়ে আমবা এখন চিন্তা কবিতেছি, কর্মপদ্ধতি নির্ধাবণ কবিতেছি। ইহাতে বঙ্গ-ভাষী সমগ্র জনগণের সহযোগিতা আবশ্যক হইবে। যে অর্থ লইয়া আমবা এই বিবাট কার্য্যে নামিব, তাহা যথেষ্ট হইবে না। দেশবাসীৰ ও বাজ্য সবকাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারেব আর্থিক সহায়তা-ও এই ব্যাপাবে অপেক্ষিত। অন্ততঃ ৪/৫ বৎসবেব কাজ, উপযুক্ত সম্পাদক-মণ্ডলীৰ পবিচালনায়, স্বেচ্ছায়গ ও একনিষ্ঠ বৃত্তিভুক্ কর্মীদের লইয়া এই কার্য্য কবিতে হইবে। আমবা এতদিন পবে, ছুপনেন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম কবিয়া, বাঙ্গলা-ভাষাব নূতন বিশ্বকোষ “ভারতকোষ” গ্রন্থখানিব পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিয়া একটি গুৰুতাব দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলাম। “ভারতকোষ” সংক্ৰান্ত সমস্ত কাজ পূবা হইতে চলিল, এই বাব আমবা বাঙ্গলা-ভাষাব মর্যাদা বৃদ্ধি কবিবাব উপযুক্ত আব একটি কাজে হাত দিবাব আশা কবিতেছি।

বাঙ্গলা-ভাষার চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বিবোধী শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষার সেবক প্রত্যেক স্মৃদীজনের অবহিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত-জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসাব পথে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাকে কতকগুলি স্বকপোল-কল্পিত ধাবণাব বশবর্তী হইয়া ত্যাগ করা ঠিক হইবে না। এই নিয়মানুবর্তিতার বিবোধী প্রচাৰ ও প্রয়োগের ফলে, সাধাবণ বঙ্গ-ভাষীর মনে তাহাব ভাষা সম্বন্ধে অনাবশ্যক ভাবে কতকগুলি সমস্তা দেখা দিতেছে। পবিষদ্ যদি বঙ্গ-ভাষী জনগণের শ্রেষ্ঠ মনীষাব কর্মক্ষেত্রে হইবাব দাবী করিতে পারবে, তাহা হইলে পবিষদের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য পথ এবং পালনীয় নিয়ম জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য হইবে। পবিষৎ-প্রদর্শিত পন্থা ও নিয়মাবলীর আধাব হইবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত বস্তুনিষ্ঠ বিচাব ও নিষ্কর্ষ। এ বিষয়ে লঘু ধাবণা ও অজ্ঞ চিন্তাব অবকাশ নাই।

নিয়মানুবর্তিতার অভাব বাঙ্গালী চবিত্রেব একটি বিশেষ দৌর্বল্য। মাতৃভাষাব ব্যবহাব সম্বন্ধে আমবা নিবন্ধুশ। তাহাব আব একটি কাবণ, ভাষাব সব বকমেব বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রকাবের প্রয়োগ আমবা মানিয়া লইয়াছি। তৎসত্ত্বেও, বিগত উনিশেব শতকে বাঙ্গলাব শ্রেষ্ঠ লেখকগণ, বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌবব-স্বরূপ যে আদর্শ তাহাদের বচনায় দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন কবিয়া বাঙ্গলা-ভাষাব একটি পবিষ্কাব সর্বমান্ব বীতি বা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শ বা পদ্ধতি বর্ণ-বিভ্রাসে, ব্যাকবণে, বাক্যবীতিতে এবং শব্দ-চয়নে শব্দ-স্বজনে ও শব্দ-প্রয়োগে একটি প্রশস্ত বাজমার্গ প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছে, যাহা অবলম্বন কবিয়া বাঙ্গলা-ভাষাব লিখনে পঠন-পাঠনে এতাবৎ সকলেই এবটা দিশা পাইয়াছে, সরল সার্থক চিন্তাব ও ভাবপ্রকাশের সহজ উপায় পাইয়াছে। এই সুবুদ্ধি ও সৎচিন্তার পবিপোষক বাঙ্গলাব শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের দান এই বাঙ্গলা পঠন পাঠন ও লিখনেব পবিপাটী বা পদ্ধতি আমবা দায়িত্ববোধহীন ভাবে ধ্বংস কবিয়া, জাতিব মনেব প্রকাশে ও পবিবর্ধনে সদা-সহায়ক তাহাব ভাষাব ক্ষেত্রে বিচাবহীন অবাজকতা আনিতে চাহিতেছি—যাহা সত্য বা হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই কেবল বাজনৈতিক অথবা সামাজিক দলেব প্রচাবিত এমন কতকগুলি মতবাদের মোহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে একটা বিনীত এবং সূদৃঢ় প্রতিবাদ বাঙ্গালী জাতিব সুবুদ্ধি, বিচাবশীল ও যুক্তিবাদী সজ্জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কয়টি বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন কবিতো চাহি :

- (১) আধুনিক বাঙ্গলা বানানকে কোনও-কোনও স্থলে পবিবর্তনের চেষ্টা।
- (২) বাঙ্গলায় সাধু-ভাষা বনাম চলিত-ভাষাব বিবোধকে নুতন ভাবে আনিয়া, সাধু-ভাষা বর্জনের চেষ্টা।

- (৩) বাঙ্গলা ব্যাকবণে সংস্কৃত ব্যাকবণের স্থান।
- (৪) বাঙ্গলা শব্দের নিকজ্জি বা উৎপত্তি বিচাব।
- (৫) বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ।
- (৬) আধুনিক বাঙ্গলায় অনুবাদ-সাহিত্য।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একে-একে আমার বিনম্র নিবেদন বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের এই একাধীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাইয়া রাখিতেছি।

(১) বাঙ্গলা বানানের কথা।

দুইটি মুখ্য বিষয় প্রথমেই বলিয়া রাখিতে চাই— (১) পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নাই যে ভাষাব লিপি মুখ্যতঃ তাহার উচ্চারণ প্রকাশের জন্তই গঠিত হইয়াছে, তাহার সেই ধ্বনি-নির্দেশক লিপির বর্ণ-বিশ্বাস ভাষাটির উচ্চারণকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। উচ্চারণ ও বানানে একটা তুল্য-বিশ্বের পার্থক্য থাকিয়া যাইবেই। কিন্তু সাধাবণতঃ ভাবলেখাব কাজে তাহা এমন কিছু মাবান্নক ব্যাপাব নহে। সেই জন্ত, একেবাবে কথ্য ভাষাব উচ্চারণের প্রতিচ্ছায়া হইবে— কোনও ভাষাব লিপি ও বানান, এই রূপ দুবাশা করিয়া, বাঙ্গলা বা অন্ত কোনও ভাষাব প্রচলিত বানানকে একেবাবে অথবা মুখ্যতঃ উলটাইয়া দিয়া “ঢালিয়া সাজিবাব” চেষ্টাব কোনও সার্থকতা নাই। কবিত্তে গেলে, নানা অনপেক্ষিত জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, যে-সব প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নাই, হওয়া দুক্লহ। (২) উচ্চারণের ও বানানের অসামঞ্জস্য, পীড়াদায়ক হইলেও যাহা বহু শতকেব অভ্যাসে লোকে মানিয়া লইয়াছে, এইরূপ “অবৈজ্ঞানিক” বানান সহিয়া গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও লোকে নূতন বানানে অস্বস্তি বোধ কবে, প্রচলিত নিয়ম বর্জন করিয়া নূতন কিছু আনিয়া, নূতন জিনিস লইয়া, লাখ-লাখ, এমন কি কোটি-কোটি মানুষের সুবিধা না বুঝিয়া, কেবল পবীক্ষা বা গবেষণা করিবাব আকাঙ্ক্ষাব কোনও সার্থকতা নাই। ইংবেজিতে knight (ক্ৰিষ্ট) এই ত্তপবিচিত্ত বানান ছাড়িয়া কেহও nite বা nait (নাইট) এখনও পছন্দ কবে নাই, usual ছাড়িয়া yuzhuual বানানের প্রচলনের চেষ্টাও সফল হয় নাই। তেমনি বাঙ্গলায় “লক্ষ্মী” (=ল-ক্-ষ্-ম্-ঈ) বানানের বদলে “লোক্খি,” “সহ” (=স-হ্-য়) বানানের বদলে “শোজ্ঝো” (কলিকাতাব চলিত-ভাষাব উচ্চারণ ধবিয়া) অথবা “শইজ্ঝা” (পূর্ব-বঙ্গের কোনও-কোনও অঞ্চলের উচ্চারণের নকল করিয়া) লোকে এখন গ্রহণযোগ্য মনে কবে না। তদ্রূপ সাধু-ভাষাব “কলিকাতা”-ই সমধিক কার্যকর, কলিকাতাব প্রাকৃত উচ্চারণ ধবিয়া “কোল্কাতা” বা “কোল্কেতা” বানান বহু খাস কলিকাতা-বাসীর পক্ষে পীড়াদায়ক, এবং “কোল্কেতা” লিখিলে প্রশ্ন উঠিতে পাবে, বঙ্গভাষাব ক্ষেত্রের মধ্যে দুই-তিহাই (তিন ভাগের দুই ভাগ) অঞ্চলে প্রচলিত “কইল্কাতা” (বা “ক’লকাতা”)-ই বা চলিবেনা কেন?

এই ব্যাপাবে আমি, বিশেষ বিনয় ও শ্রদ্ধা সহ, জানাইয়াছিলাম—বাহুল্য খাটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ, বাঙ্গলা ঋণ-ভঙ্কিতের সুপ্ত-তিঙ্ত পদের উচ্চারণের ইতিহাস একটু বিচার কবিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়, কেন এই প্রচলিত বানান দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া বহিয়াছে। ইহাব যৌক্তিকতা কি—বাঙ্গলা ধ্বনিতত্ত্বের ও রূপতত্ত্বের বিচারে এই বানানের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক।

একখানি বহুল প্রচাৰিত বাঙ্গলা দৈনিকে, বাঙ্গলা বর্ণমালায় সংযুক্ত বর্ণের অবস্থান হানিকব, প্রধানতঃ এই বিচারে, সংযুক্তবর্ণ বর্জন কবিয়া যে অভিনব বানানের প্রচার করা হইতেছে—তৎসম্বন্ধে ভাষাব ইতিহাস বিচার কবিয়া, বিশ্বের আব পাঁচটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাব নজীব বিচার কবিয়া আমাব বক্তব্য আমি সব দিক্ হইতেই জানাইয়াছিলাম। তাহাতে কোনও রূপ অসম্মান, উদ্ভা বা প্লেষ প্রকাশ কবি নাই। পূৰ্বা ব্যাপারটির আলোচনা পবে ইংবেজিতেও Philological Society of Japan-এর আন্তর্জাতিক বিচারেব অন্ততম প্রকাশ-ক্ষেত্র পত্রিকাতে-ও প্রকাশিত ববি। আমাব বক্তব্যগুলি যে ভ্রান্ত, ইহা প্রদর্শিত হইলে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা আমি বর্জন কবিব। আমার Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এই-সব কথার পূর্ণ বিবেচনা আছে, এবং তাহা দেশেব ও বিদেশেব ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার বাঙ্গলা লিপিব একটি প্রাথমিক কথা—ইহাতে তাহাব নাজীব খবর নিহিত। বাঙ্গলাব কতকগুলি নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে—যথা, আত্ম অক্ষবেব উপবে বলাঘাত, দ্বিমাত্রিকতা, অপিনিহিতি, অভিপ্রতি। শব্দের অন্তে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গলা উচ্চারণেব প্রকৃতি-বিকল্প; বাঙ্গলা উচ্চারণ অনুসাবে, সব সময়েই বিদেশী শব্দের syllable বা অক্ষবে পব-পব অবস্থিত অন্তিম দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনিব মধ্যে বিপ্রকর্ষ বা স্ববতন্তি আসিবেই, অথবা বিকল্পে শব্দের অন্তে এই দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনিব আশ্রয়-স্থল রূপ একটি স্ববধ্বনিব আগম হইবে—এই-সব কথা, বাঙ্গলা ভাষাব প্রকৃতিব পক্ষে মৌলিক, আধার-ভূত কথা। কোন্ বাঙ্গালী “লবড” (=ল-ব-ড) এই বানান দেখিয়া, শব্দটিকে “ল-রড্” রূপে না পড়িয়া, ইহাকে “লর্ড” (বা “লর্ড্”) রূপে পড়িবে? “পয়েন্ট, জয়েন্ট”=ইবেজিব point, joint শব্দ-দ্বয়েব বাঙ্গলা প্রতিবর্ণীকরণেব নূতন প্রস্তাবিত রূপ দেখিয়া, একাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে “পয়ে-ন্ট, জয়ে-ন্ট” রূপে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। অথচ এই নবীন বানানে, কেবল নূতনত্বের মোহ ছাড়া আব কি আছে? কেবল সংযুক্ত-বর্ণ-বিষেব ছাড়া আব কিসেব সিদ্ধি এইরূপ বানানে? শব্দগুলি সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়া লিখিলে, লিখিতে আবও দীর্ঘতব হইতে বাধ্য এবং সব ক্ষেত্রে তো আমবা সংযুক্তবর্ণ একেবাবে বাদ দিতেও পাবিতেছি না। ইহাতে লাভ কি? কেবল “মোছ কুমাইয়া মড়া হাল্কা-কবণ” হইল না কি? ভাষাব বোধগম্যতাৰ কথা ধবিলেও, ইহা কতটা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইল, তাহাব বিচার কবিব না? বাঙ্গলা

“তাবক, পালক, গায়ক, বজক, মশক, বালক” প্রভৃতিব সঙ্গে “আবক”-ও পাই, উচ্চারণে আ-বক্ (যথা—“যোয়ানব আবক”), কিন্তু খামখা “আবক” শব্দের প্রচলিত উচ্চারণকে জবব-দখলে আনিয়া, Joan of Arc (বা Jeanne d’ Arc) এই বিদেশী নামটিকে বাঙ্গলায় “যোয়ান অফ আবক” (সংযুক্ত বর্ণ “ক্” অথবা হসন্তযুক্ত বানান “ব্ ক্” বঞ্জন করিয়া) লিখিলে কি বাঙ্গালী পাঠককে খামখা বিভ্রান্ত কৰা হইবে না ।

এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে । আমবা কোথায় ভাষাব ইতিহাস-সম্মত ও প্রকৃতি সম্মত নিয়ম পালন কবিয়া ভাষাব মর্য্যাদা রক্ষা কবিব—না, তাহাব পবিবর্তে এ কি কবিতোহি? এইসব পবিবর্তনের সমর্থনে তাঁহাবা যুক্তি দিন; এ বিষয়ে ভাষাব ও জাতিব মানসিক কল্যাণেব জন্ত বিচাব হউক ।

এ সম্বন্ধে অধিক আব কি বলিব? যাহা বলিবাব, ইতিপূর্বে পূর্ণভাবে তাহা বলা হইয়াছে । “অত্র বঙ্গভাষি-মনীষিণঃ প্রমাণম্”—এখানে বঙ্গ-ভাষী মনীষী ব্যক্তিগণই বিচাব কবিয়া মত দিন ।

(২) বাঙ্গলাব সাধু-ভাষা ।

প্রত্যেক স্প্রতিষ্ঠিত ভাষা, যাহাব পুৰাতন সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, বিভিন্ন প্রকাৰেব বচনা-শৈলীব মাধ্যমে স্ব-প্রকাশ । আধুনিক ভাবভীয সমস্ত ভাষাতেই একাধিক শৈলী দেখি । পুৰাতন চালেব ভাষা, সৰ্বত্রই পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ সাহিত্যে নিবদ্ধ । এই-রূপ ভাষা সৰ্বত্রই জোবেব সঙ্গে চলিতেছে, ইহাব সঙ্গে-সঙ্গে, এক বা একাধিক কথ্য বা মৌখিক ভাষা অথবা বোলীব (বা বুলীব) আধাবে গঠিত চলতি বা চলিত ভাষা, বা লঘু শৈলীব ভাষাও পাওয়া যায় । সাধারণতঃ দুইয়ের মধ্যে বিবোধ নাই । উচ্চারণ সম্বন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবাব সুবিধা বা তাগিদ বা গবজ নাই । কিন্তু ব্যাকবণেব রূপতত্ত্বে অনেক প্রভেদ দেখা যায় । এক সাধাবণ আধুনিক বানবীন যুগেব সাহিত্যিক আববী আছে, যে আববী প্রাচীন কোবান ও উচ্চকোটিব সাহিত্যেব ভাষা ঘেঁষিয়া চলৈ, একটু লেখাপড়া জানা মানুষ না হইলে যাহাব পূর্ণ বস সাধাবণ আববী-ভাষী গ্রহণ কবিতো পাবিবে না । এই ভাষা সংবাদ-পত্রে, পত্রিকায়, সাধাবণ-পাঠ্য উপস্থাসে ও কবিতায়, এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে ব্যবহৃত হয়,—পশ্চিম আফ্রিকাব মোবোক্কো হইতে পশ্চিম এশিয়াব ইবাক, এবং আবব-দেশ পর্য্যন্ত সৰ্বত্র । কিন্তু তাহা ছাড়া; মগরেব বা মোবোক্কো, অল্-জজাইব বা অল্জিয়াস, তুনিগ, লিবিয়া, মিসব, সিবিয়া, সুদান, ইস্রাএল, লেবানন্, নজ্দ্, যেমন্, অদন্ (এডেন), ইবাক্ প্রভৃতিব কথ্য ভাষাও আছে, সেগুলিব অল্পস্বল্প সাহিত্যিক প্রয়োগও হইয়া থাকে । কিন্তু এই সাহিত্যিক নব্য আববীকে আশ্রয় কবিয়া এখনও আবব-জাতিব ভাষাগত ঐক্য বজায় আছে । ইংবেজীব বিভিন্ন প্রকাৰেব কথ্য ভাষাব অন্ত নাই, সেগুলিব ব্যাকবণ আছে, সাহিত্যও আছে । দক্ষিণ-ইংলাণ্ডেব ভদ্র শিক্ষিত সমাজেব ভাষাই হইতেছে সৰ্বজন-স্বীকৃত Standard English,

কিন্তু স্কচ বা স্কট্‌স ইংবেজি, আইবিশ ইংবেজি, অস্ট্রেলীয় ইংবেজি, আমেরিকাব নানা প্রকারেব ইংবেজিও আছে। Standard ইংবেজিব সাহিত্যিক রূপে, আমবা নঞর্থক not শব্দ পুৰা রূপে পাই, কিন্তু ইহাব চলিত সংক্ষেপিত রূপ n't, কথ্য ভাষায় not কে.প্রায় অপ্রচলিত কবিতা দিয়াছে। মুখেব কথায় ভাষায় ইংবেজি সাহিত্যিক বইষে cannot, donot, have not প্রভৃতি স্থলে can't, don't, haven't যথেষ্ট পরিমাণে পাই বটে, কিন্তু ইংবেজিব সে-কেলে “সাধু” রূপ cannot, do not, have not প্রভৃতিকে, “চলিত” রূপ can't, don't, haven't একেবাবে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, প্রগতিশীল ইংবেজ-জাতিব ভাষাব ক্ষেত্রে ইহাব “সাধু” রূপ একেবাবে দূরীভূত কবিতা দিবাব ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। তেমনি ইংবেজি here is, it has, I am, he is, সাধু-ভাষাব পূর্ণ রূপ, চলিতেছে; চলিত-ভাষাব here's, it's, I'm, he's—এখানে ইংবেজি-ভাষাব একমাত্র রূপ বলিয়া এগুলিব পক্ষে জোব ওকালতি আবাস্ত হয় নাই। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যেব ভাষায় কতকগুলি অধুনা-অপ্রচলিত ক্রিয়া-রূপ দূর কবিতা দিয়া, মৌখিক বা “চলিত” ভাষাকেই একাধিপত্য দিবাব চেষ্টাও দেখিনা—যেমন ফরাসীব সামান্য অতীত je fus = ‘আমি হইলাম বা ছিলাম’ সাহিত্যেব ভাষায় পাই, কিন্তু পাবিসেব “চলিত”-ভাষায় ইহা লুপ্ত—ইহাব স্থলে পাই j'ai été; তদ্রূপ je fis = ‘আমি কবিলাম’, তৎস্থলে j'ai fait; je dis—‘আমি বলিলাম’—তৎস্থলে j'ai dit. পাবিসেব ভাষায় অপ্রযুক্ত je fus, je fis, je dis কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রতীসাল-ভাষীদেব দ্বাৰা লিখিত ও কথিত ফরাসীতে এখনও চলে—যেমন বাঙ্গলা সাধু-ভাষাব রূপ “জানিয়া, বুঝিয়া, কবিতা” প্রভৃতি ববিশাল জেলাব কোনও-কোনও স্থানে পূর্ণ প্রাচীন রূপে কথ্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান—যদিও অল্প (কলিকাতাব চলিত-ভাষায়) “জেনে, বুঝে, ক'বে”, (ঢাকাব ভাষায়) “জাইন্যা বা জীনা, বুঝা, কইবা বা ক'বো” প্রভৃতি।

বাঙ্গলা সাধু-ভাষা ধীবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা এখনকাব “পশ্চিম-বঙ্গ” ও “বাংলা-দেশ” নিবাসী দশ কোটিব উপব সমগ্র বঙ্গ-ভাষী জনগণেব মাতৃভাষা, বিভিন্ন কথ্য ভাষা, বেশ জোবেব সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও, সেগুলিকে এক সাধবণ ভাষাব গণ্ডীৰ মধ্যে সাধু-ভাষাব-স্থলে গাঁথিয়া বাখিয়াছে। এই যোগস্থত্রে ছিন্ন কবিতা দিলে, ভাষাব বাজ্যে ঐক্য-বোধ নষ্ট হইয়া যাইবে। বহু পূর্বে এই ভাবে ঢাকাব বাঙ্গলা ও কলিকাতাব বাঙ্গলাকে পৃথক্ কবিতা বাঙ্গলা-ভাষী জাতিব মৌলিক ঐক্য ধ্বংস কবিতা দিবাব চেষ্টা হইয়াছিল—লর্ড কার্জনাব আয়োজিত Partition of Bengal বা বঙ্গ-ভঙ্গেব দ্বাবায়।

বিগত ঊনবিংশ শতকেব প্রথম হইতেই স্বজ্যমান সাধু-ভাষা তাহাব আধুনিক রূপ গ্রহণ কবিল। বামমোহন বায়, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বৈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগব, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন,

মীব মশারুফ হোসেন, বিপিনচন্দ্র পাল—ইহঁরাই ছিলেন এই সাধু-ভাষাব স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা, এবং ইহঁরা মধ্যে এক অপূর্ব শক্তির আবাহন ইহঁরাই কবিলেন। কিন্তু মৌখিক বা চলিত ভাষাব, বিশেষতঃ বাজধানী কলিকাতাব শিক্ষিত জনেব ভাষাব প্রতি অবহেলা কেহই কবেন নাই। পদ্য-সাহিত্যে বিশেষ কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব নাম কবা যায়। লঘু, সাময়িক এবং অল্প-শিক্ষিত জনেব মধ্যে প্রচলিত লোকবঙ্গক কাহিনী-সাহিত্য ও নাটকে এই চলিত-ভাষাব একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। বিগত শতকেব ছয়েব দশকে, গুরু সাধু-ভাষায় মহাভাব-তেব অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতাব বিশুদ্ধ অবিস্মৃত চলিত-ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্যেব একখানি Classic বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিলেন—“হতোম পোঁচাব নকশা।” সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষাব মধ্যে ভাষাব মিলন বা ঐক্য স্থাপিত কবিত্তে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব দান অপবিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ-ও চলিত-ভাষাব অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ লেখক। ববীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে ছিলেন সব্যসাচী। পবিত্র বয়সে লেখা তাঁহাব “জীবন-স্মৃতি” বিশুদ্ধ সাধু-ভাষায়, কিন্তু তাঁহাব যৌবনেব বচনা ‘যুবোপ-প্রবাসী’ব পত্র’ চলিত-ভাষায়; এবং সাবা জীবন ধবিতা গড়ে ও পড়ে তিনি উভয়বিধ বাঙ্গলায় লিখিতা গিয়াছেন। বাঙ্গলাব বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী, গুরু-গভীব বিষয়েও কলিকাতাব চলিত-ভাষা ব্যবহারেব একজন প্রমুখ সংস্থাপক হইলেও, সাধু-ভাষাকে উপেক্ষা কবেন নাই, উচ্চ-কোটিব ভাব-গভীব রচনায় তাঁহাব ব্যবহার সমর্থন কবিতা গিয়াছেন।

এই দুই প্রকাবেব বাঙ্গলা পবম্পব-বিবোধী ইহা মনে কবিতা, কতকগুলি বঙ্গ-ভাষামুবাগী, আমাব মতে, আমাদেব প্রাণেব চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা বাঙ্গলাব ক্ষতি কবিবাব কাজে নামিয়াছেন। এই দুই প্রকাবেব বাঙ্গলাকে কি একেবাবে পৃথক্ কবা যায়? সাধু-ভাষাব রূপ বাদ দিয়া কি বাঙ্গলা লিখিত ও মৌখিক উভয়-বিধ সাহিত্য বচনা সম্ভবপব? সাধু-ভাষাব বিকল্পে এই বিদ্রোহ কেন? বিদ্যাসাগব ও বঙ্কিমেব বচনা হইতে সাধু-ভাষায় ব্যাকবণ-সম্মত রূপগুলিকে বর্জন কবিতা, সেগুলিব স্থলে অল্প রূপ বসাইয়া দিয়া, বাঙ্গলা-ভাষাব সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনীষাকে এইভাবে অপমান কবিবাব অধিকাব কোথা হইতে আসিল? সাধু-ভাষাব রূপ বিতাড়িত কবিলে, ববীন্দ্রনাথেব এই পংক্তিগুলিব সৌন্দর্য্য কোথায় থাকিবে?

“ভবা নদী ক্ষুব-ধাবা খব-পবশা—

কাটিতে কাটিতে ধান এল’ ববষা।”

“যুমেব দেশে ভাঙ্গিল ঘুগ, উঠিল কলস্বব।

গাছেব শাথে জাগিল পাখী, কুস্মে মধুকব।”

“সগর্বে জিজ্ঞাসা কবে, ‘কি লয়ে’ বিচাব?”

শুনিলে বলিতে পাবি কথা দুই-চাব,

ব্যাখ্যায় করিতে পাবি উলট-পালট।”

“বলো কোন্ পাব ভিড়িবে তোমাব সোনার তবী।”

“অসীম বোদন জগৎ প্লাবিয়া ছলিছে যেন।”

“তাব পবে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো ববি।”

“হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন, কথা না ব’লে।”

“কহিবে না কথা, দেখিতে পাবো না নীবব হাসি।”

“নিদ্ৰা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।”

“শিহরি’ শিহরি’ সর্ব শবীৰ কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।”

“পুবোহিত শুধু মস্ত পড়িল আশিস করিয়া দোহে।”

“আমি কহিলাম—‘সব দেখিলাম, ভোমাবে দেখিনি শুধু’।”

“অপরূপ তানে ব্যথা দিয়া প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।

বিজন বিপুল ভবনে বয়নী হাসিতে লাগিল হাসি।”

“অনায়াসে যে পেবেছে ছলনা সহিতে।”

সাধু-ভাষা হইতেছে প্রশস্ত বাজমার্গ। ইহাব বাক্যবীতি সবল, যুক্তিযুক্ত, বাঙ্গালীৰ চিন্তাধাবাব অম্লরূপ। ইহাতে কিছু লিখিলে, একটি পবিচ্ছন্ন মনন ও বিচাবশীলতাৰ সহায় সহজেই পাওয়া যায়। সাধু-ভাষা এবং কলিকাতাব চলিত-ভাষা ও বিভিন্ন অঞ্চলেব কথ্য-ভাষার পবম্পবেব সম্পর্ক হইতেছে, বাঙ্গলা লোকোক্তি-মত, “চাটাই-বোনা” সম্পর্ক। সাধু-ভাষা ও সাবা বঙ্গদেশেব নানা চলিত-ভাষা—বিশেষ কবিষা কলিকাতা অঞ্চলেব চলিত-ভাষা, এই দুইষেব টানা ও পড়িয়ান মিলিয়া বাঙ্গলাব ভাষাব অপূর্ব ধূপ-ছায়া বা ময়ূব-কণ্ঠী বঙ্গেব ক্ষৌৰ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে—যে বস্ত্রজাত পবিধেয ও উত্তবীষ দ্বাবা অভিনব গুচি-স্নিগ্ধ কচিব জ্যোতিতে বিশ্ব-সবস্বতী মহীষসী হইয়াছেন। একদিকে বিত্তাসাগবেব “সীতাৰ বনবাস”-এব গগ্ধ, বঙ্কিমেব “কপাল-কুণ্ডলা”-ব গগ্ধ, ববীন্দ্রনাথেব “চিত্রা” বা “উর্বশী” কবিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব পক্ষ হইতে প্রদত্ত, বামেন্দ্রসুন্দবেব কৃতি, অপরূপ সৌন্দৰ্য্য সূদীপ্ত ববীন্দ্র-প্রশস্তি, বঙ্কিমেব “ইন্দ্রিবা” ও “কমলাকান্তেব দপ্তব”-এব প্রাঞ্জল-ভাষা; অত্ৰদিকে বিবেকানন্দেব “পবিত্রাজক”-এব, অবনীন্দ্রনাথেব “বাজ-কাহিনী”-ব, দক্ষিণাবঙ্গন মিত্র মজুমদাবেব “ঠাকুবমাব ঝুলি”-ব, উমাপ্রসাদেব হিমালয-বর্ণনাব অনবত্ত কবিতাধর্মী ভাষা; সাধু ও চলিত-ভাষা নিৰ্বিণেষে বাঙ্গলা সাহিত্যেব, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যেব গৌবব-স্বরূপ বহু বহু বচনা আছে;—এগুলিব কোন্টিকে ত্যাগ কবিব? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু-বর্ষ-ব্যাপী ম্যাট্রিকুলেশন ও স্কুল-ফাইনাল, ইণ্টাবমিডিয়েট ও বী এ পবীক্ষায বাঙ্গলা-ভাষাব প্রধান পবীক্ষকেব কাজ কবিবাব সময়ে, বাঙ্গলাদেশেব গৌড় ও বাঢ়, ববেন্দ্র ও কামরূপ, বঙ্গ ও শ্রীহট্ট, ভাগীবথীব দুই তীরেব দেশ, সমতট বা ব-দ্বীপ, কুমিল্লা (পট্টিকেবা) ও চট্টল, ওদিক সূক্ষ বা মেদিনীপুব, এবং বাঙ্গলাব প্রত্যন্ত প্রদেশ—সাবা বাঙ্গলাব সমস্ত জেলাব ছাত্রদেব হাজাব হাজাব উত্তব-পত্রেব খুঁটিনাটি বিচাব কবিয়া দেখিষাছি যে, সাধু-ভাষাতে সহজ, সাবলীলভাবে, বিনা আযাসে সকলেই যেন লিখিতেছে—

এবং যেখানেই আধুনিক হইয়া কলিকাতার চলিত-ভাষায় উদ্ভব-বচনা কবিবাব চেষ্টা কবিতেন্বে, সেখানেই বিপদে পড়িতেছে,—এমনকি কলিকাতা ও ভাগীবথী-নদীৰ তীবৰ দেশেৰ ছেলেমেয়েবাও। একটা জিনিস দেখিয়া কৌতুক লাগে—অবশ্য তাহাব কাবণও মনে হয় খুঁজিয়া পাইতেছি,—খাঁহাবা এখন বিশেষ-ভাবে কলিকাতাব চলিত-ভাষায় আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাধু-ভাষাকে বৰ্জন কবিতেন্বে চাহিতেছেন, তাঁহাদেব অধিকাংশই পূৰ্ব-বঙ্গেব মানুষ। কলিকাতাব ভাষায় লিখিয়া তাঁহাবা আনন্দ পান, এবং তাঁহাবা বোধ হয় চাহেন, ভাষা-বিষয়ে সৰ্বত্র বাঙ্গালাদেশ একটা Monolithic State (“একশৈল বা এক-পাথৰিয়া প্রদেশ”) হইয়া যাউক—একটিমাত্র কথ্য ও তাহাব আধাবে স্থাপিত লিখিত ভাষাই সৰ্বজন-গৃহীত হউক। ইহাই যেন তাঁহাদেব কাম্য। কিন্তু যেখানে ঠি বা ঠি ভাগ বঙ্গ-ভাষী সহজ-ভাবে যবে কলিকাতাব বাঙ্গলা বলে না, অস্তিত্ব উপভাষা বলে যেগুলিব মধ্যে কতকগুলি আবাব উচ্চাবণে, ব্যাকবণে, বাক্তব্জীতে, কণ্ঠেব স্ববে কলিকাতাব ভাষা হইতে নানা ভাবে স্বতন্ত্ৰ, তাহাদেব পক্ষে এই-ভাবে অস্ত একটা কথ্য ভাষাকে একেবাবে নিজেব কবিয়া লওয়া যে সম্ভবপব নহে, ইহা তাঁহাবা বুঝেন না। পূৰ্ব বঙ্গে খাঁহাদেব জন্ম, বাল্যশিক্ষা ও আংশিক ভাবে জীবনেব কর্মক্ষেত্ৰ, তাঁহাদেব মধ্যে কেহ-বেহ চলিত-ভাষাব বাঙ্গলা বলেন লেখেন। কিন্তু সব সময়ে এই চলিত-ভাষায় তাঁহাদেব প্রবেশ, পূৰ্ণ ৰূপে হইয়া উঠে না, ইহা বলিলে ও লিখিলে-ও, উচ্চাবণে, কথা বলাব চঙ্গে, ধাতু-ৰূপ এবং অব্যয় শব্দাদিব প্রযোগে, বাক্য-বীতিতে, শব্দাবলীতে, কলিকাতাব ভাষায় অজ্ঞাত এমন সমস্ত প্রযোগ কবিয়া থাকেন, যাহা কলিকাতাব মানুষেব কানে বাজে, পীড়া দেয়, কচিং হায়েব উদ্বেক-ও কবে। পবলোকগত সজনীকান্ত দাস তাঁহাব “শনিবাবেব চিঠি”তে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদেব অনেকেব কাচি এবং নীতিব কঠোব সমালোচনায কখনও-কখনও এইৰূপ ভ্রান্ত প্রযোগ উদ্ধাব কবিয়া দিয়াছেন। কেন এই বিডম্বনা সহ্য? অথচ সকলেব সম্পত্তি সৰ্বজন-বোধ্য সাধু-ভাষা ব্যবহাবে, কোনও বন্ধাট হয় না। কলিকাতাব ভাষায় “পূজা, তুলা, মূলা, বুড়া, খুড়া” প্রভৃতি সাধু-ভাষাব শব্দে—যে সব-শব্দ চলিত-ভাষাব এলাকাব বাহিৰে সাবা বাঙ্গালা-দেশে প্রচলিত —সেগুলিব ৰূপ হয় পূজো, তুলো, মূলো, বুডো, খুডো। ইংবেজী ভাষাতে পুংলিঙ্গে he-his-him হইল, তো স্ত্রীলিঙ্গে “she shes shim হইবে না কেন”—এই নীতিতে, “পোকা” অৰ্থে কলিকাতাব চলিত-ভাষাব ৰূপ “পুকো” হইবে নিশ্চয়, এই বিচাবেব জনৈক লেখক “পোকা” স্থলে “পুকো” লিখিলেন। কৈফিয়ৎ চাওয়ায় জানা গেল, তাঁহাব নিজেব গৃহেব ভাষায় তিনি “পুকা” বলেন, “পুকা” সাধু-ভাষাব শব্দ স্থিব কবিয়া, তাহাব বিকাবে “পুকো” কলিকাতাব বাঙ্গলাব শব্দ বলিয়া অনুমান কবিয়া লইলেন। কলিকাতাব চলিত ভাষায়, বাঙ্গলাব “স্ববসঙ্গতি”ব নিয়ম অনুসাবে, “পূজা, তুলা খুড়া” প্রভৃতি “পূজো, তুলো, খুডো” হইয়া যায়। কিন্তু “পোকা, বোকা, খোকা, ঘোড়া, বোড়া-সাপ” প্রভৃতি

“পুঁকো, বুঁকো, খুঁকো, ঘুঁড়ো, বুঁড়ো” হয় না। সহজাত অধিকাবে এই রূপগুলি না আসিলে, অভিনিবেশেব সঙ্গে শিক্ষা কবিতাও সেগুলিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত কবা যায়। কিন্তু আমবা তো আব শ্রম কবিতা চাহি না, পবিশ্রম না কবিতাই সবকিছু অর্জন কবিবাব অভ্যাস, জীবনেব আব সব ব্যাপাবে যেমন, শিক্ষাব ব্যাপাবেও আমবা আমাদের মজ্জাগত কবিতা লইয়াছি। এ বিষয়ে আব বেশী কথা বাড়াইবাব আবশ্যকতা নাই। আমাব বিনীত নিবেদন, সাধু-ভাষা ও চলতি-ভাষা উভয় মিলিয়া একই ভাষা। এই দুইটির মধ্যে একটা গভীর বা ছবপনেষ পার্থক্যেব কল্পনা কবিলে, বাঙ্গলা ভাষাব ও সাহিত্যেব চর্চা এবং উন্নতি-সাধন যখন আমাদের সকলেবই আকাঙ্ক্ষিত, তখন বাঙ্গলা-ভাষাব শিক্ষাব ও পঠন পাঠনেব ক্ষেত্রে অতি-আবশ্যক এই সহজ পবিপাটী বা নিয়ম পালনে বাধা আসিয়া যায়। সহজকে জটিল বলিয়া, ছাত্রদেব বিভ্রান্ত কবিতা দেওয়া কি উচিত হইবে? এ কথা কেহ না মনে কবেন, যে আমি চলিত ভাষায় লেখাব বিপক্ষে। আবশ্যক হইলে, নিজে আমি চলিত-ভাষায় প্রচুর পবিমাণে লিখিয়া থাকি, আবাব সাধু-ভাষাতেও লিখি। বাঙ্গলা-ভাষাব এই জুড়ি হাঁকাইবাব শক্তি সকলেবই থাকা উচিত বলিয়া মনে কবি।

(৩) বাঙ্গলা ব্যাকবণ ও সংস্কৃত ব্যাকবণ।

আমাব কাছে বাঙ্গলা-ভাষাব বহু শিক্ষক বিভ্রান্তিতে পড়িয়া, প্রায়ই বাঙ্গলা-ভাষাব পণ্ডিতগণের অনুমোদিত প্রচলিত ব্যাকবণে সংস্কৃত ব্যাকবণেব বীতি-সম্মত “শুদ্ধ” প্রয়োগ কেন, বাঙ্গলা ভাষায় মানা হয় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন কবিতা পাঠান। বাঙ্গলাব সন্ধি ও সংস্কৃতেব সন্ধি—দুইটি কি পৃথক্ বস্তু? এ দুইটির স্ব-স্ব প্রকৃতি কি? বাঙ্গলা শব্দরূপে বিভক্তি কয়টি, এবং প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি-কল্পনা বাঙ্গলাব পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য কিনা? বাঙ্গলা ক্রিয়াব tense বা কালরূপেব শ্রেণী-বিভাগ ও নামকবণ, বাঙ্গলায় বিশেষণেব তাব-তম্য, বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদ, বাঙ্গলাব নিজস্ব কতকগুলি জিনিস, সংস্কৃত ব্যাকবণে যেগুলিব নামগন্ধও নাই—যেমন অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্ববসঙ্গতি, প্রতিধ্বনি শব্দ, সহায়ক-ক্রিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি ভাল কবিতা বুঝিবাব ও শিখাইবাব কথা কেহও চিন্তা কবিতা-দেখে না—ফলে জিজ্ঞাসু শিক্ষক বিপদে পড়েন, ছাত্রদেবও বিপদে ফেলেন। আমার ষাট বৎসবেব চিন্তা ও বিচাবেব ফল, আমি যথা-জ্ঞান আমাব লিখিত পুস্তকে পবিবেশন কবিতা আসিয়াছি, এবং বাঙ্গলা-ভাষাব নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবাবে সংস্কৃতের প্রকৃতি নহে, তাহা হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্মৃতিব সহিত দেখাইয়া-ছেন, তাঁহাদেব পদাঙ্ক অনুসরণ কবিতা আমি আমাব পুস্তকে সর্বত্র প্রচাব কবিবাব চেষ্টা কবিতাছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সভাপতিব গুরুত্বপূর্ণ পদেব অধিকাবী হইয়া, বাঙ্গলা-দেশেব শিক্ষক ও পণ্ডিতদেব কাছে আমি সনির্বন্ধ অনুবোধ কবিতেছি, তাঁহাবা যেন গতানুগতিকতা এবং চিবপোষিত নানা ধাবণা, যেগুলি যুক্তি-সহ এবং ইতিহাস-সম্মত নহে সেগুলি পবিহাব কবিতা, বাঙ্গলা ব্যাকবণেব চর্চায় নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিচাব-শৈলী প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কবেন।

(৪) বাঙ্গলা-ভাষাব শব্দের নিকৃতি ।

অষ্টাদশ শতকেব কতকগুলি ইউরোপীয় (পোতুগীস) পাদ্রিব ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, সংস্কৃত বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষা, লাতীনেবই বিকাব । এই বোধ অনুসাবে, পাদ্রি মানোএল-দা, আসম্পদাঁও (১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) স্থির কবিয়াছিলেন—বাঙ্গলা “কত” শব্দ লাতীন quanto-ব বিকাব-জাত । বাঙ্গলা-ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মোটামুটি ইহাই হইতেছে এক কথায়, বাঙ্গলা-ভাষাব উৎপত্তিব ইতিহাস । কিন্তু বাঙ্গলা সোভা সংস্কৃত ভাষাব পবিবর্তনে তাহাব নিজরূপ পাইয়াছে, একথাকে একটু বাড়াইয়া বলিতে হয়—সংস্কৃত পড়াব পবিবর্তনে প্রাকৃত ভাষা, এবং সেই প্রাকৃত ভাষাব পুনঃপবিবর্তনে বাঙ্গলা প্রভৃতি “ভাষা” অর্থাৎ আধুনিক আর্য্য ভাষা । বাঙ্গলা ব্যাকবণেব চর্চাব এই শব্দ নিকৃতি ও আসে, কিন্তু তাহা ব্যাকবণ-পর্য্যাবেব অন্তর্নিহিত নহে, তাহা বাহিবেব বস্তু । অনেক সময়ে বাঙ্গলাব শিক্ষকেবা ব্যাপাবটা তলাইয়া দেখেন না ; সেই ক্ষুদ্র ব্যাকবণেব মধ্যে এইরূপ প্রেম্বেব অবতারণা কবেন—“আনাড়ী, ভাল, বেহালা” শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখ ; “সেতার, আমবা” শব্দের সমাস (একখানি ব্যাকবণ গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে “আমবা” হইতেছে একশেষ-দ্বন্দ্ব—যেহেতু “আমি, তুমি, সে, অন্মবা” প্রভৃতিব দ্বন্দ্ব-সমাস কোঠায় দাঁড়াইয়াছে “আমবা” ।)

এই-সব কাবণে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যুৎপত্তি-নির্দেশক সম্পূর্ণ বাঙ্গলা অভিধানেব বিশেষ আবশ্যকতা আছে । - বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ এ বিষয়ে কিছুটা কাজ কবিয়াছেন । যোগেশচন্দ্র বাব বিদ্যানিধিব বাঙ্গলা-ভাষাব ব্যাকবণ ও বাঙ্গলা শব্দকোষ এ বিষয়ে পবিষদেব প্রথম পদক্ষেপ । পবে প্রয়াগেব ইণ্ডিয়ান-প্রেসেব জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং তদনন্তর বিশ্বভাবতীবি হবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-ও তাঁহাদেব দুই খানি বড়-বড় অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ উভয়ই নির্দেশেব চেষ্টা কবেন । আমাব বাঙ্গলা ভাষাব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বড় বইয়ে (Origin and Development of the Bengali Language-এ) আমি যথাসক্তি চেষ্টা কবিয়াছি । এ বিষয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক স্কুমাৰ সেন একটি বহু মূল্যবান্ গবেষণামূলক কাজ সম্পূর্ণ কবিয়া, দুই খণ্ডে প্রকাশ কবিয়াছেন—চর্যাপদেব যুগ হইতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগেব বাঙ্গলা শব্দকোষ, বোমান অক্ষবে ছাপাইয়া তাহা বাহিব কবিয়াছেন—ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ কবিয়াছেন ও সর্বত্র সাহিত্য-প্রয়োগ উদ্ধাব কবিয়াছেন । উভয় দিক্ হইতেই এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা-ভাষাব চর্চায় অমূল্য । বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং বাঙ্গলা ব্যাকবণেব সত্যকাব প্রকৃতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা-শিক্ষক ও লেখকদেব, একটু বেশী কবিয়া অবহিত হওয়া সর্বতোভাবে প্রার্থনীয় ।

(৫) বাঙ্গলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ।

এইটি পবিষদেব অত্যন্ত প্রধান কার্য্য-রূপে পবিগণিত হইয়া আছে । প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যেব classics অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বসোত্তীর্ণ গ্রন্থ অথবা ঐতিহাসিক মানেব, গ্রন্থ পবিষদ্ সুরোগ পাইলেই মুদ্রিত কবিয়া থাকেন । বাঙ্গলা-ভাষাব ইতিহাসে কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ,

যথা প্রাচীন বাঙ্গলা “চর্যাপদ”, আধুনিক আৰ্য্যভাষাব চৰ্চায় যাহাব মূল্য অপবিসীম, এবং মধ্যযুগেব বাঙ্গলাব সৰ্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”—যথাক্রমে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বসন্তবঞ্জন বায়েব সম্পাদনায় পবিষদ্-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ৮০ বৎসর ব্যাপী পবিষদেব কাৰ্য্যসূচী অর্গোববেব নহে। কিছু কাল হইল, পবিষদ্ এ বিষয়ে নূতন পদক্ষেপ কবিষাছেন—বাঙ্গলাব প্রধান-প্রধান লেখকদেব সম্পূর্ণ বচনাবলীর প্রকাশন। কতকগুলি বাঙ্গলা সংবাদ-পত্ৰকে এই বিষয়ে পথিকৃৎ বলা যায়—যেমন “বঙ্গমতী”, “হিতবাদী” ও “বঙ্গবাসী”। পবিষদ্ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যেব স্রষ্টা যুগন্ধব লেখকদেব গ্রন্থাবলী, যত্বেব সঙ্গে ভালভাবে সম্পাদিত কবিয়া বাহিব কবিয়া দিতেছেন। ইহাব দ্বাবা যত্ননাথ সবকাব, যোগেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতি-বিদগণেব লিখিত ভূমিকাদ্বাবা অলঙ্কৃত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ লেখকগণেব সমগ্র রচনা বাহিব হইয়া বঙ্গভাষাব সাহিত্যেব মৰ্য্যাদাব সংবৰ্দ্ধন কবিতোছে, তদ্রূপ সাধাবণ পাঠক-ও স্নহর-ভাবে স্পৃগিতেব হাতে প্রস্তুত লেখমালা পাইয়া তাহা হইতে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আনন্দ ও লাভ প্রাপ্ত হইতে পাবিতেছেন। এ বিষয়ে অস্ত্রান্ত বহু প্রকাশক আবও অধিক পবিমাণে বাঙ্গলাব প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকেব বচনাবলী প্রকাশ কবিয়া, এখন বাঙ্গলা সাহিত্যেব গৌবব বৃদ্ধি কবিতোছেন।

ইহা আনন্দেব কথা। কিন্তু কতকগুলি বাহিবেব প্রকাশক, কেবল নিজ-নিজ আর্থিক লাভেব কথা ভাবিয়া, অস্ত্রায় ও অহুচিত ভাবে পবিষদেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিয়া, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানেব স্বল্প অৰ্থাগমেব পথও রুদ্ধ কবিয়া দিতেছেন। তাঁহাবা, পবিষদেব দ্বাবা বিশেষ পবিশ্রমেব সহিত প্রকাশিত কতকগুলি লেখকেব বচনাবলীব প্রামাণিক সংস্কৰণ, যে-সব রচনাব কোনও কপিবাইট আব নাই, পবিষদ্-ভবনে আসিয়া তাহাব পূর্ণ-ভাবে নকল কবাইয়া লইয়া প্রকাশিত কবিতোছেন,—এই নকলে পবিষদেব সংস্কৰণেব ছাপাব ভুল পর্য্যন্ত সংশোধন কবিয়া দেখিবাব অবসব তাঁহাবা পান না। এবং—

“আমাব বঁধুয়া আন বাজী যায়

আমাবি আঙ্গিনা দিয়া”—

পবিষদেব বহুইয়েব এই নকলী সংস্কৰণ, পবিষদেব সংস্কৰণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয় কবিয়া পবিষদেব ক্ষতিই কবিতোছেন—এমন কি, পবিষদেব বিজ্ঞাপনী-ফলকে তাঁহাদেব বিজ্ঞাপনও লাগাইয়া দিয়া যাইতেছেন যে তাঁহাদেব এই প্রকাশন, পবিষদেব প্রকাশন অপেক্ষা অল্প মূল্যে পবিষদেব সদস্তবা আসিয়া ক্রয় কৰুন।

এই রূপ ব্যাপাব যে হয়, দেশবাসী জানিয়া বাধুন। আব কিছু বলা নিশ্চয়োজন।

(৬) আধুনিক বাঙ্গলা অনুবাদ সাহিত্য।

বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা হইতে সেই সব ভাষাব শ্রেষ্ঠ বস-বচনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক বচনার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ কবিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যেব প্রসাৰণ কবা

পৰিষদেৰ অৱশ্যে উদ্দেশ্য। এ কাৰ্য্যে পৰিষদ কিছু-কিছু হাত দিয়াছেন, কিন্তু বৈশী অগ্ৰসৰ হইতে পাবেন নাই। বিনয়কুমাৰ সবকাৰেব গিজোৰ ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ ইতিহাস বইখানিৰ বাঙ্গলা অনুবাদ প্ৰকাশেৰ চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্গদেশে স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া কোনও-কোনও পণ্ডিত এবং প্ৰকাশক এইৰূপ কতকগুলি মূল্যবান্ গ্ৰন্থ বাঙ্গলা-ভাষাকে অৰ্পণ কৰিয়াছেন। পঞ্চানন তৰ্কবত্বেৰ পৰিচালনাৰ “বঙ্গবাসী” মুদ্ৰণালয় হইতে বঙ্গাক্ষৰে সমগ্ৰ বামাগণেৰ সংস্কৃত সংস্কৰণ (বাঙ্গলা অনুবাদেৰ সহিত), বঙ্গাক্ষৰে সমগ্ৰ মহাভাৰত, তদ্ৰূপ বাঙ্গলা হৰফে আঠাবোখানি পুৰাণ বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত অসংখ্য বহু সংস্কৃত গ্ৰন্থেৰ প্ৰকাশ, বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিৰ একটী লক্ষণীয় গোবৰ-ভূমি। সম্প্ৰতি খণ্ডদহ বলবাম মন্দিৰ হইতে স্বামী যতীন্দ্ৰ বাগানুজ দাস যে শ্ৰী-সম্প্ৰদায়েৰ সংস্কৃত ও তমিল গ্ৰন্থাবলীৰ অনুবাদেৰ বাঙ্গলা অক্ষৰে প্ৰকাশন-কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ ও বাঙ্গালী জাতিৰ পক্ষে গোবৰ-বোধেৰ সহিত সম্পূৰ্ণ অনুমোদন-যোগ্য। বিশেষতঃ তমিল সাহিত্যেৰ “আড্‌বাব” বা প্ৰাচীন বৈষ্ণৱ ভক্তদেৰ পদাবলীৰ সংগ্ৰহ (১১শ খ্ৰীষ্টাব্দে সংকলিত) “নান্-আযিব-প্ৰবন্ধম্”-এব(অৰ্থাৎ “চাবি-সহস্ৰ-গাথা”ব) মূল তমিলপদ, প্ৰত্যেক তমিল শব্দেৰ বাঙ্গলা আক্ষৰিক অনুবাদ, বাঙ্গলা অনুবাদ ও বাঙ্গলা টীকা যেভাবে স্বামী যতীন্দ্ৰ বাগানুজ দাস প্ৰকাশিত কৰিয়াছেন তাহা বিশেষ প্ৰশংসাহঁ। সম্প্ৰতি দিল্লীৰ “সাহিত্য একাডেমি”-ও ভাৰতেৰ নানা আধুনিক ভাষায় বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদেৰ ভাব লইয়াছেন, তাহাৰ সুবিধা বাঙ্গলা-ভাষাও পাইতেছে—প্ৰায় ২৫ খানি অনুবাদ বাঙ্গলা-ভাষায় এ যাবৎ বাহিৰ হইয়াছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই এই-সৰ অনুবাদ মূল ভাষা হইতে নহে, ইংৰেজি অথবা হিন্দী অনুবাদেৰ অনুবাদ। আমবা চাহি যে, যথাসম্ভব মূল ভাষা বাহাৰা ভাল কৰিয়া জানেন, তাহাদেৰ-অনুবাদ বাঙ্গলায় প্ৰকাশিত হউ। যেমন গিৰিশচন্দ্ৰ সেন-কৃত প্ৰাচীন মাৰাঠী “জ্ঞানেশ্বৰী” গ্ৰন্থেৰ অনুবাদ কিংবা তকৰি শিবশঙ্কৰ পিল্লাৰ বিখ্যাত মালয়ালী উপন্যাস “চেম্-মীন”-এব অনুবাদ। অভিধান প্ৰণয়ন বাঙ্গলাৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ ও গ্ৰন্থাবলীৰ মুদ্ৰণ ও পুনৰ্মুদ্ৰণেৰ পৰে, এই কাৰ্য্য গ্ৰহণ কৰিতে পাবা যায়—ইহা প্ৰাথমিক কৰ্তব্যেৰ মধ্যে অৱশ্যে বিবেচিত হইলেও, যোগ্য কৰ্মীৰ অভাৱ-ই এ কাৰ্য্যে অগ্ৰসৰ হইবাৰ প্ৰধান অন্তৰায়।

কতকগুলি অত্যাবশ্যক ব্যাপাৰ আপনাদেৰ কাছে উপস্থিত কৰিলাম। আমাদেৰ মাতৃভাষা যে সময়ে মাগধী অৰ্পণশ্ৰেণীৰ নবতৰ প্ৰকাশ ৰূপে বাঙ্গলা ভাষা, গোড়-বঙ্গেৰ ভাষা, গোড়ীয়া-ভাষা, বঙ্গাল-ভাষা, ৰূপে প্ৰকট হইতেছে, তখন হইতেই এই ভাষাৰ সম্বন্ধে যে শ্ৰদ্ধা ও প্ৰীতি আমাদেৰ পূৰ্ব-পুৰুষগণ প্ৰকাশ কৰিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় এই স্বৰ্জ্যমান বা নবশ্ৰষ্ট বঙ্গ-ভাষাৰ যে প্ৰশস্তি কৰিয়া গিয়াছেন, তাহা একবাৰ পুনৰায় পাঠ কৰিয়া, আমাদেৰ মাতৃভাষাৰ অশৰীৰী আত্মাৰ প্ৰতি, বামমোহন অক্ষয়কুমাৰ বিদ্যাসাগৰ বঙ্কিম বিবেকানন্দ ও ববীন্দ্ৰনাথেৰ অপূৰ্ব-সুন্দৰ ভাষাৰ প্ৰতি প্ৰণাম জানাইয়া, প্ৰসঙ্গ শেষ কৰিতেছি। গোড়-বঙ্গেৰ শেষ হিন্দু বাজা লক্ষণ-সেন দেবেৰ সভায় বটুদাস-পুত্ৰ শ্ৰীধৰ-

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ

সাধারণ বিভাগ

ব্যয়

আয়

প্রাবৃত্তিক মজুত (১.১.১৩৭৯)

মজুত গ্রন্থ	৫৬,৯১৫ ০২
বেতন ও ভাতা	২৪,১৮৪ ৭৪
ডাক খবচ	৯৯৭ ০০
আলৌ ও পাখা	১,৭১০ ৮৪
গাড়ি ও কুলি	২২৭ ১৮
দপ্তর সবঞ্জাম	৭৫৯ ৯৩
বিবিধ ব্যয়	১,০৮১ ৬৮
বিবিধ মুদ্রণ	৫৭৩ ০০
পত্রিকা মুদ্রণ	২,৭৯৬ ৩৬
গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ	৩,২১২ ১৩
ফটো কপি প্রস্তুত খবচ	২০০ ২৫
পুস্তকালয় পুস্তক বাঁধাই	১,৪১৯ ৫০
বিবিধ অধিবেশনের খবচ	১৭৯ ৬০
গ্রন্থ তালিকা সংকলন	৭৪৫ ৮৬
চাঁদা আদায় খবচ	৩৬০ ০৫
প্র.ফা. তহবিলে কার্যালয়েব দান	৭১৫ ০০
মন্দির সংরক্ষণ ব্যয়	২১১ ৫৫
চিত্রশালা খবচ	৪৬১ ৯৯
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যয়	১৪ ৭৪
পুস্তকাদি প্রেবণ খবচ	৪৪ ৪০
স্বাবক গ্রন্থ মুদ্রণ	৪৫ ০০
বিশেষ পাবিশ্রমিক	৭২৮ ০০
ব্যাস্ক চার্জ	৩ ৬০
বিজ্ঞাপনের ব্যয়	২০২ ৫০
প্রতিষ্ঠা উৎসবেব ব্যয়	৬৫ ৫৯
আসবাব মেবামত	১ ২৫
নাজাই খাতে অনাদায়ী চাঁদা	৫,২২৬ ০০

ক্ষয়ক্ষতি:

গৃহ	১,৮৫৩ ৬৬
আসবাব	৪৮ ৮২
পুস্তকালয়	১৭২ ২৫
প্রতিমূর্তি ও	}
তৈলচিত্র	
চিত্রশালা	৫৪ ৫৮
পুথিশালা	৯৪ ৮৫
পুথিশালা	১১১ ১০
চিত্রশালাব গৃহ	৫৮২ ২৬
	২,৯১৭ ৫২

আয়াধিক্য:

১৭৬ ৬১

১,০৬,১৭৬ ৮৯

চাঁদা:

বর্তমান বর্ষেব আদায়	৭,১৬৩ ০০
যোগ ১৩৭৮-এ প্রাপ্ত	
অগ্রিম	৩৬৩ ০০
যোগ ১৩৭৯ বাকী	
চাঁদা	১৩,৫১৩ ০০
	২১,০৩৯ ০০
বাদ অগ্রিম (১৩৮০)	২৬১ ০০
২০,৭৭৮ ০০	
প্রবেশিকা	২৫২ ০০
আজীবন সভ্য চাঁদা	২৫০ ০০
গ্রন্থ বিক্রয়	৫,৯৭৮ ৬৮
পত্রিকা বিক্রয়	৪৪৭ ৫০
ফটো কপি প্রস্তুত আদায়	২৯৫ ০০
এককালীন দান	২৬৫ ০০
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান:	
কর্মচাবী নিয়োগ	
খাতে	৯,৮০৯ ০০
পুস্তক প্রকাশ খাতে	১,২০০ ০০
পত্রিকা প্রকাশ খাতে	৪,০০০ ০০
পৌনঃ পুনিক অনুদান	
১৩৭৮ ঘটতি	
জন্ম	১১,০০০ ০০
২৬,০০৯ ০০	
কেন্দ্রীয় সরকারের দান:	
পত্রিকা মুদ্রণ খাতে	৬৭৫ ০০
পুস্তকালয় ক্ষতিপূরণ আদায়	৩৩ ০০
স্বদ	১৮ ০০
বিবিধ আয়	৮২ ৭০
পুস্তক প্রেবণ খবচ আদায়	২ ৫০
কার্য পরিচালনার আয়:	
বাড়িগ্রাম	৫২ ০৭
লালগোলা	৫১ ৬০
৫৭২ ১৭	
বর্ষশেষে মজুত গ্রন্থ (৩০.১২.৭৯)	৫০,৬৫৬ ৩৪

১,০৬,১৭৬ ৮৯

বঙ্গীয় সাহিত্য

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে ৩০শে চৈত্র
সাধারণ

দায় ও দেনা

মূলধনঃ

গত উদ্বর্তপত্র হইতে

৩,৩৯,৫২৩.৬৩

যোগ আযাধিক্য আয়-ব্যয় মূলে

১৭৬.৬১

৩,৩৯,৭০০.২৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দানঃ

গত উদ্বর্তপত্র হইতে

গচ্ছিত তহবিলের কর্তৃক পবিশোধ খাতে

২৫,০০০.০০

দান (পুস্তক)ঃ

বর্তমান বর্ষে প্রাপ্ত

৪,২৪০.২০

গচ্ছিত তহবিলগুলির নিকট

সাধারণ তহবিলের দেনাঃ

ঝাড়গ্রাম তহবিলের নিকট

২৪,৫৫০.৯৮

লালগোলা তহবিলের নিকট

৯,৯৪১.৫২

বিবিধ তহবিলের নিকট

১৯,৫৯৩.৮১

৫৪,০৮৬.৩১

বিবিধ আদানত (দেনা)

অগ্রিম চাঁদা

৪,৪৯০.৩৪

কর্মচারী জামিন

২৬১.০০

১৫০.০০

শ্রীশবদিন্দু বসু

শ্রীমদনমোহন কুমার

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিসাববক্ষক

সম্পাদক

সভাপতি

হিসাব-পরীক্ষকদ্বয়ের মন্তব্যঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে চৈত্র তাবিখেব উদ্বর্তপত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট আয়-ব্যয়েব হিসাবাদি আমবা যথাযথ ভাবে পবীক্ষা কবিয়াছি। আমাদেব মতে উক্ত উদ্বর্তপত্র ও আয়-ব্যয়েব হিসাব নিভুলভাবে প্রস্তুত কবা হইয়াছে। পবিষৎ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অমুযাযী পবিষদের সমুদয় আর্থিক অবস্থা উদ্বর্তপত্রে সঠিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমলয়কুমার দেব

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

বি.এস.সি., জি.ডি.এ.

বি.এস.সি., এফ.সি.এ.

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

৪,২৭,৯২৮.০৯

পরিষৎ

তাঁবিখের উদ্বর্তপত্র

তহবিল

সম্পত্তি ও পাওনা

জমি:		৫৩,১৮৭'৫০
গৃহ: (পবিশৎ ভবন ও বমেশ ভবন)		
গত উদ্বর্তপত্র হইতে	১,৮৫,৩৬৫'৯২	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	১,৮৫৩ ৬৬	১,৮৩,৫১২'২৬
চিত্রশালা গৃহ: গত উদ্বর্তপত্র হইতে	৫৮,২২৫'৭৭	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	৫৮২'২৬	৫৭,৬৪৩'৫১
আসবাব: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	৪,৮৮২'২২	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	৪৮'৮২	
	৪,৮৩৩'৪০	
যোগ বর্তমান বর্ষে ক্রীত	১৫০'০০	৪,৯৮৩'৪০
পুস্তকালয়: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	১৭,২২৫'০০	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	১৭২'২৫	
	১৭,০৫২'৭৫	
যোগ বর্তমান বর্ষে প্রাপ্ত	৪,২৪০'২০	
যোগ ,, ,, খবিদ	৪৫৭'০০	২১,৭৪৯'৯৫
পুথিশালা: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	১১,১০৯'৭৮	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	১১১ ১০	১০,৯৯৮'৬৮
প্রতিমূর্তি ও তৈলচিত্র: গত উদ্বর্তপত্র হইতে	৫,৪৫৮'৪৩	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	৫৪'৫৮	৫,৪০৩'৮৫
চিত্রশালা: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	৯,৪৮৫ ০৫	
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%)	৯৪'৮৫	৯,৩৯০'২০
প্রফুল্লচন্দ্র সংগ্রহ: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে		২,২৮২'০০
রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে		২৯০'০০
বিবিধ পাওনা:		
কলি: ইলেকট্রিক সাপ্লাই	১০০'০০	
বাকি চাঁদা	১৩,৫১৩'০০	
বিবিধ অগ্রিম (পাওনা)	১৭৩'৪৫	
অগ্রিম বেতন (বিশেষ)	৮২১'০০	১৪,৬০৭'৪৫
গ্রন্থাগার উপকরণ		১,২৯৭'৭১
কোম্পানির কাগজ		১০০'০০
মজুত গ্রন্থ (৩০.১২.৭৯)		৫০,৬৫৬ ৬৪
ব্যাঙ্কে মজুত ,,	১১,৬৮৫'১৫	
নগদ ,,	১৪০'০৯	১১,৮২৫'২৪
		৪,২৭,৯২৮'০৯

বঙ্গীয় সাহিত্য

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে ৩০শে চৈত্র
বিবিধ গচ্ছিত

দায় ও দেনা

সাধাবণ তহবিলের জের—		৪,২৭,৯২৮'০৯
মূলধন :		
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	১,৫২,৩৪৪'৯৯	
যোগ বামকমল সিংহ স্থিতি তহবিলে দান	২৫,০০০'০০	
	১,৭৭,৩৪৪'৯৯	
বাদ আয়-ব্যয় মূলে	৭৯৫'২৭	১,৭৬,৫৪৯'৭২
হাওলাত :		
ঝাড়গ্রাম হইতে লালগোলায়	৩৪৫'৩৩	
লালগোলা হইতে বিবিধে	৩৯৩'৬২	৭৩৮'৯৫
বিবিধ আমানত (দেনা) :		
ঝাড়গ্রাম তহবিল		২,১২২'৮৬
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল :		
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	৮,৮৪৫'৭৫	
যোগ কর্মচারী টানা	৭১৫'০০	
„ কার্যালয়ের দান	৭১৫'০০	
„ ক্ষুদ্র	১,৫৩৬'৪৫	
„ ধাব আদায়	১,৩৬৭'০০	
„ সাধাবণ হইতে জমা	১০,১৮৩'৯৭	
	২৩,৮৬৩'১৭	
বাদ সাধাবণে জমা	২,৬১৮'৫০	
	২০,৭৪৪'৬৭	
„ ধাব প্রদান	১,৩০৩'৫০	১৯,৪৪১'১৭
পুস্তকালয় আমানত :		
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে	৪,৯৩১'২১	
যোগ ক্ষুদ্র	১৮৯'০০	
„ বর্তমান বর্ষের আমানত	২,১৩০'৫০	
„ সাধাবণে জমা	২৭১'০০	
	৭,৫২১'৭১	
বাদ ক্ষুদ্র	১৮৯'০০	
	৭,৩৩২'৭১	
„ সাধাবণে জমা	১,৬৬২'০০	
	৫,৬৭০'৭১	
„ আমানত ফেবত	৭৩৯'৫০	
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল :		৪,৯৩১'২১
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে		২৯৭'৮৫
পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল :		
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে		১৩১'৩৯
		৬,৩২,১৪১'২৪

পরিষৎ

তাবিখের উদ্বর্তপত্র

তহবিল

সম্পত্তি ও পাওনা

সাধাবণ তহবিলের জেব—		৪,২৭,৯২৮'০৯
কোম্পানীর কাগজ :		
লালগোলা	১৩,০০০'০০	
বিবিধ	৩২,০০০'০০	৪৫,০০০'০০
বিবিধ পাওনা :		
সাধাবণের নিকট ঝাড়গ্রামের	২৪,৫৫০'৯৮	
” ” লালগোলাব	৯,৯৪১'৫২	
লালগোলাব ” ঝাড়গ্রামের	৩৪৫'৩৩	
বিবিধের ” লালগোলাব	৩৯৩'৬২	
সাধাবণের ” বিবিধের	৩,৬৯৭'২৫	৩৮,৯২৮'৭০
মজুত কাগজ : (৩০ ১২ ৭৯)		
লালগোলা		১৮'৪৫
মজুত গ্রান্থ : (৩০ ১২ ৭৯)		
ঝাড়গ্রাম	৪৬,৯২২'৬৮	
লালগোলা	৭,১৯৪'৭৯	৫৪,১১৭'৪৭
ব্যাক্ষে মজুত : (৩০ ১২ ৭৯)		
ঝাড়গ্রাম	৭,০২৫'৪৭	
লালগোলা	৫,৫৭৩'৩৫	
বিবিধ	২৮,৭৪৮'০৯	৪১,৩৪৬'৯১
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল :		
কোম্পানীর কাগজ	৭,৪০০'০০	
ব্যাক্ষ	১২,০৪১'১৭	১৯,৪৪১'১৭
পুস্তকালয় আমানত তহবিল :		
কোম্পানীর কাগজ	৪,২০০'০০	
ব্যাক্ষ	৭৩১'২১	৪,৯৩১'২১
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল :		
ব্যাক্ষ		২৯৭'৮৫
পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল :		
ব্যাক্ষ		১৩১'৩৯
		৬,৩২,১৪১'২৪

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ

বিবিধ গচ্ছিত তহবিল

ব্যয়	আয়
প্রারম্ভিক মজুত (১. ১. ১৩৭৯) মজুত গ্রন্থ : ঝাড়গ্রাম ৫০,৩৯৩'১৮ লালগোলা <u>৭,৫৩৮'৮২</u> ৫৭,৯৩২'০০ মজুত কাগজ : লালগোলা : গত উদ্বৃত্ত পত্র হইতে ১৮ ৪৫ গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ : ঝাড়গ্রাম ১,৪৮৩ ৪৭ বিবিধ ব্যয় (ব্যাঙ্ক চার্জ) : লালগোলা ৩৬'৫০ বিবিধ <u>১১৭'৮৫</u> ১৫৪'৩৫ ইনকাম ট্যাক্স (বিবিধ তহবিল) ৬৪'০০ স্মৃতিরক্ষার ব্যয় : বিবিধ তহবিল ১৪'৩৩ কার্যপরিচালনার ব্যয় : ঝাড়গ্রাম ৫২০'৫৭ লালগোলা <u>৫১'৬০</u> ৫৭২'১৭	গ্রন্থবিক্রয় : ঝাড়গ্রাম ৩,৪৭০'৫০ লালগোলা <u>৩৪৪'০৩</u> ৩,৮১৪ ৫৩ সুদ : লালগোলা ৩৯০ ০০ বিবিধ <u>১,১০৩'০৫</u> ১,৪৯৩'০৫ বর্ষশেষে মজুত (৩০.১২.৭৯) মজুত গ্রন্থ : ঝাড়গ্রাম ৪৬,৯২২'৬৮ লালগোলা <u>৭,১৯৪'৭৯</u> ৫৪,১১৭'৪৭ মজুত কাগজ : লালগোলা : গত উদ্বৃত্ত পত্র হইতে ১৮'৪৫ ৫৯,৪৪৩'৫০ ৭৯৫ ২৭ ৬০,২৩৮ ৭৭
<u>৬০'২৩৮'৭৭</u>	ব্যয়াদিক্য

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ

ব্যয়

পুস্তক প্রেবণ খবচ আদায়	৪৯'৫০	অতিবিক্ত সময় কার্ঘ্যেব	
বিবিধ আয়	১৮'০০	পাবিশ্রমিক	৩১৫'৮৪
বই-বিক্রয়	৪,৯০৬'০০	কাগজ খবদ	১০,৭৭৪'০০
লেখক-গ্রাহক চাঁদা	৫২০'০০	পস্থমুদ্রণ (প্রেস)	৭,৪৮৬'০০
জযন্তী গ্রাহক	৭০'০০	প্রফ	২৯৭'০০
অগ্রিম বেতন আদায়	২১৫'০০	গাড়িভাড়া	১১৩'২২
পেটি ক্যাশ জমা	৩১'৯০	টেলিফোন খবচ	৭৯৬'৪০
মুদ-ব্যাঙ্কেব	৬৭'৩৩	ডাক খবচ	১৪৮'৯০
	৫,৮৭৭'৭৩	দপ্তব সবঞ্জাম	২৪৪'৪৭
গত বর্ষেব উদ্ধৃত্ত:		প্রবন্ধলেখক পাবিশ্রমিক	১,৩৫২'৩২
নগদ	২২৬'০৬	প্রবন্ধ নকল পাবিশ্রমিক	৩২৯'৫০
ব্যাঙ্ক	৩৫,৪০৯'৯৪	পুস্তক প্রেবণ খবচ	৪৭'৬৪
		বিবিধ ব্যয়	১৮৩'১৪
		বেতন ও ভাতা	১০,১৯৯'৮৭
		ঠেলা ভাড়া	১২৫'০০
		প্রবন্ধ অনুবাদ	১৯'৫২
		সাধাবণেব নিকট পাওনা	১,২৯৮'৬৩
		পূজা-পাবণী	৪১১'০০
		বিবিধ মুদ্রণ	৪৭'০০
		গ্রন্থমুদ্রণ (বাঁধাই)	১,৮০০'৭৫
		ব্যাঙ্ক চার্জ	৩'০০
			৩৫,৯৯৩'২৫
		বর্ষ শেষে মজুত:	
		নগদ	১'০৭
		ব্যাঙ্ক	৫,৫১৯'৪৬

৪১,৫১৩'৭৩

৪১,৫১৩'৭৩

বঙ্গীয় সাহিত্য

১৩৮০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক

আনুমানিক আয়

আয় তহবিল	প্রকৃত আয়		আনুমানিক আয়	
	১৩৭৭	১৩৭৮	১৩৭৯	১৩৮০
চাঁদা	৭,২৪৬'০০	৬,৭১২'০০	৭,১৬৩'০০	৮,০০০'০০
প্রবেশিকা	১৭৭'০০	১৮৫'০০	২৫২'০০	৩০০'০০
এককালীন দান	২২০'০০	৮৬৮'০০	২৬৫'০০	২০০'০০
আজীবন সদস্য চাঁদা	১,০৫০'০০	৩৫০'০০	২৫০'০০	৭০০'০০
গ্রন্থবিক্রয়	৪,৬৪৩'৬৭	৫,৫১৮'২৩	৫,৯৭৮'৬৮	১০,০০০'০০
পত্রিকা বিক্রয়	৬৪৫'৫০	১,৩৫৩'১০	৪৪৭'৫০	১,০০০'০০
সুদ	১৮৯'০০	১৮৯'০০	১৮০'০০	১৮০'০০
বিবিধ আয়	২২০'৯৪	৮৯'৬৫	৮২'৭০	১০০'০০
কার্যপরিচালনাব আয় : (বাড়গ্রাম ও লালগোলাব গ্রন্থ বিক্রয়েব উপর ১৫%)	৬৪২'৮৫	৫৩৭'৪৫	৫৭৩'০০	৭৫০'০০
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান :				
কর্মচারী নিয়োগ খাতে	৫,৭৫২'০০	১২,৩৩০'০০	৯,৮০৯'০০	১৩,০০০'০০
পুস্তক প্রকাশ খাতে	১,২০০'০০	১,২০০'০০	১,২০০'০০	১,২০০'০০
পত্রিকা প্রকাশ খাতে	২,০০০'০০		৪,০০০'০০	২,০০০'০০
পৌনঃপুনিক অহুদান			১১,০০০'০০	১১,০০০'০০
গচ্ছিত তহবিলেব দেনাশোধ		২৫,০০০'০০		২৫,০০০'০০
কেন্দ্রীয় সরকারের দান :				
পত্রিকা প্রকাশ খাতে			৩৭৫'০০	৩৭৫'০০
ঘাটতি				৭৩,৮০৫'০০
				৪৮,২৪৫'০০

মোট টাকি ১,২২,০৫০'০০

পরিষৎ

আয়-ব্যয়-বিবরণ (বাজেট)

ব্যয় তহবিল	আনুমানিক ব্যয়			
	প্রকৃত ব্যয়		আনুমানিক ব্যয়	
	১৩৭৭	১৩৭৮	১৩৭৯	১৩৮০
বেতন ও ভাতা	২১,৪৭৮'১২	২৩,২৫৮'৮৩	২৪,১৮৪'৭৪	৩০,০০০'০০
ডাক খবচ	৩৯৪'৪৫	৬৭০'৪৫	৯৯৭'০০	১,২০০'০০
বিজ্ঞাপনের ব্যয়	১৭৫'৪০	২৭৭'২০	২০২'৫০	৫০০'০০
বৈদ্যুতিক খবচ	১,২৭৯'১৯	৭৯৩'২১	১,৭১০'৮৪	২,০০০'০০
গাড়ি ও কুলি	৩১৬'৭৪	৩১০'৮৩	২২৭'১	৬৫০'০০
দপ্তর সবঞ্জাম	৩৩৬'৭০	৩৫৬'১৭	৭৫৯'৯৩	১,০০০'০০
গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ	২,৫৮৮'২৮	৪,৫৮৩'৩৮	২,৭১২'১৩	২৫,০০০'০০
পুস্তকালয় পুস্তক বাঁধাই	৫৪২'১৬	১,৬৬৬'৮৪	১,৪১৯'৫০	৩,০০০'০০
গ্রন্থতালিকা সংকলন	২৪'৭৪	১০৩'৮০	৭৪৫'৮৬	১,০০০'০০
চাঁদা আদায় খবচ	৪৪২'৫৮	১৭১'৬২	৩৬০'০৫	৪০০'০০
প্র. ফা. কার্যালয়ের দান	৭০৯'৮০	৭১৫'০০	৭১৫'০০	৮০০'০০
মন্দির সংরক্ষণ ব্যয়	১৩৫'৬৩	১৩'৫৩	২১১'৫৫	১০,০০০'০০
প্রতিষ্ঠা দিবসের ব্যয়			৬৫'৫৯	১০০'০০
চিত্রশালা খবচ	৫০০'০০	৫০১'১৯	৪৬১'৯৯	১,০০০'০০
আসবাব মেবামত	৭'০৫		১'২৫	৫০০'০০
পুস্তকালয় পুস্তক খবিদ	২২৯'৩০		৪৫৭'০০	১,০০০'০০
বিবিধ মুদ্রণ	১,৩৬৩'৭৫	৪৪১'০০	৫৭৩'০০	১,০০০'০০
বিবিধ ব্যয়	৭০৫'১৯	৬৭৯'০৫	১,০৮১'৬৮	১,২০০'০০
বিবিধ অধিবেশনের খবচ	৪০১'৮২	৬৮১'৫৬	১,৭৯'৬০	৫০০'০০
আসবাব খবিদ				৫,০০০'০০
পত্রিকা মুদ্রণ		৭৫০'৬৫	২,৭৯৬'৩৬	৪,০০০'০০
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যয়			১৪'৭৪	২০০'০০
স্মারক গ্রন্থমুদ্রণ			৪৫'০০	৬,০০০'০০
বিশেষ পাবিশ্রমিক			৭২৮'০০	১,০০০'০০
গচ্ছিত তহবিলের দেনাশোধ			২৫,০০০'০০	২৫,০০০'০০

মোট টাকা ১,২২,০৫০'০০

বিভিন্ন গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের জমা, খাচা ও উদ্ভূতের বিবরণঃ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ৥ তৃতীয় সংখ্যা
কাভিক-পৌষ
১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

Indianism and the Indian Synthesis : by Prof. S. K. Chatterjee.	Rs. 8.00
বৃন্দাবনের ছয় গৌস্বামী : ডঃ নরেশচন্দ্র জানা	Rs. 15.00
Collected Poems & Early Poems :	
by Manmohan Ghosh, Edited by Lotika Ghosh	Rs. 25.00
ছন্দভঙ্গ ও ছন্দোবিবর্তন : শ্রীতাপদ ভট্টাচার্য	Rs. 12.00
Early Indian Political & Administrative System :	
Edited by Dr. D. C. Sircar	Rs. 12.00
গৌবিন্দ বিজয় : (শ্রীঅভিষাম দাস বিবচিত) :	
ডঃ পীযুষকান্তি মহাপাত্র কর্তৃক সম্পাদিত	Rs. 25.00
Hydel & Thermal Power Development :	
Edited by Kanan Gopal Bagchi	Rs. 25.00
কৃষিবিজ্ঞান ১ম খণ্ড : বায়বাহাভ্রব বাজেশ্বর দাসগুপ্ত	Rs. 10.00
মহাভারত (কবি সঞ্জয় বিবচিত) :	
ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত	Rs. 40.00
জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : জিজ্ঞাসু	
হরিচরণ ঘোষ	Rs. 5.00
ছান্দসিকী by দিলীপকুমার রায়	Rs. 7.00
Pathology of the Unborn (Kshéntamony & Nagendralal Memorial Lec.) : by Dr. H. K. Chatterjee	Rs. 10.00
Political History of Ancient India :	
by Dr. Hemchandra Roychaudhuri	Rs. 50.00
Religious Life in Ancient India :	
Edited by D. C. Sircar	Rs. 12.00
শ্রীরাধাতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতামালা) :	
জনার্দন চক্রবর্তী	Rs. 12.00
ভারতীয় বনৌষধি (১ম-৪র্থ খণ্ড) :	
ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিখণ্ড	Rs. 30.00
Social Position of Woman through the Ages :	
by Prof. M. Z. Siddiqui	Rs. 6.00
Songs of Love & Death : by Manmohan Ghosh	Rs. 15.00
World Food Crisis (Kamala Lecture) :	
by Prof. Nilratan Dhar	Rs. 15.00
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী : সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	Rs. 6.00

বিস্তারিত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন :
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ
৪৮নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

শুভ সংবাদ

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের সদস্য, হিতৈষী ও সুহৃদগণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিসীম সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের নিকটবর্তী একটি স্থান হইতে তিনটি চূর্ণভ-বিষ্ণুমূর্তি (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের) পরিষদের চিত্রশালায় (Museumএ) ৬৫ বর্ষ পূর্বের সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিষৎ সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহ এই তিনটি চূর্ণভ বিষ্ণুমূর্তি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে নিকট প্রদান করেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মূর্তিগুলি সহকারী সম্পাদক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন। এই মূর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য William Rothenstein উইলিয়ম বদেনস্টাইন, E. B. Havel ই.বি. হ্যাভেল, Percy Brown পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কে. কুমারস্বামী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-রসিকদের সন্নিহিত প্রশংসা অর্জন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯১১ বদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই বিষ্ণুমূর্তি তিনটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures, and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

William Rothenstein

February 21, 1911

President,

Society of India, Great Britain and Ireland.

এই মূর্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে Royal Academy of Art রয়েল একাডেমি অফ আর্ট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্তে প্রদর্শিত হইয়া বিশ্ব-শিল্পরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তুর্ভাগ্যক্রমে এই তিনটি বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ (১লা মার্চ ১৯৫৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয়। ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৩ (৯ই মার্চ ১৯৫৭) কার্যনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সম্পাদক নির্মলকুমার বসু এই বিষ্ণুমূর্তি নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ-বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে প্রকাশ করেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ (৮ই জুন ১৯৫৭) তারিখের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান যে, গত ১লা মার্চ তারিখে পরিষদ হইতে যে মূল্যবান মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে এবং যাহা এখন পুলিশের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন। ঐ টাকা ফেরত পাইলে উক্ত ব্যক্তি মূর্তিটি ফেরৎ দিতে পারেন বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মূর্তিটি পুনঃসংগ্রহ করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি চেষ্টা করিতে বলেন। ২১শে আষাঢ় ১৩৬৪ (৬ই জুলাই ১৯৫৭) কার্যনির্বাহক-সমিতির সভায় “সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানাইলেন, যে, পরিষৎ হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিটির সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পরিষদেরই একজন সভ্য শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট সংগ্রহকারী উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঐ সংগ্রহকারী পাঁচশত টাকা বিনা রসিদে ফেবত পাইলে ও তাঁহার নাম প্রকাশ না পাইলে মূর্তিটি পরিষদকে প্রত্যর্পণ করিতে বাজী হন। উপায়ান্তর না থাকায় এবং মূর্তি ফেবত না পাইবার আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া পাঁচশত টাকা দিয়া ঐ মূর্তি ফেরত লওয়া হইয়াছে।” সভাপতি ও সম্পাদক দুইজনেই কলিকাতার বাহিরে থাকায় শ্রীঅজিত ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্তিটি পরিষদের তহবিল হইতে ৫০০ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং পরে সভা এই খরচ মঞ্জুর করেন।

পুলিসের সহায়তা না লইয়া এবং পুলিসকে না জানাইয়া পরিষৎ নিজ সম্পত্তি ক্রয় করেন। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে আলিপুরের রাজা সন্তোষ রোডের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে মূর্তিটি ছিল এবং সেখান হইতে মূর্তিটি আনা হইয়াছিল।

তাহার পর ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুআরি মধ্যরাত্রে পরিষদের মিউজিয়মের তাল্লা ভাঙ্গিয়া অপর দুইটি বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়। কলিকাতা পুলিশে ও গোয়েন্দা-বিভাগে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু কোনও মূর্তিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপার লইয়া আর কেহ অগ্রসর হন না। এই সংক্রান্ত পুলিশ রিপোর্টের ফাইলটি পরিষৎ কার্যালয় হইতে পরে অদৃশ্য হয়।

পরিষদের বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্নবস্তু ইত্যাদি চুরি গিয়াছে, স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে ১৯৭২ সালে পরিষদের সাধারণ-সদস্য-রূপে শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন পরিষৎ সভাপতি নির্মলকুমার বসু ও সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ব নিকট দৃষ্টান্ত-সহকারে কতকগুলি অভিযোগ কবেন। অভিযোগগুলি ব তদন্তের জন্ম ১১ই জুন ১৯৭২ (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮) ‘পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত কমিটি’ নিযুক্ত হয়। দুঃখের বিষয়, তদন্ত কমিটির কার্য সামান্য অগ্রসর হইয়া বন্ধ হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও কার্য-বিবরণ পুনঃপুন অহরোধ সত্ত্বেও কার্যনির্বাহক-সমিতি ও ত্রাসরক্ষক-সমিতির নিকট দাখিল করেন নাই। কার্যনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ ১৩৮০ (১৯শে জানুআরি ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত কমিটি বাতিল কবেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীশুশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া পরিষদের অপহৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্ম ১৯৭৪ সালের জানুআরি হইতে বর্তমান সম্পাদক অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে বর্তমান পরিষৎ সম্পাদক, পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীশুশীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, ঐ অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিগুলির আলোকচিত্র মনোমোহন গাঙ্গুলীর “Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad” গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবি হইতে তুলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত মিউজিয়মে পাঠাইয়া অনুকূপ বিষ্ণুমূর্তি সেখানে আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্ম অহরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার Museum of Fine Arts, Bostonএর কিউরেটর শ্রীযুক্ত য়ান ফন্টেন Jan Fontein ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ সম্পাদককে জানান যে দুইটি মূর্তির একটির অহরূপ (ঈষৎ বিকৃত) মূর্তি বোস্টন

মিউজিয়মে ১৯৭০ সালে প্রাচীন-শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত হইয়াছে এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture' গ্রন্থে মুদ্রিত ঐ মূর্তির চিত্র দেখিয়া তাঁহারা উহা ক্রয় কবিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে বা মুদ্রিত চিত্রে ঐ মূর্তি যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মূর্তি তাহা কোথাও উল্লেখ নাই। ঐ মূর্তির স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে পরিষদের গত ৬৫ বৎসরের পুৰাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বের সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও আলোকচিত্রাদি হইতে পরিষদের স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন কবিয়া পরিষৎ সম্পাদক পাঠান। পরিষদের স্বত্বস্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি পরিষদে প্রত্যর্পণের জন্য সম্পাদকের অনুবোধে বোস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য ও সহায়তার সহিত স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে উহা সমর্পণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট, হল এণ্ড স্টুয়ার্ট Cohate, Hall & Stewart বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বোস্টন মিউজিয়ামের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রীশ্বেদশঙ্কর ভূঞা পরিষদের পক্ষে উহা অনুমোদন করেন। গত ২২শে মে ১৯৭৪ ঐ চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এবং দ্বিতীয় পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের পক্ষে ডিবেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল্ সী রুপেল্ Merrill C. Ruepell ঐ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও শীলমোহর করেন।

অতঃপর পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকারের ব্যয়ে মূর্তি ভাবতে আনার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও তাঁহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানান যে ভারতীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রকে ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফতরে তিনি এ

বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধান-মন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন।

১২ই জুলাই ১৯৭৪ মহামাণ্ড রাজ্যপাল রাজভবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্র দেখিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

১৯শে জুলাই ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষদের ঐ বিষুমূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলের T. N. Kaulএর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্রীআর্টনি লাম্বলট্ দিয়াসের প্রস্তাব অনুসারে ঐ মূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত নির্যাপত্তা ব্যবস্থাসহ ঐ বিষুমূর্তি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত আর্টনি লাম্বলট্ দিয়াসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ মন্দিবে আয়োজিত একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে মহামাণ্ড রাজ্যপাল উহা পরিষদ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বর্ষারম্ভে ইহা আমাদের শুভ কর্মপথে প্রেরণা দিবে।

নানা কারণে এ সম্পর্কিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন গোপন রাখা হইয়াছিল। ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবেব প্রাক্কালে মূর্তি প্রত্যর্পিত হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষৎ সদস্যগণের ও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল।

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহায়তা দান করার জন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, রাজ্যপাল শ্রীআর্টনি লাম্বলট্ দিয়াস, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওল, বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত য়ান ফন্টেন্ Jan Fontein ও ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল সী কপেল, Cohate Hall & Stewart প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েল্ড এস. হেনশা Weld S. Henshaw, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার,

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কল্যাণীয় শ্রীমান্ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মূর্তি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশ ও সহপদদেশের জন্য সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইত না।

অপহৃত দুইটি বিষ্ণুমূর্তি এক লক্ষ ডলারে আমেরিকায় বিক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া পরিষৎ সম্পাদক কার্যনির্বাহক-সমিতি ও শ্রাসরক্ষক-সমিতিতে জানাইয়াছিলেন। এখন জানা গিয়াছে যে বোস্টন মিউজিয়মের কতৃপক্ষ ৫০ হাজার ডলারে (পৌনে চার লক্ষ টাকা) পরিষদে প্রত্যাৰ্পিত এই বিষ্ণুমূর্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে বোস্টন মিউজিয়ম উহা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রেতা পরিষৎ সম্পাদকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া মূর্তি কিভাবে তাঁহার হস্তগত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবেন, বোস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তারিখে পবিষৎ সম্পাদককে লিখিয়াছেন। উক্ত বিক্রেতা অদ্যাবধি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আমরা অধীর আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

অপহৃত দ্বিতীয় মূর্তিটির পুনরাগমনে পরিষদ মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পরিষদের বিরাজীতম বর্ষের প্রারম্ভে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও কামনা ॥

পরিশেষে, পরিষদের সদস্যগণকে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ২২শে জুলাই ১৯৭৪ মাননীয় রাজ্যপাল রাজভবনে পরিষৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনাকালে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, গ্রন্থশালা প্রভৃতির উন্নয়ন সম্বন্ধে কৌতুহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার এই প্রীতি ও আন্তরিক্য পরিষদের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ ॥

২৫শে জুলাই ১৯৭৪ ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক ॥

ব্রহ্মপ্রসাদ চন্দ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ঢাকা জিলাৰ একটা গণ্ডগ্ৰামে ১৮৭৩ সনেৰ ১৫ অগষ্ট তাৰিখে ব্রহ্মপ্রসাদ চন্দ জন্মগ্ৰহণ কৰেন। ছাত্ৰজীবন হইতেই নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰাৰ জন্ম পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি বছৰ গ্ৰন্থ পাঠ কৰিতেন এবং ইহাৰ ফলে মৌলিক বচনাৰ দিকে তাঁহাৰ আগ্ৰহ জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ বাংলাৰ ইতিহাস সম্বন্ধে প্ৰবন্ধগুলি পাঠ কৰিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ সন্মুখে সাক্ষাৎ কৰেন এবং বাংলাৰ একখানি প্ৰকৃত ইতিহাস বচনাৰ সংকল্প তাঁহাৰ নিকট নিবেদন কৰেন। বঙ্কিমচন্দ্ৰ তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন কিন্তু কিছু লিখিবাব পূৰ্বে এ বিষয়ে শ্ৰম সহকাৰে তথ্যাদি সংগ্ৰহ কৰিতে উপদেশ দিলেন। ইহাৰ পৰ ব্রহ্মপ্রসাদ একটা সুদীৰ্ঘ প্ৰবন্ধ লিখিয়া প্ৰতিপন্ন কৰিতে চেষ্টা কৰেন যে বিভিন্ন জাতি বা বৰ্ণেৰ সংমিশ্ৰণই হিন্দু জাতিৰ অধঃপতনেৰ প্ৰধান কাৰণ। প্ৰবন্ধটি লইয়া তিনি কালীপ্ৰসন্ন ঘোষেৰ সন্মুখে সাক্ষাৎ কৰেন। কালীপ্ৰসন্ন ঘোষও তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে এটা এখন ছাপাইও না—আবও অনেক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিতে চেষ্টা কৰ। এই দুই মনস্কীৰ নিৰ্দেশ ও উপদেশ যে ব্রহ্মপ্রসাদেৰ জীৱনে বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিষাছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাৰণ পৰবৰ্তী কালে তিনি যে সমুদয় গ্ৰন্থ ও প্ৰবন্ধ বচনা কৰিষাছেন তাহাতে অসাধাৰণ শ্ৰম ও অধ্যবসায় সহকাৰে জাতব্য বিষয়েৰ তথ্য সংগ্ৰহেৰ প্ৰকৃষ্ট প্ৰমাণ পাওযা যায়।

ব্রহ্মপ্রসাদেৰ পিতাৰ আৰ্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। পূৰ্ণেৰো বৎসৰ বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। সুতৰাং ১৮৯৬ সনে বি. এ. পৰীক্ষা পাশ কৰিবাব পৰাই তাঁহাকে চাকুবী খোঁজ কৰিতে হয়—এবং কতক দিন পৰ্য্যন্ত প্ৰাইভেট টুইশনি কৰিয়া সংসাৰ চলাইতে হয়। কিন্তু ছাত্ৰ অবস্থা হইতেই নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভেৰ স্পৃহা ও গ্ৰন্থাদি পাঠেৰ যে অদম্য আগ্ৰহ ছিল তাহা কোন দিনই হ্ৰাস পায় নাই। সুতৰাং বেকাৰ অবস্থায় টুইশনি কৰাৰ অবসৰে তিনি নিয়মিতভাবে Imperial Library-তে (বৰ্তমান কালেৰ National Library) গিয়া পড়াশুনা কৰিতেন। তখনকাৰ দিনে তাঁহাৰ বয়সেৰ যুবক বা ছাত্ৰেৰা এই লাইব্ৰেৰীতে বড় একটা যাইত না। সুতৰাং প্ৰেসিডেণ্টী কলেজেৰ একজন ইংবেজ অধ্যাপক একটা যুবককে লাইব্ৰেৰীতে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা কৰিতে দেখিয়া তাঁহাৰ দিকে আকৃষ্ট হন—এবং এই অধ্যাপকেৰ চেষ্টায় ব্রহ্মপ্রসাদ কলিকাতা হিন্দু স্কুলেৰ শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ কি ১৯০৬ সনে তিনি বাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হন।

ব্রহ্মপ্রসাদ তেৰো বৎসৰ বাজসাহীতে ছিলেন। জীৱনে পাণ্ডিত্য, গবেষণা,

ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ও অন্যান্য যে সমুদয় গবেষণার জন্য বমাপ্রসাদ অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন বাঙ্গলাসাহীতেই তাহাব সূত্রপাত হয়।

এই সময় রাজসাহীতে প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও দীঘাপাতিয়াব বিদ্যোৎসাহী কুমার শবৎকুমার বায় বমাপ্রসাদ চন্দ্রের নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। ১৯১০ সনে এই তিনজন বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে ভাগলপুর যান এবং ঐ অঞ্চলের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হন—এবং উক্ত বঙ্গের প্রত্নসম্পদের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা উক্ত বঙ্গ ঘুরিয়া ৩২টি ভাস্কর্যের নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ইহাব মধ্যে পালযুগের একটি পার্বতী মূর্তি শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া শবৎকুমারের আর্থিক সাহায্যে পূর্বে বহু প্রায় দুই শতটি প্রাচীন স্থান ঘুরিয়া বহু প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন সংগ্রহ করেন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে আবও প্রাচীন মূর্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইলে কুমার শবৎকুমারের অর্থ সাহায্যে ১৯১৬ সালে ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। শবৎকুমার, অক্ষয়কুমার ও বমাপ্রসাদ যথাক্রমে ইহাব সভাপতি, পরিচালক ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমগ্র ভারতে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। এই সমিতিই সর্বপ্রথম পাহাড়পূর্বের ধ্বংসাবশেষ খনন কার্যে প্রবৃত্ত হন। পববর্তীকালে ভাবতসরকার এই স্থান খনন করিয়া প্রাচীন ভাবতের বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এখানে যে সমুদয় প্রাচীন মূর্তি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—তাহা প্রাচীন বাংলাব ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু বমাপ্রসাদ চন্দ্র শিক্ষকতা ও ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদকের কার্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বহু সংখ্যক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু ইহাব মধ্যে তাঁহাব ইংবেজী গ্রন্থ Indo-Aryan Races এবং বাংলা গ্রন্থ গোঁড়বাজমালা তাঁহাব অক্ষয় কীর্তি।

প্রথম গ্রন্থখানি বমাপ্রসাদের বহুদিন গবেষণার ফল। ১৯০১ সালের সেম্বাস বিপোর্টে এই বিভাগের কমিশনার Sir Herbert Risley মন্তব্য করেন যে ভাবতীয়দের মধ্যে আর্থবক্ত খুবই কম এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহা নাই বলিলেও চলে। বমাপ্রসাদ বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন ও নানাবিধ নৃতত্ত্ব-বিধি অনুযায়ী পরীক্ষা নিবীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানী সাহেবের মতেব অসাবতা প্রমাণ করিয়া অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। অবশেষে এই সমুদয় আলোচনা ১৯১৬ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। Indo-Aryan Races নামক এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত মহলে বিশেষ সাদা জাগায়। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১৯১৭-১৯৭-৭৫ পৃষ্ঠা) পণ্ডিতপ্রবব A. B. Keith এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে ইণ্ডো-আরিয়ান জাতিব উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমুদয় বচনাবলী আছে, এই গ্রন্থ তাহাব মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট স্থান পাইবাব যোগ্য।

এই গ্রন্থ বচনা প্রসঙ্গে বমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়েব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হু একটি কথা বলা আবশ্যক। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞা বর্তমান যুগে কেবল পুথিগত বিজ্ঞা নহে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রথায যন্ত্রপাতিব সাহায্যে মানুষেব মাথাব দৈর্ঘ্য-প্রস্থেব অনুপাত, চুলেব রং এবং শরীরেব বিভিন্ন অঙ্গেব গঠনেব বৈষম্য পবীক্ষা করিয়া প্রতি মনুষ্য জাতি কষেকটি নির্দিষ্ট আদিম শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত তাহা নিরূপণ কবিত্তে হয়। রিজলী সাহেব লিখিয়াছিলেন যে এইরূপ মাপ জোক ও পবীক্ষা নিবীক্ষা করিয়াই তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বমাপ্রসাদ চন্দ্রের এইরূপ পবীক্ষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, ইহাব জন্ম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও ছিল না। অপূর্ব অধ্যবসায ও শ্রম সহকারে তিনি এই পবীক্ষাব প্রণালী অধিগত কবেন এবং ভাবত সরকার তাঁহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিচার বিতর্কে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঐ সব যন্ত্রাদি ধাব দেন। বমাপ্রসাদ এই যন্ত্রগুলিব সাহায্যে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ হইতে আবন্ত কবিয়া সাঁওতাল নব-নারীর দেহের মাপজোক করেন। ইহার ফলে ভাবত সরকার ১৯১০ সনে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানেব সুবিধার জন্ম বমাপ্রসাদ চন্দ্রকে নৃতত্ত্ব বিভাগেব বিশেষ কর্মচারী (Special Officer) নিযুক্ত করেন। এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি Indo-Aryan Races গ্রন্থখানি লিখিয়া বিজলী সাহেবের মত খণ্ডন কবেন। বর্তমান কালে অনেকেই মোটামুটিভাবে বমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতায়ত সমর্থন কবেন।

বমাপ্রসাদ চন্দ্রের প্রথম জীবনে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা প্রাধান্য লাভ কবিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি ভাবতবর্ষেব পুৰাতত্ত্ব ও বিশেষভাবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধাবেব চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কবেন। ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিব সম্পাদক রূপে তিনি প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, মূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপেব বিবরণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ কবেন। ইহার ফলে তিনি 'গৌড়বাজমালা' নামক গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাস বচনা কবেন। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকেব প্রথমভাগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইংবেজ বাজকর্মচারীদের শিক্ষাব জন্ম বাজাবলী নামক যে গ্রন্থ বচনা কবেন তাহা পড়িলেই বোঝা যাইবে যে কতগুলি অলীক কাহিনীই তখন বাঙ্গালীব প্রাচীন যুগেব ইতিহাসেব স্থান অধিকার করিত।

উনিশ শতকেব শেষার্ধ্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়িয়া ও অগ্ন্যাগ্ন উপায়ে যে সমুদয় প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, মূর্তি ও অগ্ন্যাগ্ন ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কার কবেন তাহাব সাহায্যে ভাবতেব হিন্দুযুগ সম্বন্ধে অনেক নতন তথ্য সম্বলিত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

প্রণালীতে লিখিত ঐতিহাসিক বচনাব সূত্রপাত হয়। বর্তমান যুগে অনেকেই হস্ত শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে একশত বৎসব পূর্বেও মৌর্য সম্রাট অশোক সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না এবং দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অথবা বাজেন্দ্র চোল প্রভৃতির নামও অজ্ঞাত ছিল। বাংলা দেশের লোক যে হিন্দুযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ কবিয়াছিল উনিশ শতকের কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাহাব বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে বাংলাব প্রাচীন গোঁবব সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ তখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয় উপকরণেব সাহায্যে রমাপ্রসাদ চন্দ্র ‘গৌড়বাজমালা’ গ্রন্থ বচনা করেন। এই গ্রন্থ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। মুসলমান অধিকাবেব পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশেব ঐতিহাসিক বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাব পূর্বে বাংলাব ইতিহাস সম্বন্ধে যে দু একখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বোক্ত বাজাবলী গ্রন্থেব ন্যায় পুরাতন কাহিনী ও কিংবদন্তীব সমষ্টি মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলাব প্রথম ইতিহাস ‘গৌড়বাজমালা’। প্রাচীন বাংলাব ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এই গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এবং অনেক প্রচলিত ধারণা যে ভুল তাহাও এই গ্রন্থে প্রমাণিত হয়। গৌড়বাজ শশাঙ্কেব প্রকৃত ইতিহাস এই গ্রন্থেই প্রথম আলোচিত হয়। বাংলাব এই প্রথম সার্বভৌম সম্রাট যে দক্ষিণে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে কালকুজ পর্যন্ত জয় কবিয়াছিলেন তাহাব প্রকৃত বিবরণ আমবা এই গ্রন্থেই প্রথম জানিতে পাবি। বাণভট্ট হর্ষচবিতে সম্রাট শশাঙ্ক সম্বন্ধে যে কুৎসা কলঙ্ক ও অপবাদ বচনা, বমাপ্রসাদ এই গ্রন্থে নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তাহা খণ্ডন কবিয়াছেন। পালবংশীয় বাঙ্গালী সম্রাটগণের কীর্তি কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা কবিয়া তিনি বাঙ্গালীব অতীত গোঁবব-স্মৃতি লোক সম্মুখে উপস্থাপিত কবিয়াছেন। পাল সম্রাটগণেব বাসস্থান যে বিহাবে নহে, বাংলা দেশে বমাপ্রসাদ তাহা প্রতিপন্ন করেন। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসাবে বাজা আদিশূব কর্তৃক কর্ণোজ হইতে আনীত পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হইতেই বাংলাব বর্তমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদেব উৎপত্তি হইয়াছে। এই কাহিনীব উপবই বাংলাব হিন্দুদেব বর্তমান সামাজিক ইতিহাস বচিত হইয়াছে। কিন্তু বহুপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীব যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই রমাপ্রসাদ তাহা প্রতিপন্ন করেন। বাংলাব সেন বাজগণের বাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রথমে কীলহর্ষ সাহেব ও পরে তাহাব অনুসরণ কবিয়া বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ঐতিহাসিক যে মত পোষণ কবিতেন বমাপ্রসাদই সর্বপ্রথম তাহাব অসাবতা প্রতিপাদন করেন। পূর্বোক্ত সকল বিষয়েই রমাপ্রসাদেব সিদ্ধান্তই বর্তমান ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ কবিয়াছেন।

রমাপ্রসাদ চন্দ্রের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা সেই সময়কাব সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ (Director General of Archaeological Survey) সার্ব জন্ মার্শালের

দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। ১৯১৭ সনে জুলাই মাসে রমাপ্রসাদ সবকারী বৃত্তি পাইয়া খনন কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভের জন্য তক্ষশিলা, মথুরা ও সাবনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন কার্যে যোগদান করেন। তিনি বাজসাহী ছাডিয়া আসিলেও ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত সম্বন্ধ কোন দিনই ফুগ্ন হয় নাই। নূতন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে রমাপ্রসাদ বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত ভাবতের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বচনা করেন। ইহার কয়েকটি *Memoirs of the Archaeological Survey of India*—এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এই শিক্ষানবীশির কালে রচিত ‘সাঁচীস্তূপের লিপিব কালনির্ণয়’ (*Date of the Votive Inscriptions on the Stupas at Sanchi*) পুস্তিকাখানি এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালাব অন্তর্গত নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পবিচায়ক।

- (১) *Archaeology and Vaishnava Traditions* (২) *The Beginnings of Art in Eastern India* (৩) *The Indus Valley in the Vedic Period* (৪) *Survival of the Pre-historic Civilization of the Indus Valley* (৫) *Explorations of Orissa.*

এগুলি ছাড়াও তিনি বহু প্রবন্ধ বচনা কবিয়াছেন। ইহাব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাত্র কয়েকটির উল্লেখ কবিতোঁহি :

- ১। *Mathura School of Sculpture.*
- ২। *The Svetamvara and Digamvara Images of the Jainas.*
- ৩। *Art in Orissa.*
- ৪। *Notes on the Ancient Monuments of Mayurbhanj.*

ময়ূবভঞ্জের রাজসবকাবের আমন্ত্রণে রমাপ্রসাদ ঐ রাজ্যের নানা স্থানে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন কার্যের পবিচালনা কবিয়াছিলেন শেষোক্ত গ্রন্থে তাহাব বিবরণ আছে। খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি বক্ষাব জন্য ময়ূবভঞ্জের রাজধানী খিচিং শহবে তিনি একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৯ সনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ চন্দকে স্নাতকোত্তর বিভাগে (*Post-Graduate Studies of the Calcutta University*) প্রাচীন ভাবতীয় ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরে নৃতত্ত্ব বিভাগ (*Department of Anthropology*) খোলা হইলে রমাপ্রসাদ ইহাব অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২১ সনে গুণগ্রাহী সার জন মার্শাল রমাপ্রসাদ চন্দকে কলিকাতাব যাদুঘরের *Superintendent of the Archaeological Section* নিযুক্ত করেন। এই পদে থাকা কালীন তিনি যাদুঘরের মূর্তিগুলিব নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কালক্রম ও শিল্পপদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী-বিভক্ত করিয়া সাজাইবাব ব্যবস্থায় বিশেষ দক্ষতাব পবিচয় দিয়াছিলেন।

সিদ্ধনন্দেৰ উপত্যাকায় মহেশ্বোদ্যোত ও হৰপ্পাৰ প্ৰাপ্ত ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰাচীন যুদ্ধা, মূৰ্তি ও অন্যান্য দ্ৰব্যৰ প্ৰদৰ্শনী যখন দিল্লীতে অৱস্থিত হয় তখন স্মাৰ জন মাৰ্শাল বমাপ্ৰসাদ চন্দকে এঙলি সাজাইবাব ভাব দেন। এই উপলক্ষে, ধ্যানবত্ৰ এটি মূৰ্তি বমাপ্ৰসাদেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এবং ইহা যে হিন্দুশাস্ত্ৰে বৰ্ণিত অৰ্ধ-উন্নীলিত নাসিকাব অগ্ৰভাগ-বন্ধ নয়নযুগল যোগীবহী প্ৰতিকৃতি তিনি ইহা প্ৰতিপন্ন কৰিয়া প্ৰাচীন যোগশাস্ত্ৰেৰ সহিত ইহাব সম্বন্ধ স্থাপনেৰ চেষ্টা কৰেন। বমাপ্ৰসাদ এ সম্বন্ধে প্ৰবন্ধও লিখিয়াছেন এবং অনেকে তাহাব সিদ্ধান্ত সমর্থন কৰিয়াছেন।

জীবনেৰ প্ৰথমভাগে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বমাপ্ৰসাদেৰ মনে যে আগ্ৰহ জন্মিয়াছিল, কোন দিনই তাহা হ্ৰাস পায় নাই। ১৯৩৪ সনে International Anthropological Congress-এৰ প্ৰথম অধিবেশনে ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিকপে নিমন্ত্ৰিত হইয়া বমাপ্ৰসাদ বিলাত যান। এই সুযোগে লণ্ডনেৰ জগদ্বিখ্যাত ব্ৰিটিশ মিউজিয়ামেৰ কৰ্তৃপক্ষগণ, তাহাকে উক্ত মিউজিয়ামেৰ ভাৰতীয় বিভাগেৰ সংগৃহীত প্ৰদৰ্শনীৰ দ্ৰব্যাদি যথাযথভাবে সাজাইয়া বাধিতে সাহায্য ও পৰামৰ্শেৰ জন্য আমন্ত্ৰণ কৰেন। বমাপ্ৰসাদ এই কাৰ্য সুসম্পন্ন কৰেন এবং এখানকাৰ মধ্য-যুগেৰ মূৰ্তিগুলি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা ৰচনা কৰেন। ১৯৩৬ সনে ইহা "Medieval Indian Sculpture in the British Museum" নামে লণ্ডনে প্ৰকাশিত হয়। উক্ত মিউজিয়ামেৰ এই বিভাগেৰ অধ্যক্ষ Mr. R. L. Hobson এই পুস্তিকাৰ ভূমিকায় ইহাব ভূয়সী প্ৰশংসা কৰেন।

১৯৩৪ সনে বমাপ্ৰসাদ ভাৰতীয় বিজ্ঞান কংগ্ৰেছেৰ বম্বে অধিবেশনে নৃতত্ত্ব বিভাগেৰ সভাপতি পদে নিৰ্বাচিত হন। সভাপতিৰ অভিভাষণে তিনি জীবনব্যাপী নৃতত্ত্ব ও প্ৰাচীন ভাৰতৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসেৰ অধ্যয়ন ও গবেষণাৰ ফলশ্ৰুতি স্বৰূপ কয়েকটি নূতন মৌলিক সিদ্ধান্তেৰ অবতারণা কৰেন। প্ৰচলিত মত এই যে বৈদিক হিন্দুধৰ্মেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্মেৰ অভ্যুদয় হয়। কিন্তু বমাপ্ৰসাদ বহু যুক্তি তৰ্ক সহকাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিতে চেষ্টা কৰেন যে বস্তুতঃ এই দুইটি ধৰ্মমত আৰ্য যুগেৰ পূৰ্বেই প্ৰচলিত ছিল সুতবাং বৈদিক ধৰ্ম অপেক্ষা প্ৰাচীনতৰ। তিনি আৰও বলেন হিন্দুধৰ্মেৰ অন্তৰ্গত যৌগিক পদ্ধতি ও তপস্যা, শৈব ধৰ্মমত প্ৰভৃতিও প্ৰাক আৰ্য যুগেৰ, সুতবাং প্ৰাক-বৈদিক ধৰ্মমত। সুতবাং তাহাব মতে ভাৰতবৰ্ষে আৰ্যদেব আগমনেৰ এবং বেদ ৰচনাৰ পূৰ্বেই সিদ্ধনন্দীৰ উপত্যাকায় খ্ৰীষ্ট জন্মেৰ তিন সহস্ৰ বৰ্ষ পূৰ্বে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাৰ অভ্যুদয় হয়। পৰে আৰ্যগণ ভাৰতে আসিয়া ইহাব যে পৰিবৰ্তন ও পৰিবৰ্ধন কৰেন তাহাই বৈদিক হিন্দুধৰ্ম নামে পৰিচিত। বমাপ্ৰসাদ চন্দেৰ এই মতবাদেৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন এখনও হয় নাই। তবে পৰবৰ্তী কালে নানা বৈদ-বিবোধী এবং এমন কি পৌৰাণিক ধৰ্মে যে বৈদিক সাহিত্য হইতে স্বাতন্ত্ৰ্য দেখা যায় সে সম্বন্ধে বমাপ্ৰসাদ চন্দেৰ গবেষণা সে নূতন আলোকপাত কৰিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বমাপ্রসাদ চন্দ্রের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু জানেন—এবং ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে তাঁহার রচনা হইতে এ বিষয়ে অনেক জানিতে পাবিবেন। কিন্তু মানুষ বমাপ্রসাদের স্মৃতি প্রায় লোপ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং সেই সম্বন্ধে দুচাৰটি কথা বলিব। আমি তাঁহার অপেক্ষা বয়সে পনেরো বছরের ছোট হইলেও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পবিচয়ের সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দান করেন আমিও তখন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। সেই সময়ে বমাপ্রসাদ চন্দ্র, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ রসু, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতি ও কতকগুলি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া গুরুতব মতভেদ ছিল। আমি, যতীন্দ্রমোহন রায়, সুবেন্দ্রনাথ কুমার প্রভৃতি কয়েকজন প্রথমোক্ত দলের ভক্ত ছিলাম—দ্বিতীয় দল আমাদেরকে পবিহাস কবিয়া বলিতেন যে ইহারা পাথুরে প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসনের প্রমাণই আমবা প্রাচীন কাহিনী, বংশাবলী, কুলজী, ঘটকের পুঁথি প্রভৃতির প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতব মূল্যবান মনে কবিতাম। পূর্বে আদিশূব-কাহিনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের একটি প্রধান কাবণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সমুদয় বাদ প্রতিবাদ উপলক্ষে আমাদের দলের মধ্যে বয়সের ব্যবধান থাকিলেও একটি আন্তরিক হৃদয়তা ও অন্তবঙ্গতাব বন্ধন হইয়াছিল। ইহাব একটি বাহ্যিক নিদর্শন ছিল, প্রতিমাসে একবার কি দুইবার পবম্পবেব গৃহে একত্রে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা। নাটোবেব মহাবাজা জগদিন্দ্রনাথ বাস ইতিহাসে বিশেষ অনুবাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের একজন বিশেষ গৃষ্ঠপোষক। তাঁহার বাড়ীতে নৈশ ভোজন ছাড়াও অনেক সন্ধ্যায়ই আমবা সমবেত হইতাম। এই সব উপলক্ষেই আমি বমাপ্রসাদ চন্দ্র অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতিলাভে ধন্য হইয়াছিলাম। আমবা সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধাই ব্যবহার কবিতেন। তিনি অত্যন্ত সাদা সিধা ধবণেব লোক ছিলেন, পোষাক পবিচ্ছদেব দিকেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। মাথায় তেল দিয়া স্নান কবাটা তাঁহার খুব অপছন্দ ছিল। সে-যুগে স্নানামধ্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে প্রাতঃ কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গেলে অনেক সময় দেখা যাইত, বেলা নয়টাৰ সময় দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন ও-দিকে ভূত। তাঁহার মস্তকে তেল মাখাইতেছে। ইহাতে বমাপ্রসাদের ভীষণ অস্বস্তি বোধ হইত এবং প্রকাশ্যে একাধিকবার তিনি ইহাব তীব্র নিন্দা কবিয়াছেন। সচবাচর সাংসারিক জ্ঞান বলিতে আমবা যাহা বুঝি আশ্চর্য্য-প্রকৃতি বমাপ্রসাদের তাহাব কিছু অভাব। পড়াশুনা গবেষণাই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান—অন্য সব বিষয়ে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার আমবা বাড়ীতে অন্যান্য ঐতিহাসিক বন্ধুদের সঙ্গে তাঁকেও নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলাম কিন্তু কলিকাতা হইতে আমার বাসস্থান ভবানীপুৰ যাওয়াব পথ সম্বন্ধে তিনি এতই অজ্ঞ ছিলেন

যে কাগজে পেলিল দিয়া মানচিত্র সাহায্যে তাঁহাকে পথের নির্দেশ দিতে হইল—কোথায় ট্রামে উঠিতে হইবে কোথায় নামিতে হইবে এসব তিনি নিজহস্তে লিখিয়া রাখিলেন এবং মানচিত্র ও নির্দেশ অনুসারে আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদের সরলতা, সাংসারিক অনভিজ্ঞতা ও নীতির উচ্চ আদর্শ—এই সমুদয়ের সুযোগ লইয়া কোন কোন সময় তাঁহাকে পবিহাস করার ব্যবস্থা হইত। কলিকাতায় নাটোবেব মহাবাজা জগদীন্দ্রনাথ বায়েব বাড়ীতে মাঝে মাঝে আমাদের দলের বৈঠক বসিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এক বাত্রিতে গানের জলসায় একটি ছেলেকে মেয়েদের কাপড় পবাইয়া নাচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—কাবণ রমাপ্রসাদের নীতিজ্ঞান এ বিষয়ে খুব প্রখর ছিল এবং তিনি নর্তকীর নৃত্য মোটেই পছন্দ কবিতেন না। এই জন্তই মহারাজাব নির্দেশ মত এই নর্তকীর বেশ পবিহিত বালকটি বিশেষভাবে বমাপ্রসাদের নিকটে গিয়াই নাচিতে আবন্ত কবে—বমাপ্রসাদ যতই পশ্চাদদিকে সবিসা যান নর্তকীও তাঁহার অনুসরণ কবে। অবশেষে দবজাব কাছে পৌঁছিয়া যখন বমাপ্রসাদ কক্ষত্যাগ কবিতে উত্তত হইয়াছেন তখন মহাবাজাব ইঙ্গিতে আমি গিয়া তাঁহাকে ধবিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলাম। নর্তকীও বেশ বদলাইয়া আসিল। বমাপ্রসাদ চন্দ আসন গ্রহণ কবিলেন। সভায় একটি হাসিব রোল পড়িল। ছুঃখেব বিষয় কোন কোন সময়ে এই প্রকাব বসিকতা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। কিন্তু বমাপ্রসাদ চন্দকে বখনও বিচলিত বা বিবক্ত হইতে দেখি নাই। পূর্বোক্ত নর্তকীর ঘটনাটিতে বমাপ্রসাদের বিবক্তি ও পশ্চাদপসবণে তাঁহার ব্যক্তিগত চবিত্রেব যে নীতির মহান আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ প্রায় ৫৫ বছর পবেও তাহা আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। বমাপ্রসাদের কোন শত্রু ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। এই অমায়িক, সবল-স্বভাব, নিবলস, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল সুহৃদেব স্মৃতিব প্রতি তাঁহার জন্মেব শতবার্ষিকীতে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন কবি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

সুকুমার সেন

ইংবেজীতে Orientalist বললে যা বোঝায় আমাদের দেশে তেমন পণ্ডিতের নাম কবতে হলে সর্বাগ্রে বাজেন্দ্রলাল মিত্র 'স্ববর্ণীষ'। কিন্তু তিনি শুধুই প্রাচ্যবিদ্যাবিশাবদ ছিলেন না, অন্যদিকেও তাঁর প্রচুর গুণগণনা ছিল। সে সব গুণগণনা সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তি অনেকেই অবগত ছিলেন কিন্তু পববর্তীকালে তিনি শুধু অগাধ পাণ্ডিত্যের ও বাগ্মিত্যের খ্যাতিই পেয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যের খবিদদার নন এমন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বাজেন্দ্রলালের সত্যকাব পবিচয় অনারত কবেছেন ববীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে। তার পব থেকে আমবাও ধীবে ধীবে অর্থাৎ ববীন্দ্র-সাহিত্যের গভীবতব অনুশীলনেব পব থেকে—রাজেন্দ্রলালের চবিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছি।

মনে বাখতে হবে, সাধাবণ অর্থের উপবেও বাজেন্দ্রলাল অসাধাবণ ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সে অধ্যয়ন শেষ না কবে তিনি সংস্কৃত ও প্রত্ন-তত্ত্বের আলোচনায মন দিয়েছিলেন। বলতে গেলে ববীন্দ্রনাথের মতোই বাজেন্দ্রলাল ঘরে-পড়া ছেলে ও নিজে-শেখা পণ্ডিত। ববীন্দ্রনাথের মতোই বাজেন্দ্রলাল বাংলা ও ইংবেজীতে অসাধাবণ দক্ষ ছিলেন।

ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কিনা মনে নেই, বাজেন্দ্রলাল সত্যসতাই সবাসাচী ছিলেন। তাঁব প্রমাণ অনেক বিষয়েই আছে, আমাব বিচাবেব পক্ষে তাঁব সবাসাচিত্ব সর্বাধিক অভিব্যক্ত বাংলাবিদ্যায় ও ভাবতবিদ্যায়। আমাব আলোচ্য বাংলাবিদ্যায় বাজেন্দ্রলালের অগ্রগামী ভূমিকা।

ববীন্দ্রনাথের মতো রাজেন্দ্রলালও বৈষ্ণব বাড়িব ছেলে। বাজেন্দ্রলালের পবিবার গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন বলতে পাবি। তবে তাঁবা কায়স্থ। কায়স্থ পবিবাবেব পক্ষে গোঁড়ামিব ঝাঁক যতটা মূঢ় হওয়া সম্ভব, তাঁব চেয়েও মূঢ় ছিল বোধ কবি। তাঁবা আসলে, বলতে পাবি, সাহিত্যিক বৈষ্ণব-পবিবার ছিলেন। তাঁব পিতা জন্নৈজয মিত্র বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছিলেন। তাঁব পিতামহ মহাবাজা পীতাম্ব মিত্র ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা গান রচনা কবেছিলেন। 'সাহিত্যিক' বৈষ্ণব ছিলেন বলেই তাঁদেব পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবনাব প্রতি অনুৎসাহ ছিল না।

সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অতীত বস্তু যতটা গভীরভাবে তাঁর জানা ছিল তেমন আব কারো নয়। ভাবতচন্দ্র সবাই জানতেন, কাশীরাম-কৃষ্ণিবাস অনেকেই, মুকুন্দরাম কেউ কেউ, কীর্তন গান দুই এক জন, কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিব পদাবলী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচবিতামৃত’ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড়া কারো যে পড়া ছিল এমন অনুমান করবার পক্ষে কোন প্রমাণ পাইনি। সুতরাং রাজেন্দ্রলাল মিত্রই যে বাঙালীকে তাব সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন এবং হারানো খেঁই ধরিয়ে দেবেন তাতে আশ্চর্য কী?

পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যবিদ্যার গোড়া পত্তন হয় ভাষাবিজ্ঞানের বীজ ধরে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার পবিচয় পেয়ে ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। সেই ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টি তাঁদের প্রাচ্যবিদ্যার ভিত ও ইমাবত গড়তে সহায়তা কবেছিল। আমাদের প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের মনোযোগও তাই প্রথম থেকেই ভাষাবিজ্ঞানের উপর পড়েছিল। বাংলা ভাষার ভাষাবিজ্ঞানের কথা প্রথম শুনিযেছিলেন রাজেন্দ্রলালই। প্রথম কয়েক বর্ষের ‘বহু সন্দর্ভে’ (সংবৎ ১৯২০/খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৩) এ বিষয়ে তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তাব পরে দু’একটি গ্রন্থের সমালোচনাও এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য। এ কথা আমাদের অনেকেই জানা নেই। (মাপ কববেন, হয়তো এখানে উপস্থিত কারো জানা নেই। আমবা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামটি জানি, তাঁর ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’র নামও ববীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে আমাদের অপরিচিত নয়, তাঁর ‘বহু-সন্দর্ভ’ পত্রিকার নামও কারো কারো জানা থাকতে পারে। তবে আমাদের উৎসাহ ঐ পর্যন্ত, পাতা খুলে দেখা ঘটে ওঠে না, কষ্ট করে পড়া তো দূরের কথা। বলা বাহুল্য, আমি অভিযোগ কবছি না, অভিকচিব ধাত বর্ণনা কবলুম।) তাই একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

প্রথম প্রবন্ধ ‘ভাষাবিজ্ঞান’ (চতুর্থ সংখ্যা)। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত, দ্বিতীয় কিস্তি দেখিনি।

এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল পৃথিবীর মোট ভাষাসংখ্যা উল্লেখ কবেছেন ৪০০০। তিনি বলেছেন, “জার্মানী দেশ ভাষাবিজ্ঞানকে জন্মদান কবিয়াছে। ফ্রান্স তাহার শবীর দিন দিন পরিবর্তিত কবিতেছে। হমবোল্ট্ট, গ্রিম, বপ, বুনসেন, মোক্ষমূলর প্রভৃতি মহোদয়েরা অনন্যকর্মে ব্যাসক্ত হইয়া ভাষাবিজ্ঞানে মনোনিবেশ কবিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের এক্ষণে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। জার্মানী দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষিত হইতেছে।”

‘বহু সন্দর্ভে’র অষ্টম সংখ্যায় ‘আর্য্য-ভাষা’ প্রবন্ধটির আবস্ত অংশ উদ্ধৃত কবছি।

“পৃথিবীর সমুদয় ভাষা চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (১) আর্য্য-ভাষা। (২) সৈমিক-ভাষা। (৩) তুবিক-ভাষা। (৪) চীন-ভাষা। আর্য্য-ভাষা আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

“যেখানে অক্ষ ও যাক্ষার্ত নদী উদ্ভূত হইয়াছে, মধ্য আসিয়াব সেই উন্নত ভূভাগে এক

জাতি বাস করিত। তখন বেদের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ইউরোপও অন্ধ-তমসাবৃত ছিল। এই জাতিব লোকেবা আপনাদিগকে আৰ্য্য বলিয়া পবিচয় দিত এবং কৃষিকর্ম দ্বাৰা জীবিকানিৰ্বাহ কবিত। ইহাৰা হল-চালন কবিতে পারিত; বীজ বপন কবিতে জানিত, বথ্যা প্রস্তুত কবিতে পাবিত; গৃহ-নিৰ্মাণ ও অৰ্ণবযান নিৰ্মাণ কবিতে শিখিয়াছিল, এবং বস্ত্র বয়ন কবিয়া আপনাদেব অঙ্গ আবৃত বাখিত। এক হইতে শত সংখ্যা পর্য্যন্ত তাহাৰা গণিয়াছিল। গো, অশ্ব, মেঘ, কুক্কব প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু সকলকে তাহাৰা পোষিত কবিয়াছিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু সকলেব গুণাগুণ তাহাৰা অবগত ছিল। ইহাৰা লৌহাস্ত্ৰেব ব্যবহাব কবিত। ইহাৰা ভদ্রাভদ্রেব ও ন্যায়ান্যায়েব বিবেচনা কবিত, পুত্ৰকন্যাব বিবাহ দিত, আত্মীয় স্বজনেব যথাবিধি মৰ্যাদা কবিত এবং দ্বদেশাধিপতিৰ অনুগত ছিল। ইহাৰা ঈশ্ববেব সত্তা স্বীকাৰ কবিয়া, তাহাৰ আবাধনা কবিত। যাহাৰা এই কর্ম কবিতে পাবিত তাহাৰা যে সভ্যতা-সোপানে অনেক দূৰ আবোহণ কৰিয়াছিল, সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতি একেবারে নামশেষ হইয়াছে। এই জাতিব সত্তা বিষয়েও এক্ষণে অনেকে সন্দেহ কবেন।

ভাষা-বিং পণ্ডিতেবা ভাষা সমীকবণ দ্বাৰা স্থিৰ কবিয়াছেন যে, ইহাৰাই সংস্কৃতভাষী ভাবতবৰ্ষীয়, গ্রীক, বোমীয়, পারসীক, ইংবেজ, জৰ্মন্, ফবাসীস প্রভৃতি সনাতন ও ইদানীন্তন জাতিদেব পূৰ্বপুরুষ। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংবেজী প্রভৃতি ভাষা সমুদায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান কবিতেছে। তাঁহাৰা বলেন যে আৰ্যেবা জন্মভূমি পবিত্যাগ কবিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থানদ্বাৰা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন কবিয়াছে।…… তাঁহাৰা আবও বলেন যে আৰ্যেবা জন্মভূমি পবিত্যাগ কবিলে পব, একদল উত্তব দিগে ও উত্তব-পশ্চিম দিগে প্রস্থান কবিল, এবং আব এক দল দক্ষিণ দিগে আসিল। তাঁহাদেব মতে আৰ্যেবা বিভিন্ন হইবাব পব, সংস্কৃত ভাষীদেব পূৰ্বপুরুষ ও পাবসীকদেব পূৰ্বপুরুষ অনেক দিন একত্ৰ বাস কবিত। ভাষা-বিং পণ্ডিতদেব এই সকল কথা শুনিলে আমাদেব গাত্ৰ বোমাঙ্কিত হইয়া উঠে। আমবা পারসীক, ফবাসীস, প্রভৃতি জাতিদিগকে এখন স্লেচ্ছ বলিয়া মনে কবি। ইহাদেব সহিত আমাদেব কোন সংশ্রব নাই মনে কবিয়া ইহাদেব প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবি। আমরা ইহাদেব গুণাগুণ শ্ৰবণ কবিলে ঈর্ষাপবতন্ত্ৰ হই। তখন একবাবও মনে কবি নাই যে আমবা একবংশ হইতে উৎপন্ন; অতএব ইহাৰা সকলেই আমাদেব আত্মীয়; সুতবাং আত্মীয়েব ন্যায় ইহাদেব সহিত ব্যবহাব কবা উচিত।”

অতঃপব বাজেন্দ্রলাল ভাষাবিং পণ্ডিতেবা সত্য কথা বলেছেন কি আমাদেব প্রবঞ্চনা কবেছেন তা পবীক্ষা কবে দেখবাব জন্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষাব মিল দেখিযে অনেকগুলি উদাহবণ দিযেছেন। তাবপব বলেছেন, “এই সমুদয় ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ, সৰ্বনাম, উপসৰ্গ এবং অন্যান্য অনেক শব্দ একাকাব।

“এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা কবিয়া দেখিলে ভাষা-বিৎ পণ্ডিতদের কথা নিতান্ত অযুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না।”

বাংলা ভাষার নাদীজ্ঞান বাজেন্দ্রলালের যে কতটা ছিল তা বুঝতে পাবি ভুবনমোহন বায়চৌধুরীর ‘ছন্দঃকুসুম’ গ্রন্থেব সমালোচনা থেকে। আবন্তেই তিনি আলোচনা কবেছেন সাহিত্যে গদ্য আগে সৃষ্টি হইছিল না পদ্য আগে। তাবপব কবেছেন পদ্যেব বিশ্লেষণ। “এই পদ্যেব প্রধান অঙ্গ তিন : মাত্রা, রত্ন ও যতি। গুরু-লঘুব ভেদকে মাত্রা কহে, এবং নিরূপিত লঘুগুরু শব্দ একত্র মিলাইয়া ছই তিন চারি বা ততোধিক চরণ বিগুস্ত কবাব নাম রত্ন, তথা ঐ পদমধ্যে যে বিশ্রামস্থান থাকে তাহাকে ‘যতি’ কহে। এই তিন পদ্যেব শরীর, প্রাণ ও আত্মা ; এতদ্ভিন্ন কদাপি পদ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে কবেন বাঙ্গালীতে মাত্রা নাই, কেবল রত্ন এবং যতি আছে, এবং তদৃষ্টান্ত-স্বরূপ পয়াব দর্শাইয়া থাকেন, কাবণ তাহাতে চতুর্দশ অক্ষবে পদ, এবং অষ্টম অক্ষবে যতিব নিয়ম আছে, কুত্ৰাপি মাত্রাব নিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু বিবেচনা কবিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীত হয় যে পয়াবেব নিমিত্ত অক্ষব-সংখ্যা ও যতি যেকল্প প্রয়োজনীয়, মাত্রাও সেইরূপ আবশ্যক ; তদভাবে কদাপি পয়াব নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেবল বাঙ্গালীতে গুরুলঘু উচ্চারণেব তাদৃশ সাবধানতা না থাকায় গুরুস্থানে লঘু ও লঘুস্থানে গুরু কবিয়া পড়াতে অনেক অনেক মাত্রাবিহীন পদেব মাত্রাব অতীব অনুভব কবা যায় না। পবন্তু তাহাতে সে আপত্তি অক্ষব গণনাব সম্বন্ধেও কহা যাইতে পারে ; যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অনেক প্রাচীন পয়াবে চতুর্দশেব অতিবিক্ত পঞ্চদশ বা ষোড়শ অক্ষর আছে, তাহা কেবল দ্রুত উচ্চারণ দ্বাৰা চতুর্দশ সংখ্যা মান্য কবা যায়। এই অতিবিক্ত বর্ণদৃষ্টে যেমন পয়াবেব বর্ণসংখ্যাব অস্থিৰতা আছে বলা যায় না, সেই মত লঘুগুরুব অপলাপ কবিয়া পয়াবেব মাত্রা সিদ্ধ কবা যায় বলিয়া পয়াবেব মাত্রা নাই বলা উপযুক্ত নহে। ইহা স্বীকর্তব্য যে আমাদিগেব কবিবা কেহ অত্ৰাপি পবিশ্রম কবিয়া পয়াবেব মাত্রাব প্রকৃত লক্ষণ নিরূপিত কবেন নাই কিন্তু তাহাতে পয়াবে মাত্রার আবশ্যকতা নাই বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পয়াব মাত্রাভ্রষ্ট কবিলে তাহা আর পদ্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।”

বহস্য সন্দর্ভে বাজেন্দ্রলাল কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা কবেছিলেন নোটের বা টিপ্সনীর আকাবে। যেমন, কণ্ঠে শব্দের ব্যুৎপত্তি, চীনী শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভেলসা তামাক, সেব ছটাক পোষা শব্দের ব্যুৎপত্তি।

বাজেন্দ্রলাল বাংলায় কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। সেগুলির বিষয়ে গুরুত্ব আছে তবে বচনায় বিশেষ চাতুর্য নেই। বাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পেতে হলে বিবিধার্থ সংগ্রহ ও বহস্য সন্দর্ভ পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত সমসাময়িক গ্রন্থেব সমালোচনাগুলিই বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

১৭৭৯ শকাব্দের (১২৭৪ সাল) বৈশাখ সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহে বাজেন্দ্রলালের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ‘বঙ্গভাষার উৎপত্তি’ নামে। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে দু'চাব কথা বলেছিলেন তা তাঁব আগে আব কেউই বলেন নি। “চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালি পদ বচনা কবিয়াছিলেন, তাহাব কয়েকটি পদ অত্য়াপি বর্তমান আছে; ঐ পদই বঙ্গভাষাব সর্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবে।” তাব পব ফুটনোটে লিখেছেন, “সহৃদয় পাঠকদিগের গোচবার্থে বিদ্যাপতিকৃত একটি পদ ‘প্রাচীন পদাবলী’ নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে চিহ্নিত কবা গেল। বিদ্যাপতি বাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনাথায়ণের কালে বর্তমান ছিলেন।” তাব পব বাজেন্দ্রলাল, “সখি কি পুছসি অনুভব মোয” পদটি উদ্ধৃত কবেছেন।

বাংলায় সমসাময়িক গ্রন্থসমালোচনা বাজেন্দ্রলালই শুরু কবেছিলেন। তাঁব গ্রন্থ সমালোচনা প্রবন্ধগুলিতে তাঁব অকৃত্রিম সাহিত্যবোধের পবিচয় প্রকাশিত। মাইকেলের কাবানাটকের বাজেন্দ্রলালকৃত সমালোচনা দত্তকবিকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে পবিচিত কবেছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলী বইটি প্রকাশিত হবাব বেশ কিছু আগে এব থেকে দুটি কবিতা বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল।

‘দুর্গেশনন্দিনী’ব সমালোচনা প্রসঙ্গে (বহু সন্দর্ভ, খণ্ড ২১) বাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন, “যাহাব নূতন সবস মনোমুগ্ধকব গল্পের অনুবাগী; যাহাব বীর্ঘ্যবৎ বাক্যের আদবকাবী; যাহাব বিনানুপ্রাসে বচনাব চাতুর্য্য হইতে পাবে এমত জ্ঞান কবেন, যাহাব মহৎগুণে পবিতৃপ্ত হন, তাহাবা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কবিতে পাবেন; কাবণ ইহা তাহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকাবে পোষক, সন্দেহ নাই।”

‘আলালের ঘবের ঢুলাল’এব সমালোচনায় (বিবিধার্থ সংগ্রহ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪) বাজেন্দ্রলাল বইটির যেভাবে মূল্য নির্ধাবণ কবেছেন সেভাবে সমসাময়িকবা কেন পরবর্তীরাও বিবেচনা কবতে পাবেন নি—বিশেষ কবে বইটির বচনাবীতি সম্পর্কে। বিষয়ের সম্বন্ধে বাজেন্দ্রলাল যা বলেছেন, তা আবও অনেকে বলেছেন, সন্দেহ নেই। “বর্ণনা শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহাব পাঠে বর্ণিত বস্তুর প্রতিমা চিত্রপটের ন্যায় মনোমধ্যে বিকশিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের ঐ শক্তিব অভাব নাই; প্রত্যুত তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন।” আলালের ঘবের ঢুলালের ‘ভাষার সম্বন্ধে প্রায় সব সমালোচকই বিরূপ দৃষ্টি দিযেছেন, কেবল দোষই দেখেছেন, গুণের সম্ভাবনা কেউ তলিয়ে দেখেননি। সে কাজ কবেছেন বাজেন্দ্রলাল। বাজেন্দ্রলালের এই উক্তিতে বইটির ভাষা সম্বন্ধে সুস্মবিচার প্রকটিত।

“গ্রন্থকাবের লিপিপ্রণালী বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি কবিয়া থাকেন, ‘এবং বোধ হয় গ্রন্থকাব নিজোক্তিরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পবিমার্জিত করিলে

প্রশংসনীয় হইত; পবন তাঁহাব কল্পিত নাযকেবা যে যাহা কহিয়াছে তাহা অবিকল ও সর্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতব লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের অসাবধান সময়েব সামান্য কথা, কিছুবই কোন অংশে অগ্ৰথা হয় নাই। কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংবাজী পাবসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না; পবন এ গ্রন্থ কলিকাতাব ভাষায় কলিকাতাস্থদিগেব শ্লেষে লেখা হইয়াছে; সুতবাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই।”

কলিকাতাব চলতি ভাষাব বিশেষত্বেব উল্লেখ এই প্রথম শোনা গেল।

সমসাময়িক শিক্ষিত ও পণ্ডিত দেশীয় ব্যক্তিদেব থেকে বাজেদ্দলাল মিত্রেব একটা একক অসামান্যতা ছিল। তিনি ভাবতীয় সংস্কৃতি ও বাংলাব সংস্কৃতি যতটা ব্যাপক ও গভীর ভাবে অধ্যয়ন কবেছিলেন এমন আব দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কবেন নি। আর্কিওলজি থেকে ভাষাবিজ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র, প্রাচীন ইতিহাস থেকে নব্য ন্যায়—সব বিষয়েই তাঁব জাগ্রত কোঁতুল ছিল। আধুনিকতম বাংলা লেখকের রচনার মূল্য নিরূপণে তিনি যেমন বিদগ্ধতা দেখিয়েছিলেন তেমনি বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন প্রাচীন বাংলা বচনাব মূল্য বিচাবে। আগেই বলেছি, তাঁবা ছিলেন বৈষ্ণব-বংশ, বলরাম-উপাসক (?), বৈষ্ণব পদাবলী তাঁব জানা ছিল, চৈতন্য চবিতামৃত তাঁব পড়া ছিল। কিন্তু পূবানো বাংলাব শ্রেষ্ঠ কাব্য ব’লে তিনি মুকুন্দবামেব চণ্ডীমঙ্গলকেই নির্দেশ কবেছিলেন। তাঁব পবে বমেশচন্দ্র দত্তই মুকুন্দবামেব কাব্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন।

বাজেদ্দলাল সাহিত্যসৃষ্টি কবেন নি, কিন্তু সাহিত্যে তাঁব প্রবণতা ছিল, তাঁব সাহিত্যবোধ ছিল। সাহিত্য-বোদ্ধাবাই সাহিত্য-সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে বাখে। সে কাজ বাজেদ্দলাল কবেছিলেন অবাস্তবভাবে—বিবিধার্থ সংগ্রহ ও বহুস্যানন্দ পত্রিকা ছুটিব পৃষ্ঠায়। সাহিত্য-স্রষ্টাব ও সাহিত্যবোদ্ধাব একটা সাধারণ গুণ হল সহৃদয়তা। সে গুণ বাজেদ্দলালেব ছিল। সে বিষয়ে স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বচনাব ক্ষেত্রে বমাপ্রসাদ চন্দ একটি স্মরণীয় নাম। জর্নৈক সাধারণ স্কুল শিক্ষক হইতে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক-গবেষকের সন্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে এই ধরনের কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত বিবল।

কলিকাতার ডাফ কলেজ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে কয়েকটি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা কবিলার পর তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সম্ভবতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হন। এই রাজশাহীতেই তাঁহার প্রতিভা বিকসিত হইবার সুযোগ পায়।

ইতিমধ্যে নৃতত্ত্ব ও পুৰাতত্ত্বে তাঁহার অনুবাগ স্ফুৰিত হইয়াছিল। ১৯০০ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতার The Dawn নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন : ১. Some Forgotten Chapters of Early Indian History, ২. The Middle Ages of India : A History of the People, ৩. Early History of Mewar in the Light of the Latest Researches in Archæology, ৪. Rana Kumbha : A Study from Original Sources এবং ৫. Aryan Migration into Bengal. এইরূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আলোচনা কবিত্তে কবিত্তে ক্রমে বমাপ্রসাদ নৃতত্ত্বে অনুবাগী হন।

১৯০৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই-এর East and West পত্রিকায় বমাপ্রসাদের নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় : ১. Earlier and Later Indo-Aryan Migrations, ২. Race and Caste, ৩. India and Babylonia, ৪. The Study of Indian Social History, ৫. The Origin of the Bengali People, ৬. The Hindus and the Non-Hindus, ৭. Brahmavadinis, ৮. Widow Remarriage in Bengal. ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীঃ) রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি বাঙালী জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলেন। উহার ফলে দীঘাপতিয়ার বিজ্ঞানসাহী কুমার শবৎকুমার রায় মহাশয় বমাপ্রসাদকে ঐ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা কবিত্তে উৎসাহ দেন। পর বৎসর সম্মেলনের ভাগলপুর অধিবেশনে তিনি জাতিতত্ত্বের আলোচনামূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধসমূহে আলোচিত কোন কোন বিষয় পরে তাঁহার Indo-Aryan Races সংজ্ঞক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

শবৎকুমার এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া রমাপ্রসাদ রাজশাহী জেলার নানা স্থান হইতে পুৰাবস্তুর সংগ্রহকার্থে আত্মনিয়োগ করেন। অচিরে কতকগুলি প্রাচীন মূর্তি সংগৃহীত হওয়ায় তাঁহাদের উৎসাহ বর্ধিত হয় এবং এইরূপে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীতে অধুনা প্রসিদ্ধ ববেল্ল অমুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশালার সূত্রপাত হয়। শবৎকুমার সমিতির প্রেসিডেন্ট, অক্ষয়কুমার ডাইবেক্টার এবং রমাপ্রসাদ জেনারেল সেক্রেটারি হইলেন। পুৰাবস্তুর সংগ্রহ চলিতে লাগিল। কতকগুলি পুস্তকও ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীঃ) ববেল্ল অমুসন্ধান সমিতি হইতে রমাপ্রসাদের ‘গৌড়বাজমালা’ এবং অক্ষয়কুমারের ‘গৌড়লেখমালা’ প্রকাশিত হয়।

রমাপ্রসাদের ‘গৌড়বাজমালা’ প্রকাশিত হইলে, বাঙালী ঐতিহাসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হইল। কারণ শুদ্ধমাত্র শিলালেখ ও তাম্রশাসনের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন বাংলা ইতিহাস বচনাব শৈলী তিনিই সর্বপ্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন। ‘গৌড়বাজমালা’ ৭৭ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ, সূচীপত্র বা নির্ধণ নাই। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাতে বচনাবিপাটের কিছু অভাব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে এই দীর্ঘ ৬২ বৎসবে বহু সংখ্যক নূতন শিলালেখ ও তাম্রশাসন এবং পালবংশের রাজত্বকালে অনুলিখিত কতিপয় পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় রমাপ্রসাদের মতামত কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি পালবংশীয় ধর্মপালের রাজ্যাবস্তু ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, ধর্মপাল প্রায় ৪০৮৫ বৎসব পূর্বে সিংহাসন লাভ করেন এবং ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বেই যত্নাযুগে পতিত হন। রাষ্ট্রকূটবাজ তৃতীয় গোবিন্দের নৈসবিকা শাসন হইতে জানা যায়, ৭২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বেই তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। ইহাব ৩৪ বৎসব পূর্বে গোবিন্দের উত্তর-ভাবত অভিযানকালে ধর্মপাল ও চক্রাযুধ তাঁহাব শরণ লন এবং তাহাবও পূর্বে ধর্মপাল কর্ণোজ-পতি ইন্দ্রাযুধ ও গুর্জর-প্রতীহার বংশের সহিত দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ধর্মপাল যে ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্বে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, বলগুদব লেখের তারিখ হইতে গণিত মদনপালের রাজ্যাবস্তু (অর্থাৎ ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে পূর্ববর্তী পালবাজগণের পবিজ্ঞাত ও আনুমানিক রাজ্যকালের হিসাব হইতেও তাহা বুঝা যায়। যাহা হউক, ইহা সত্ত্বেও বাঙালী ঐতিহাসিক সমাজে ‘গৌড়বাজমালা’র মর্যাদা আজ পর্যন্ত বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ইহাব কাবণ এই যে, গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ইতিহাস বচনাব বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বীতি অনুসৃত হইয়াছিল।

ঐ একই সময়ে নগেন্দ্রনাথ বসু নামক আর একজন সুবিখ্যাত বাঙালী পুরাতত্ত্ববিদ প্রাচীন বাংলা ইতিহাস বচনা করিতেছিলেন। তাঁহাব ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’

সংজ্ঞক বিবাহি গ্রন্থের 'বাজন্যকাণ্ড' শীর্ষক অংশ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে পবিত্বেদ-বিভাগ, বিস্তৃত সূচীপত্র ও বর্ণানুক্রমিক নামসূচী আছে। শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতির ব্যবহারেও ইহাতে অবহেলা দেখা যায় না। ৩৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'বাজন্যকাণ্ড' বমাপ্রসাদের 'গৌড়বাজমালা' অপেক্ষা পাঁচ গুণ বৃহৎ। কিন্তু কতকগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলাব ইতিহাস বচনায় নগেন্দ্রনাথের 'বাজন্যকাণ্ড' আজ একরূপ বিস্মৃত ও অবহেলিত। ইহাব প্রধান কাবণ এই যে, নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুলপঞ্জিকা সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীকে প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসনের সমমর্যাদাব ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ কবিয়াছেন। বমাপ্রসাদই সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন যে, বাংলা কুলপঞ্জিকাগুলি প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পববর্তী ঐতিহাসিকগণ এই মত গ্রহণ কবিয়াছেন এবং ইহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তা ও ঐতিহাসিক-গবেষক হিসাবে বমাপ্রসাদের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

"গৌড়বাজমালা"র প্রকাশে বমাপ্রসাদ যে খ্যাতিলাভ করেন, ইহা অনেকটা বাঙালী ঐতিহাসিক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। চাবি বৎসর পূর্বে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেবেল অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক তাঁহার 'Indo-Aryan Races' সংজ্ঞক নৃতত্ত্ববিষয়ক ইংবেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি ইংবেজী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে সমাদরের সহিত গৃহীত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূরব্যাপী এবং দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাব ফলে গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম হয়। গ্রন্থখানির সমালোচনায় বিশ্ববরেণ্য ভাবতবিদ্যাবিদ কীথ সাহেব লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Journal of the Royal Asiatic Society Of Great Britain and Ireland (1917) পত্রিকায় বলেন :

This forms a valuable addition to the literature dealing with the origin of the Indo-Aryan peoples....His opinions gain greatly both in value and clearness from their ordered exposition; and whatever conclusions he arrived at as regards his main theses, all interested in the question must recognise the catholic character of his erudition, and the ingenuity and effectiveness of his arguments which render his work a serious contribution to the subject with which it deals.

বমাপ্রসাদের Indo-Aryan Races গ্রন্থের একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ভারতীয় নৃতত্ত্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের নৃতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনার্যশ্রেণীর অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মের উপর অনার্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এখন অনেকেই তাহা মোটামুটি সমর্থন করেন। গ্রন্থখানিতে নৃতত্ত্ববিদ্যায় মাপজোক-বিষয়ক প্রশংসার সহিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদির বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানে বমাপ্রসাদ অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন

কৰিয়াছিলেন। ইহাতে নৃতত্ত্ববিদ বমাপ্ৰসাদেৰ সহিত পুৰাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক বমাপ্ৰসাদকে একত্ৰ দেখিতে পাওঁয়া যায়।

Indo-Aryan Races প্ৰকাশিত হইবাব এক বৎসবেৰ মध्ये ১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দে বমাপ্ৰসাদ ভাৰত সৰকাৰেৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগেৰ গবেষক স্কলাৰ হিসাবে গৃহীত হন। এই সময় তিনি সাধী চিত্ৰশালাৰ পুৰাবস্তুৰ তালিকা-বচনায় অংশ গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি Dates of the Votive Inscriptins on the Stupa of Sanchi এবং Archaeology and Vaishnava Tradition সংজ্ঞক দুই খানি পুস্তক বচনা কৰিয়া তদীয় পাণ্ডিত্যেৰ খ্যাতি বৰ্ধিত কৰেন। এই পুস্তকদ্বয় যথাক্ৰমে পুৰাতত্ত্ব বিভাগেৰ Memoir No. 1 (1919) এবং Memoir No. 5 (1920) হিসাবে প্ৰকাশিত হইয়াছিল।

১৯১৯ খ্ৰীষ্টাব্দে বমাপ্ৰসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ নব প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰাচীন ভাৰতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচাৰাব নিযুক্ত হন। অতঃপৰ বিশ্ববিদ্যালয়েৰ নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হইলে তঁহাকে উহাৰ বিভাগীয় প্ৰধান নিয়োগ কৰা হয়। কিন্তু শীঘ্ৰেই তিনি ভাৰত সৰকাৰেৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগেৰ পদস্থ কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ খ্ৰীষ্টাব্দে বমাপ্ৰসাদ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ কৰিয়া কলিকাতা চিত্ৰশালাৰ পুৰাবস্তু শাখাৰ সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে যোগদান কৰেন। অতঃপৰ তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা কৰিয়াছিলেন :

১. The Beginnings of Art in Eastern India with Special reference to the Sculptures in the Indian Museum ;
২. The Indus Valley in the Vedic Period ;
৩. Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley ;
৪. Exploration in Orissa.

এই চাৰিখানি পুস্তক যথাক্ৰমে পুৰাতত্ত্ব বিভাগেৰ Memoir No 30 (1927), Memoir No. 31 (1926), Memoir No. 41 (1929) এবং Memoir No. 44 (1930) হিসাবে প্ৰকাশিত হয়। এ স্থলে বমাপ্ৰসাদেৰ প্ৰাচীন সিন্ধুসভ্যতা-বিষয়ক একটা অভিমত সম্পৰ্কে মাৰ্শাল সাহেবেৰ উচ্ছসিত প্ৰশংসাবাহীৰ উল্লেখ কৰা যাইতে পাৰে। তঁহাৰ সুবিখ্যাত Mohenjodaro and Indus Civilization গ্ৰন্থেৰ একস্থলে মাৰ্শাল বলিয়াছেন : Luke Saivism itself, Yoga had its origin among the pre-Aryan population, and this explains why it was not until the Epic Period that it came to play an important role in Indó-Aryan religion. Even before the discovery of this seal (M. I. C. XII. 17), Rai Bahadur Rama Prasad Chanda had pointed out that the head of the male statue from Mohenjodaro illustrated in Pl. XCVIII has its eyes concentrated on the tip of the nose, and had

concluded—with remarkable intuition—that it was portrayed in an attitude of Yoga.

রমাপ্রসাদের বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পুৰাতত্ত্ব বিভাগে বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ১. The Visvantara Jataka at Bharhut (1921-22), ২. The Mathura School of Sculpture (1922-23), ৩. The Lingaraja or the Great Temple of Bhubaneswar (1923-24), ৪. The Svetambara and Digambara Images of the Jains (1925-26) এবং ৫. Excavations at Sarnath (1927-28) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা পূর্বাঞ্চলের পুৰাতত্ত্বের উপর রমাপ্রসাদ যে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাব স্বীকৃতিস্বরূপ ময়ূরভঞ্জ দবাব-কর্তৃক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বমাপ্রসাদের নামে Bhanja Dynasty of Mayurbhanj and their (its) Capital Kheiching সংজ্ঞক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ১৯২২-২৩, ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণী এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা গবেষণা সমিতির পত্রিকা হইতে বমাপ্রসাদের মূল্যবান প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

নানা পত্রিকায় বমাপ্রসাদের আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রত্নলিপিতত্ত্ব ও লেখবিজ্ঞা-বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১. Dinajpur Pillar Inscription [Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1911] ;
২. Inscriptions on Two Patna Statues in the Indian Museum [Indian Antiquary, 1919] ;
৩. Some Unpublished Amaravati Inscriptions [Epigraphia Indica, 1919-1920] ;
৪. Taxila Inscription of the year 136 [Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1920] ; ইত্যাদি।

১৯৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি-রূপে বমাপ্রসাদ ‘মূর্তি ও মন্দির’ শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর পরে বমাপ্রসাদ বিশ্বনৃত্যসম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডনে যান। তাহাব স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেই সময় তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে কতকগুলি ভারতীয় মূর্তি পরীক্ষা করেন এবং মিউজিয়াম-কর্তৃপক্ষের অনুবোধে অসুস্থ শরীরেও কর্তব্যবোধে Medieval Indian Sculptures in the British Museum সংজ্ঞক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। মিউজিয়ামের জনৈক কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি উহাব ভূমিকা লিখিয়াছিলেন : The full explanations given of the various motifs will be widely welcomed, The subjects

depicted in the sculpture reliefs are so complex that, without some instruction in their meaning, the spectator is liable to be robbed of part of his pleasure by sheer bewilderment. When he understands the incidents depicted, as he will do after reading the stories told by the Rai Bahadur, he will be able to enjoy whole-heartedly the singular beauty of the Indian sculptor's work and to appreciate the enthusiasm which inspired this monograph.

ব্ৰিটিশ মিউজিয়মেৰ কৰ্তৃপক্ষ যে সুযোগ্য ব্যক্তিব হস্তেই উল্লিখিত গ্ৰন্থ বচনাৰ ভাব দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪২ খ্ৰীষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটিবাব কয়েক বৎসৰ পূৰ্বে বমাপ্ৰসাদ Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy : Vol. I (1938) সম্পাদনে অংশ গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন।

উপৰেৰ আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, বমাপ্ৰসাদ প্ৰধানতঃ নৃতত্ত্ব, পুৰাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ ও ধৰ্মজীবন, মূৰ্তিবিদ্যা ও লেখতত্ত্ব সম্পৰ্কে অনুবাগী ছিলেন। তাঁহাৰ কৰ্মময় জীৱনে তিনি এই সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে অনলসভাবে সাধকেৰ ন্যায় গবেষণাকাৰ্য্যে ব্ৰতী ছিলেন। পাণ্ডিত্যেৰ জন্ম তিনি বিদ্বৎসমাজে সম্যক্ৰূপে সমাদৃত হন এবং ভাৰতীয় নৃতত্ত্ব ও পুৰাতত্ত্ববেত্তাদিগেৰ মध्ये শীৰ্ষস্থানীয়গণেৰ অন্যতম ৰূপে স্বীকৃত হন।

প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ

শ্রীঅজীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক জাতি, দেশ অথবা সমাজের জীবন ইতিহাসে এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়, যখন তাহাদের শত শত শতাব্দীর সুপ্ত মনীষা, মেধাবী সন্তানদের প্রচেষ্টায় সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় অপরিমেয় দানের দ্বারা মানবসমাজে পবিচিত্রিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক, বাংলাব এবং বাঙ্গালীর সেই মহাশুভলগ্ন। ১৮৫৭ অব্দে মিউটিনীর দাবদাহ, ভাবতীয় প্রাণ, ভাবতীয় শোণিত, মেদ, মজ্জায় নির্বাপিত হইলে, পূর্বভাবতে এক নবযুগের প্রভাত হয়। অবশ্য এই জীবনের সূত্রপাত বাজা বামমোহন হইতে, কিন্তু এই সময় হইতে বিদেশী পদানত বাংলা কাব্যে, গদ্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, চিত্রে এবং ভাস্কর্যে যে প্লাবন আবদ্ধ কবিষাছিল তাহাব প্রবাহ ১৯৪৬ অবধি প্রবাহিত থাকে। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের কাহিনী আলোচনা কবিবাব পূর্বে আর একটি চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সপ্তবিংশ বৎসর অনুপস্থিত থাকার পর মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন কবিষা দেখি বাংলাব বর্তমান যুগের যুবকরূন্দের ধাবণা যে তাঁহাদের দাবিদ্র্য, তাঁহাদের সকল চুর্দশা এবং অসাফল্যের কারণ। রমাপ্রসাদ চন্দ্রের আজীবন কঠোর সংগ্রাম এই ভ্রমাত্মক ধাবণা খণ্ডন করে। মেঘনা, কবতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা-ধৌত পূর্ববঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে মধ্যবিত্ত পবিবাবে জন্মগ্রহণ করিয়া—সামাজিক, অর্থনৈতিক, সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম কবিষা স্বকীয় মেধা ও বুদ্ধিবলে কিরূপে নিখিল বিশ্বের পণ্ডিতসমাজে ববেণ্য হওয়া যায়—ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিদ এবং কলাবসিক বাসবাহাত্তব রমাপ্রসাদ চন্দ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন কর্মযোগী। তাঁহাব এক পুত্র আমাব অন্যতম সহপাঠী অতুলপ্রসাদ চন্দ এবিষয়ে পিতার পদানুসরণ কবিয়াছিলেন। বর্তমান তরুণ-সমাজের ন্যায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীব ন্যায় বসিয়া থাকেন নাই।

রমাপ্রসাদের শিক্ষাও যৌবনকালে কেবল বাংলা কেন ভাবতের ইতিহাস তমসাস্কন্ন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতিদুঃখে বলিয়াছিলেন—‘মাওবী জাতিব ইতিহাস আছে, গ্রীনল্যাণ্ডের ইতিহাস আছে কিন্তু বাঙালীব ইতিহাস নাই।’ বড় দুঃখে কান্তকবি গাহিয়াছিলেন—

‘সেথা আমি কি গাহিব গান

যেথা গভীর ওঙ্কাবে সাম ঝঙ্কাবে

কাঁপিত দূব বিমান।’

রমাপ্রসাদ চন্দ বাংলা সাহিত্যেব এই দীনতা হ্রাস কবিবাব প্রথম ‘যাজিক’। দেবী সরস্বতী অকুণ্ঠ হস্তে তাঁহাকে ববদান কবিয়াছিলেন। অবিভক্ত বাংলাব বিজ্ঞানসম্মত

প্রণালীতে বচিত ইতিহাস তাঁহার দ্বারা প্রণীত। কেবল তাহাই নহে, যতদিন জীবিত ছিলেন অলকানন্দার অমিয় ধারাব গায় তাঁহার লেখনী সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্মীয় ব্যাপারে, প্রাচীন ভাস্কর্যে, বাস্তবতত্ত্বে, পুৰাতত্ত্বে অজস্র প্রবন্ধ বচনা কবিতা গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোজি লাঘব কবিতার জন্য বিংশ শতাব্দী হইতে যে সকল বাঙ্গালী তরুণ নিজেদের উৎসর্গীকৃত কবিতাছিলেন, বমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহাদের পুৰোধ। কেবল তাহাই নহে, তিনি চারুণ কবি। তবে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহার লেখ-মালায় কবিকল্পনাপ্রসূত একটি বাক্যও নাই। মহাবাজ জগদীন্দ্রনাথ বায়ের ভাষা সম্বন্ধে বাখালদাস লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার লেখা গড়ে কাব্য। বমাপ্রসাদ চন্দ সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। আমি তাঁহার জীবনসায়াছে অনেক ইংবেজী এবং বাংলা পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলাম। সুতরাং জানি যে, প্রতিটি বাক্য সুনির্বাচিত কবিতার অসীম প্রচেষ্টা। যেন একটি ছন্দোবদ্ধ গাথা। ইহার একমাত্র কাবণ তাঁহার কর্মনিষ্ঠা এবং কর্তব্যজ্ঞান—যাহার সীমা-পরিমীমা ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষ হইতেই তরুণ বমাপ্রসাদের সাধনাব আরম্ভ। তখন এই কলিকাতা নগরীতে 'Dawn' নামক একটি ইংবেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ইহার আগষ্ট মাসের সংখ্যায় তাঁহার 'Some Forgotten Chapters of Early Indian History' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল। বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার উপর উত্তর ভাবে অর্নেকোব অবস্থার এইরূপ সুন্দর তথ্যপূর্ণ বচনা আব লিখিত হয় নাই। ইহা ইতিহাস আলোচনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বর্ণাচ্য ভাষাও অপূর্ণ। তাহার পর্বের ২ সংখ্যায় তিনি আবও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। যথা—

(ক) The Middle Ages in India : a History of the people.

(খ) Early History of Mewar in the light of recent researches.

(গ) Rana Kumbha—A study from original sources.

(৮ বায়বাহাদুর হববিলাস সর্দার অর্ধশতাব্দীর পূর্বে)।

(ঘ) Aryan Migration into Bengal.

তাঁহার পব লেখ-মূর্তি, বাজ্জনৈতিক ইতিহাসের উপরে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পব ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয় 'গৌড়বাজমালা'। কোঁম গৌড় ববেন্দ্রীর মানসসন্তান নিজ পিতৃভূমির উপব কেবলমাত্র শিলালিপি এবং পট্টোলীর উপব নির্ভব কবিতা ইতিহাস বচনা করেন। ইহার পূর্বে ইংবেজী এবং বাংলায় আব কোনও গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ইতিহাস-চর্চাব সহিত তাঁহার অনুশীলনের প্রভেদ এইখানেই। তিনি উপাখ্যান, কুলুজী এই সকল উপাদানের উপব নির্ভব না কবিতা বাংলাব প্রথম পুৰাতাত্ত্বিক ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। দেশপ্রেম স্বাভাবিক, কিন্তু শতাব্দীর

প্রথম দশকে তিনি Bury, Lord Acton, Mommsen, Grote প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাস-নিষ্ঠায় অবিচল থাকিয়া বাঙ্গালী ইতিহাস-বেত্তাদের মধ্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন।

‘Four Ancient Yaksha Statues’ নামক প্রবন্ধে আমবা আবাব তাঁহাকে নবীনরূপে দেখিতে পাই। বৌদ্ধ পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের সহিত লিপিতত্ত্বের বিচার দ্বারা তিনি ভাবতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে নবযুগের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। পববর্তী জীবনে তিনি আব ও নব নব পুষ্প আহরণ করিয়া ভাবতীয় অনুশীলনের অনেক নব নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাব মধ্যে উডিয়াব মধ্যযুগের ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলোচনা তিনিই প্রথম শুরু করেন। “কব” অথবা ভোমবাজবংশের অপকণ শিল্প-প্রতিভা তাঁহাব জন্মই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে স্বীকৃতি পায়। আজ তাঁহাব দুই সহচর পবমানন্দ আচার্য এবং ডাঃ অচ্যুতকুমার মিত্র কেহই জীবিত নাই। ঐতিহাসিক বিভাগে বমাগ্রসাদের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইতেছে যে তাঁহাব জ্ঞানের পবিধি কেবলমাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অসীম ও অনন্ত জ্ঞানার্ণবের বেলাতটে তিনি বহু শিলাখণ্ড সংগ্রহ কবিত্তে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অত্যধিক মূল্যবান হইত। তিনি একাধারে নৃতত্ত্ববিদ, পুৰাতত্ত্ববিদ এবং পালি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়াব জন্য ভাবতীয় ইতিহাসে গভীর পাণ্ডিত্য আনয়ন কবিত্তে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে তাঁহাব Indo-Aryan Races। ভাবতীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাবিষয়ক অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁহাব গবেষণাব তুলনা নাই। অথর্ববেদে প্রাপ্ত তথ্যাদিব দ্বারা তিনি তাম্রযুগের ভারতের মানবসমাধিব উপর একটি গ্রন্থ বচনা করেন। পুৰাতাত্ত্বিক প্রমাণাদিব উপর নির্ভর কবিলেও এই গ্রন্থটি ভাবতীয় ঐতিহাসিক গবেষণাব ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবিত্তে সক্ষম হয়। সিন্ধু সভ্যতাব ধর্ম সম্বন্ধে, যোগের অস্তিত্ব, পাণ্ডপত-শিবের তত্ত্বব্যাখ্যা নিখিল বিশ্বের পুৰাতত্ত্ববিদগণের স্বীকৃতিলাভ কবিয়াছিল। তাঁহাব ভাষায় বলিতে হয় যে. পদ্মা, মেঘনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, কবতোষা, মহানন্দা, আত্রেয়ী, গঙ্গা, পুনভবা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপমহাদেশের মানবসভ্যতাব প্রদোষ হইতে যুগে যুগে. আমাদের পূর্বপুরুষেরা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ও সৃষ্টিশক্তিব প্রকাশ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সব কোন যুগেই ইতিহাস সংকলনে বমাগ্রসাদের বচনাব অভাব নাই। তিনি ভাবতবর্ষে প্রথম অনুভব কবিয়াছিলেন যে প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, তামিল সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রাচীন হিন্দু শিল্প, ভাস্কর্য, বাস্ততত্ত্ব এবং চিত্রকলাব ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শিল্পে, সমাজের বাহ্য ও অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিস্তিত হয়। ভাস্কর্যে এবং চিত্রকলায় ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধার্মিক জীবনের সহস্র

সুহৃৎ উপাদান বঞ্চিত আছে। কেবল বাঙালীর মনীষা ও মেধা দ্বারা সংকলনের জন্য শরীরী ন্যায় অনন্তকালে প্রতীক্ষমান। তিনিই প্রথম মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে জাতিব মুক্তিব জন্য প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষাব পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা কবিত্তে হইবে বাংলা সাহিত্যকে। আকাব এবং নিবাকাবের প্রশ্নে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর্থাবত বাসীব প্রতিমাপূজা ঠিক পৌত্তলিকতা নহে। অর্থাৎ প্রতিমাকে দেবতা বা ঈশ্বর নামে পূজা নহে; হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধদের দেবদেবীব, মহাপুরুষগণের প্রতিমা উপাসনাবীতির আদর্শস্বরূপ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ বা ধ্যান-ধাবণা মোক্ষ-দায়ক এবং জ্ঞানলাভেব একমাত্র উপায়, অবর বা পববর্তীকালেব লোকেবা যাহা দেখিয়া এবং পড়িয়া ও শুনিয়া অতীন্দ্রিয় জগতেব সন্ধান পায়। রমাপ্রসাদেব প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাহাব বিচাব এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কবা অসম্ভব। তবে বাঞ্চালদাসের স্বর্গাবোহণেব পব তিনি ‘প্রবাসী’তে তাঁহাব স্মৃতিতর্পণে যে মন্তব্য কবেন, সেই মন্তব্য বয়োজ্যেষ্ঠ বমাপ্রসাদেব পক্ষেও প্রযোজ্য। তাঁহাব মৃত্যু নাই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, অমব এবং অজেন্ন। আজ বাঙালী জাতিব অধঃপতিত যুগসন্ধিক্ষণে অনুপ্রেরণা দিবাব জন্য তাঁহার আত্মা, তাঁহার প্রাণ অবিনশ্বর হইয়া বাংলাব মাটিতে, বাংলাব জলে, বাংলাব বায়ু, বাংলাব ফলে বিচুমান। আশা কবা যায় যে শত বৎসব পবে বাংলাব ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তা কবিগুরুব ভাষায় বলিতে পাবিবেন :

‘এনেছিলে সাথে কবে

মৃত্যুহীন প্রাণ

মবণে তাহাই তুমি

কবে গেলে দান।’

আশৈশব বমাপ্রসাদেব স্নেহে লালিত হইয়াছি। তাঁহার স্মৃতিচাবণেব এই সুযোগ যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়াছেন তাহাব জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

আমাদের Studies in the Religious Life of Ancient and Medieval India সংগ্রহ গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাব চন্দ্রবংশীয় রাজগণের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা অবগত আছেন যে, চন্দ্রবাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের সীলমোহবে প্রাচীন যুগদাবে (অর্থাৎ বর্তমান সাবনাথে) ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তন বা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচাৰের ত্রোতক দুইটি যুগের মধ্যবর্তী চক্রচিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। আবার চন্দ্ররাজাদিগের অনেককেই ‘পরমসৌগত’ অর্থাৎ সুগত বা বুদ্ধের পরম ভক্ত বলা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনাদিও ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ্য কবিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, চন্দ্রবংশের লডহচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামক শেষ নবপতিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ কবিয়াছিলেন। ঐ নৃপদ্বয়ের মধ্যে লডহচন্দ্র বৈষ্ণব এবং গোবিন্দচন্দ্র শৈব ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে বিষ্ণুভট্টাবক এবং শিবভট্টাবককে উদ্দেশ্য কবিয়া শাসন দান কবিতেন, ইহা তাঁহাদের ময়নামতী শাসন হইতে জানা গিয়াছে। অবশ্য গতানুগতিকভাবে তাঁহাদিগকে ‘পরমসৌগত’ বলা হইয়াছে; কিন্তু লডহচন্দ্র স্বনাম অনুসারে লডহমাদ্ব সংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তদুদ্দেশ্যে ভূমি দান করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র তদীয় উপাশ্রয় নটেশ্বর নামক নটরাজ শিবের উদ্দেশ্যে শাসন দান কবিয়াছিলেন। আবার লডহচন্দ্র বাবাণসী ও প্রয়াগতীর্থে গিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ কবিয়াছিলেন। এই দুইটিই হিন্দুতীর্থ। এতদুপলক্ষে তিনি বাবাণসীর বৌদ্ধতীর্থ যুগদাবের নাম উল্লেখ কবেন নাই।

চন্দ্রবাজগণের ন্যায় বাংলা ও বিহারের পালবংশীয় নবপতিগণও বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারাও ‘পরমসৌগত’ বলিয়া পবিচিত ছিলেন এবং ধর্মচক্রমুদ্রা ব্যবহার কবিতেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা বর্ণাশ্রমে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং হিন্দু দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানে দ্বিধা কবিতেন না। দেবপালের মুদ্রের তাম্রশাসনে ধর্মপালের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—বর্ণানু প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্মে। খালিমপুর শাসন অনুসারে ধর্মপাল ভগবান্ নম্ননারায়ণ সংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তি উদ্দেশ্যে গ্রামদান কবিয়াছিলেন। মদনপালের মনহলি শাসনে বাজমহিষী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভাবত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণ বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদানের কথা আছে। তাই পণ্ডিতগণ স্থির কবিয়াছেন যে, পাল আমলে পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপারটি শুধু এইটুকু নহে। আমরা এখন দেখিতেছি যে, কোন কোন পাল-নবপতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ কবিয়াছিলেন।

এ সম্পর্কে একটি বিষয় বহুদিন পূর্বে জানা গিয়াছিল, যদিও ঐতিহাসিকেরা উহার প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পালবংশীয় নবপতি নারায়ণপাল আনুমানিক ৮৫৫-৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক শত বৎসব পূর্বে তাঁহার ভাগলপুর তাম্রশাসন প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত তাঁহার আব কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। বিশেষ লক্ষ্য কবিরার বিষয় এই যে, ঐ শাসনে নারায়ণপালকে ‘পবনসৌগত’ বলা হয় নাই এবং এতদনুসারে বুদ্ধের পরিবর্তে শিবভট্টাবককে উদ্দেশ্য করিয়া তৎকর্তৃক তীরভুক্তিব (অর্থাৎ বর্তমান তিব্বত বা উত্তর বিহারের) অন্তঃপাতী কঙ্কবিষয়েব মুকুতিকা গ্রামটি দান করা হইয়াছিল। শাসনে বলা হইয়াছে যে, রাজা নারায়ণপাল স্বয়ং কলশপোত নামক গ্রামে এক বিশাল সহস্রায়তন মন্দির নির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে ভগবান শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঐ দেবতা ও মন্দিরের পরিচালক পাশুপত আচার্য পরিশ্রমেব উদ্দেশ্যে গ্রামটি দান করিয়াছিলেন। কলশপোত গ্রাম উত্তর বিহারের মুকুতিকা গ্রামের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রদত্ত গ্রামের আশ্রয় হইতে দেবতার পূজা ইত্যাদি, দেবমন্দিরটিব সংস্কার এবং শৈব সাধুগণের ভোজন, ঔষধপত্র প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উপরে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহাতে তাঁহাকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি উত্তরবাংলায় পালযুগেব একটি নূতন শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে নারায়ণপালের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রথম মহীপাল এবং তৎপুত্র নয়পালের ধর্মমতের উপর নূতন আলোকপাত হইয়াছে। প্রশস্তিটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। উহার প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

নবাবিস্কৃত প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীতে উত্তরবাংলায় একটি সুবিশাল শৈবমঠ ছিল। ইহার প্রধান আচার্য ছিলেন বিজ্ঞাশিব। তাঁহার শিষ্য ধর্মশিব এবং ধর্মশিবের শিষ্য ইন্দ্রশিব। এই শৈবাচার্য ইন্দ্রশিব সম্পর্কে প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে—

যস্মৈ কাঞ্চনপুঞ্জমঞ্জুচিত-প্রাসাদমেক-সুবৎ-

কৈলাসাত-মঠন্দাবিহ মহীপালো নৃপশত্ৰুবিং ।

অর্থাৎ শৈবাচার্য ইন্দ্রশিবকে পালবংশীয় প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৯০-১০৪০ খ্রী) একটি সুবহুৎ মঠ দান করিয়াছিলেন। ইহাকে পবে শিবাধ্যুষিত ভবানীর মন্দির বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, মহীপাল স্বয়ং একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া ইন্দ্রশিবকে উহার প্রধান আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা যে মহীপালের শৈব ও শাক্ত ধর্মানুগবে প্রমাণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুবাদ অনেকটা তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণপালের শৈবধর্মাবলম্বিত্বের অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মহীপালের তাম্রশাসনগুলিতে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। তবে

সেগুলি তদীয় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বের প্রথম দিকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতবাং তিনি বাজত্বের শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মে বীতস্পৃহ হইয়া শিব ও শক্তি-উপাসনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানে কোনো বাধা নাই।

প্রশস্তিতে দেখা যায়, মহীপালের পুত্র নমপাল (আনুমানিক ১০৪০-৫৫ খ্রী) পিতার শৈবধর্মে অনুবাগ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রশিবের শিষ্য ছিলেন শৈবাচার্য সর্বশিব। তাঁহার প্রসঙ্গে প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে—

বাজঃ শ্রীনমপালস্য গুরুন্তত্ববিদাংবরঃ।

শ্রীমান্ সর্বশিবন্তস্য শিষ্যো' ভূত্বগং ভুবঃ ॥

অর্থাৎ শৈবাচার্য সর্বশিব পালবংশীয় নরপতি নমপালের গুরু ছিলেন। সুতবাং দেখা যাইতেছে, বাজা নমপাল প্রকৃতপক্ষে শৈব ছিলেন।

তিব্বতীয় কিংবদন্তীতে যে নমপালের হস্তে চেদিবাজ কর্ণের পবাজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহাতে পালনৃপতিকে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত নমপালের কোনো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন পাওয়া গেলে উহা হইতেই তাঁহার ধর্মমতসম্পর্কিত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। অবশ্য গতানুগতিকভাবে তাঁহাকে 'পবমসৌগত' অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত বলিলে, তাহা হইতে প্রকৃত সত্যনির্ণয় করা সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু আমবা উপরে দেখিয়াছি যে, নারায়ণপালের ভাগলপুত্র শাসন এবং লডহচ্ছত্র ও গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনাবলী হইতে প্রকৃত অবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সর্বশিব সম্বন্ধে আবও বলা হইয়াছে—

বেনাবর্জিতগৌড়বাজগুণকতালক্ষ্মীর্নিজভ্রাতবি

শ্রীমমুর্তিশিবে নিবেশ্য বিপিনাবাসং স্বয়ং বাঙ্খতা।

অর্থাৎ বুদ্ধবয়সে সর্বশিব গৌড়বাজ নমপালের গুরুব আসন আপন ভ্রাতা ও শিষ্য মূর্তিশিবকে দিয়া স্বয়ং তপস্কার্য বনগমন করেন। সুতবাং নমপাল প্রথমে সর্বশিবের শিষ্য এবং পরে শৈবাচার্য মূর্তিশিবের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। অতঃপর লেখাটিতে সর্বশিবের শিষ্য এবং মূর্তিশিবের বন্ধু রূপশিব নামক শৈবাচার্য মূর্তিশিবের মূর্তি নির্মাণ ও প্রশস্তিবচনা করাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আচার্যের মূর্তিটি অবশ্যই উল্লিখিত মন্দিরে স্থান পাইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা ভারতের অন্যত্র অনেক আছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অপর কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদি-মধ্য যুগের ভারতবর্ষে ধর্মবিষয়ক উদাবতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাই একই ব্যক্তিকে অবস্থা-বিশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রূপে বর্ণনা করা অসম্ভব ছিল না। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই বংশের একাধিক নরপতিদে

একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবতাব ভক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত ধারণা সত্য হইলে, উহা সম্ভব হইত না। পুণ্ড্রভূতিবংশে প্রভাকববর্ধন ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজ্যবর্ধন পবনসৌগত এবং কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন পরমমাহেশ্বর ছিলেন। এইরূপ গুর্জবপ্রতীহার বাজবংশে দেবশক্তি ভক্ত ছিলেন বিষ্ণুব; তৎপুত্র বৎসরাজ মহেশ্বরের; তাঁহার পুত্র নাগভট ভগবতীব; তাঁহার পুত্র বামচন্দ্র সূর্য্যেব এবং তৎপুত্র ভোজ ভগবতীব। বাঙলা দেশের কল্লোজবাজবংশের ইবদা তাম্রশাসনে একজন নরপতিকে বলা হইয়াছে পবনসৌগত এবং অপব একজনকে 'বাসুদেবপাদাজপূজানিরত-মানস'রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেনবংশে বিজয়সেন এবং বল্লালসেন পরমমাহেশ্বর ছিলেন; লক্ষ্মণসেন ছিলেন পবনবৈষ্ণব বা পবননাবসিংহ এবং বিশ্বরূপসেন ছিলেন পবনসৌর। এই প্রসঙ্গে আবার একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। খ্রীস্টীয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে (বিশেষতঃ বর্তমান মধ্যপ্রদেশে) শৈব সাধনাব ক্ষেত্রে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের শৈবাচার্যগণ অসীম প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিলেন। তাঁহারা কাপালিক, কালামুখ প্রমুখ পাণ্ডপত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনুগ্রপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের নামান্তে 'শিব' বা 'শঙ্কু' শব্দ থাকিত। পক্ষান্তরে উগ্রপন্থীদিগের 'রাশি', 'শক্তি' বা 'জীয়' নামান্ত দেখা যায়। অনুগ্রপন্থী শৈবাচার্যগণের সহিত বাংলা-দেশের সম্পর্ক বিষয়ে এতদিন আমবা শুধু দক্ষিণ বাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর শঙ্কু বা বিশ্বেশ্বরবশিবেব নাম জানিতাম। তিনি কাকতীয় বংশের সুপ্রসিদ্ধ বাজা গণপতির (১১৯৯-১২৬০ খ্রী.) দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং গণপতির দক্ষিণে বর্তমান আন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণানদীৰ দক্ষিণ তীরে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ কবিয়া বিশ্বেশ্বর গোলকী নামক অতি বিশাল শৈবমঠ স্থাপন কবিয়াছিলেন। এই মঠে নানা শাস্ত্র পড়াইবাব বিদ্যালয়, প্রসূতিশালা, আবোগাশালা প্রমুখ অগণিত প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র, শিক্ষক, বৈদ্য, কর্মচারী প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত। যাহা হউক, বিশ্বেশ্বর যে জন্মভূমি বাংলাদেশের কথা ভুলিয়া যান নাই এবং এদেশের সহিত সম্পর্ক বক্ষা কবিয়াছিলেন, একটি ব্যাপারে তাহা বুঝা যায়। ১১৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকাবিধী বাণী রুদ্দাহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মল্কাপুৰ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, বিশ্বেশ্বর নিজের জন্মগ্রাম অর্থাৎ গৌড়দেশান্তর্গত দক্ষিণ বাঢ়ের পূর্বগ্রামের অধিবাসী কতকগুলি শ্রীবৎসগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণকে গোলকী মঠেব নিকটে তিন শত পুট্টিকা (প্রায় ২৪০০ একব) ভূমিতে বসাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মঠের সম্পত্তি ও অগ্ন্যাগ্ন আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখিতেন এবং সেই কার্যের পাবিত্রমিকস্বরূপ আরও ১৫০ পুট্টিকা জমি ভোগ কবিতেন। কোনো ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে যদি তাঁহার স্ত্রী হিসাববক্ষার কার্য কবিতে পারিতেন, তবে তিনি স্বামীব ন্যায় পারিত্রমিক পাইতেন।

মুর্তিশিবের আলোচ্য প্রশস্তিটি হইতে জানা গেল যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে উক্তব বাংলায় অনুগ্রপন্থী শৈব-সাধুগণের অসামান্য প্রভাব ছিল।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ (৩ মার্চ, ১৯৭৪) তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে অনুষ্ঠিত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী-সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

(পূর্বানুস্মৃতি)

॥ ছয় ॥

ভঙ্গ মুঘল ঐতিহ্য, নবগত পাশ্চাত্য প্রভাব ও আঞ্চলিক দেশীয় ধারার বিচিত্র সংমিশ্রণে আধুনিক অলঙ্কার বাঁতি প্রথমে কলকাতা ও বাংলাদেশেব অন্যান্য সহবে এবং পরে সুরকেন্দ্রিক সভ্যতার পাবিপাশ্বিক অনুপ্রবেশেব পথ ধবে ক্রমে সারা বাংলাদেশে আসব জাঁকিয়ে বসল। বাঙলার নিজস্ব অলঙ্কার বলতে যদি কিছু নির্দেশ করা যায় তবে তা দানা বেঁধে উঠল এই পর্বে এসে। তাই বাঙালীর অলঙ্কারেব আলোচনায় এই পর্বে আগমন ও পববর্তী সময়ের পর্বে উত্তবেব ইতিবৃত্ত—জুই-ই স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যিক। আমরা এ যাবৎ ইংরেজ আগমনেব পূর্বে ভাবেব অলঙ্কার কোন্ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল তার একটি সাধাবণ ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। বস্তুতঃ বাঙালীৰ আদি ও প্রাক-মধ্যযুগেব ইতিহাসের স্বল্পভা উপাদান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা চলে তা হল এই যে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বাঙলাৰ অলঙ্কার, অন্ততঃ অভিজাতকুলেব প্রথাবদ্ধ রীতিনির্ভব অলঙ্কার, মুখ্যতঃ উত্তব ভাবতীয নাগর আদর্শেব দ্বাবা ববাবব আচ্ছন্ন ছিল।

এ কথা স্মরণে বেখেই সংক্ষেপে বাঙলাৰ প্রাচীন ও মধ্যযুগেব অলঙ্কারধাবাব গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা কবা যেতে পাৰে। আমাদের আদিযুগেব অলঙ্কারেব ইতিহাস উদ্ধাব করতে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও মূর্তিবিচাব ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে পারি। তবে স্মরণে রাখা প্রযোজন এ আলোচনাৰ পূর্বশর্তঃ মণিমুক্তা ও মূল্যবান ধাতু-নির্মিত অলঙ্কারেব সামাজিক প্রচলন সামাজিক ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আর্থনীতিক ঋদ্ধি ও বণ্টনব্যবস্থায় সমতাৰ অভাব থাকলে সমাজে বিক্ষিপ্ত ঐশ্বর্যচর্চার নিদর্শন মিললেও ব্যাপক অলঙ্কারাভ্যাস ও তজ্জনিত অলঙ্কারশিল্পেব ব্যাপক অগ্রগতি অসম্ভব। বাঙলায় খৃঃ ১ম থেকে ৪র্থ/৫ম শতক পর্যন্ত অনুকূল বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে সমাজদেহে অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনেব স্বল্পকালীন এক জোয়ার আমরা দেখতে পাই। তাৰ আগে বা পৰে এই অঞ্চলেব ধনোৎপাদনেব উৎস ছিল মুখ্যতঃ কৃষি এবং ঐশ্বর্য ছিল মুষ্টিমেয ভূস্বামীদেব হাতে কেন্দ্রীভূত। এব অবশুস্তুাবী ফল বিপুল ধনবৈষম্য। এই বৈষম্যের ঢেউ অলঙ্কার-জগৎকে সবাসবি প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র দুটি বিপবীতধর্মী চিত্র আমবা পাই—একদিকে উত্তবাপথেব অনুকরণে ধনী বিলাসীমহলে অভিজাত গহনাৰ ছড়াছড়ি, আব অন্যদিকে সংখ্যাগুরু দরিদ্র ও পল্লীবাসীদের অঙ্গে অনাড়ম্বর প্রকৃতিজ অলঙ্কারেব প্রাধান্য।

তবে সংখ্যায় নগণ্য হলেও এবং উত্তৰ ভাৰত থেকে ধাৰ কৰা নমুনা ব্যবহাৰ কৰলেও বাঙলাৰ অভিজাত অলঙ্কাৰ-বিলাসীবা যে পৰিমাণ মূল্যবান্-ধাতু ও রত্নপ্ৰস্তৰ ব্যবহাৰে অভ্যস্ত ছিলেন তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকৰ নহ। প্রাচীন বাঙলাৰ খনিজ সম্পদেৰ তালিকা থেকে অনুমান সম্ভব যে দেশেৰ অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিৰ জোয়াৰ না এনে দিতে পাবলেও অতগুলি মহাৰ্থ উপাদান যবে বসে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পাওয়া যেত বলে তা স্থানীয় একটি আলঙ্কাৰিক ঘৰানা গড়ে উঠতে কম সহায়ক হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে বাঙলাকে হীৰা, রৌপ্য ও মুক্তাৰ দেশ বলে বাবংবাব উল্লেখ কৰা হযেছে। কোটিল্যেৰ অৰ্থশাস্ত্ৰেৰ একটি ভাষ্য অনুসাবে পৌণ্ড্রক ও ত্ৰিপুৰ (ত্ৰিপুৰা) হীৰামণি প্ৰাপ্তিস্থানেৰ অন্যতম। অবশ্য যুক্তিকল্পতৰুৰ মতে কেবল দ্বাপৰ যুগেই নাকি পৌণ্ড্রদেশে হীৰা মিলত। পৌণ্ড্র বা উত্তৰবঙ্গৰ এই হীৰকখ্যাতিৰ সমর্থনে বজ্জপবীক্ষা, বৃহৎসংহিতা, নববত্তপবীক্ষা ও রত্ন-সংগ্ৰহে অগণিত উল্লেখ পাওয়া যায়। ববাহমিহিব এবং গরুড়পুৰাণেৰ মতে যে আটটি অঞ্চলে হীৰা মিলত, পৌণ্ড্র তাৰ মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ অনুমান কৰেছেন যে, বজ্জভূমি অৰ্থাৎ উত্তৰবাচেৰ নামকৰণেই প্ৰকাশ যে এখানে বজ্জ বা হীৰা পাওয়া যেত। আইন-ই-আকববী অনুযায়ী আবাব দক্ষিণ বাচেৰ মদাবণ বা মন্দাবণে হীৰা পাওয়া যেত। বজ্জভূমি বোধহয় একদা বাঙলা-বিহাৰ সীমান্তে অবস্থিত কোথ্ৰাব কাছাকাছি পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই কোথ্ৰাব জাহাঙ্গীৰেৰ আমলেও অনেকগুলি হীৰকখনি ছিল। কয়লা খনি অঞ্চলেৰ হীৰাপুৰেৰ নামটি এই সূত্ৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বলে মনে হয়। অগস্তিমত অনুসাবে বজ্জ অৰ্থাৎ পূৰ্ববাঙলায় প্ৰচুৰ হীৰা পাওয়া যেত। গোড়িক নামে অগুত ফুলেৰ মত স্বচ্ছবৰ্ণ একবকম ৰূপো গোড়দেশে পাওয়া যেত বলে কোটিল্য বলেছেন। গঙ্গানদীৰ মোহনাৰ কাছে সোনা পাওয়া যেত এবং এদেশে প্ৰচুৰ স্বৰ্ণমুদ্ৰাৰ অস্তিত্ব ছিল। এ তথ্য পেৰিপ্লাসেও বয়েছে। স্বৰ্ণসমার্থক তেলেগু শব্দ ‘বান্ধাবা’ থেকেই ‘বাঙলা’ নামেৰ উৎপত্তি এমন অনুমানও কৰা হযেছে। মহাভাৰতেৰ সভাপৰ্বেও বজ্জপবীক্ষা গ্ৰন্থে পূৰ্বভাৰতীয় উপকূলবৰ্তী দেশসমূহে মুক্তাৰ প্ৰাচুৰ্যেৰ উল্লেখ পাওয়া যায়। পেৰিপ্লাসেও গাঙ্গেয় উপত্যকাৰ মুক্তাৰ অস্তিত্বেৰ কথা আছে।

প্রাচীন বাঙলাৰ খনিজ সম্পদেৰ এই উদাব চিত্ৰেৰ সঙ্গে অতি সঙ্গতিপূৰ্ণ মনে হয় পুৰাতাত্ত্বিক খননলব্ধ দেবমূৰ্তি ও যক্ষ-যক্ষিনীমূৰ্তিৰ অলঙ্কাৰ-বাঙ্লা। আগেই বলা হযেছে এইসব অলঙ্কাৰেৰ মধ্যে কিবীট, কুণ্ডল, টিকা, হেমসূত্ৰ ও বত্তজালিকাৰ প্ৰাধান্য সুস্পষ্ট।

চৰ্চাপদ ও দৌহাকোষে যেসব অলঙ্কাৰ ও মাণিক্যেৰ উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল কাঙ্কণ বা কঙ্কণ, কানেট অৰ্থাৎ কৰ্ণভূষণ, কুণ্ডল, নেউৰ অৰ্থাৎ নুপুৰ, মণি, রত্ন বা রত্নাণা বা বয়ণ অৰ্থাৎ বত্ত। বিজয়সেনেৰ নৈহাটি শাসনে রাজপুৰাঞ্জনাদেৰ মুক্তাহাৰ ও মহানীল-কুদ্ৰাক্ষমালা নামক হাৰ ব্যবহাৰেৰ উল্লেখ পাওয়া যায়। বামচৰিত ও পবনদূত গ্ৰন্থেৰ

বৰ্ণনায় যথাক্রমে বামাবতী ও বিজয়পুৰ নগৰেৰ বৰ্ত্তমানৰ আভ্যন্তৰীণ চোখে পড়ে। ৰামচৰিতে শুধু সুদৃশ্য অলঙ্কাৰমণ্ডিত সোনাৰ বিচিত্ৰ আসবাবপত্ৰেৰ উল্লেখ নহয়, হীৰকথচিত ও বিচিত্ৰ রত্নপ্ৰসুতসমৃদ্ধ নয়নাভিৰাম অলঙ্কাৰেৰ কথাও আছে। এছাড়া উল্লেখ পাওয়া যায় রত্ন-খচিত ঘুঘুবেব, মুক্তা-মবকত-নীলকান্তমণি, চুনী প্ৰভৃতিৰ বিলাস-বহুল প্ৰয়োগেৰ। সোনা-ৰূপাৰ ছড়াছড়ি তো ছিলই। প্ৰকৃতপক্ষে, ১০ম-১১শ শতক পৰবৰ্ত্তী লিপিগুলিতে ও নাগৰসাহিত্যে মণিবত্নখচিত ধাতব অলঙ্কাৰ ও সোনা-ৰূপোৰ তৈজসপত্ৰেৰ প্ৰাচুৰ্য সহজেই নজৰে আসে। ঐশ্বৰ্যেৰ এমনিই ঘটী যে বাজপ্ৰসাদেৰ ভূতাকুলেৰ বৰ্মণীদেব অঙ্গেও শোভা পেত হাব, কৰ্ণাঙ্গুৰী, মালা, স্বৰ্ণবলয়, মল প্ৰভৃতি, এ সমাচাৰ পাওয়া যাচ্ছে দেওপাড়া প্ৰশস্তি থেকে। সত্ৰজিৰ্ণকৰ্ণায়ুতে উদ্ধৃত কবি শুভাঙ্কেৰ শ্লোকে আছে একটা বাজ্য বৰ্ণনা—
 ৰাজপ্ৰাসাদেৰ প্ৰশস্ত চত্ৰেৰ যুবতীৰা যখন খেলাৰ ছলে নিজেদেৰ মধ্যে লড়াইতে মেতে উঠল তখন তাঁদেৰ কণ্ঠহাৰ ছিঁড়ে মুক্তোৰ গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে এখানে ওখানে। নৈষধচৰিতে ধনীর ছালালীৰ বিবাহসজ্জায় স্থান পেয়েছে মণিকুণ্ডল, সাতলহৰ মুক্তামালা, শাঁখা ও সোনাৰ বালা। কৰ্ণকুণ্ডল, কৰ্ণাঙ্গুৰী, অঙ্গুবীৰক, কণ্ঠহাব, বলয়, কেশুৰ, মেখলা প্ৰভৃতি অলঙ্কাৰ স্ত্ৰী ও পুৰুষ উভয়েই পৰতেন। মধ্যযুগেও এই একই প্ৰথাৰ অনুসৃতি চোখে পড়ে।

সাধাৰণ গৃহস্থ ও পল্লীবাসীৰা কিন্তু এই বস্ত্ৰবিলাস থেকে নিতান্তই বঞ্চিত ছিলেন। চিহ্নদাবিদ্ৰোহৰ মধ্যে তাঁরা প্ৰসাধনী সামগ্ৰীৰ জন্য প্ৰকৃতিৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে সন্তুষ্ট থাকতেন। নগৰবাসিনী বিলাসিনীৰ চালচলনও তাঁদেৰ অপছন্দ ছিল। কবিচন্দ্ৰ এই পল্লী প্ৰসাধনেৰ-মনোবম চিত্ৰ এঁকেছেন। পল্লীবধূৰ কপালে কাজলেৰ টিপ, হাতে জ্যোৎস্নাৰ চেয়ে সাদা পদ্মমুণ্ডালৈৰ বালা, কানে কচি বিঠে ফুলেৰ ভূষণ আৰু তিলপল্লবে শোভিত কববী। পবনদূতেৰ বৰ্ণনা অনুসাবে বসময় সুসুন্দৰে ব্ৰাহ্মণ-কুলাঙ্গনা কানে পৰতেন নবচন্দ্ৰকলাৰ মত স্নিগ্ধ কোমল কচি তালপাতাৰ কৰ্ণাভবণ। ফুলেৰ মালাৰ চলন ছিল খুব। উমাপতিধৰ বিবচিত বিজয়সেনেৰ দেওপাড়া প্ৰশস্তিতে একটা ইঙ্গিতপূৰ্ণ শ্লোক আছে। গ্ৰামেৰ ব্ৰাহ্মণকন্যাৰা মণিবত্নেৰ মুখ কখনো দেখেন নি, তাঁৰা চিনতেন লাউ-কুমড়ো ফুল, দাড়িম-বীচি, তুলোৰ বীজ আৰু সবুজ শাকপাত। বিজয় সেনেৰ দৌলতে যখন তাঁৰা সহবে বসবাস কৰে ধনশালী হলেন, তখন নাগবিক্ৰবা ব্ৰাহ্মণীদেব সনাতন প্ৰসাধনী থেকে সোনা, ৰূপো, মুক্তো, মবকতেৰ তফাৎ ভালো কৰে চিনিয়ে দিলেন। চৰ্যাপদে অন্যান্য সংসাৰবন্ধনহীন শ্ৰেণীৰ অলঙ্কাৰেৰ কথা আছে। কাপালিকেবা গলায় হাডেৰ মালা পৰত, অবগ্য-পৰ্বতবাসী শবৰেৰ পৰিধেৰ ছিল ময়ূৰেৰ পাখা, তাৰ গলায় থাকত গুঞ্জাবীচিৰ মালা, কানে বজ্জকুণ্ডল।

(ক্ৰমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভূত আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত।
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীশ্রুতীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনা সম্বলিত
নবম সংস্করণ

শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুখবন্ধ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল’, বসন্তরঞ্জনর পুনর্লিখিত ভূমিকা, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর, বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী, শব্দসূচী এবং বসন্তরঞ্জনর জীবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি-সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাতপূর্ব ও নূতন তথ্য নবম সংস্করণে সংযোজিত ॥

বসন্তরঞ্জনর অপ্রকাশিতপূর্ব আলোকচিত্র, স্বহস্তলিখিত কড়চা ও পত্রাদিও আলোকচিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির বিভিন্ন ছাঁদের হস্তাক্ষরের ১২ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠার হাফটোন ছবি। মূল্য ত্রিশ টাকা ॥

“এই সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মর্যাদা প্রকৃতভাবে রক্ষা কবিত্তে পারিয়াছে বলিয়া আমরা মনে কবি। এবং যে মনীষী এই গ্রন্থ আবিষ্কার কবিত্তা বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দিয়া এবং তাহার প্রথম সম্পাদনা কবিত্তা জাতিকে চিবকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কবিত্তা গিয়াছেন, সেই পুণ্যলোক বসন্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্ভূতের জীবনযুগ ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার কবিত্তা আমাদের ঋণিশ্রুণ পবিশোধের কথঞ্চিৎ চেষ্টা কবিত্তাছি।”

—শ্রীশ্রুতীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত

কবি করুণানিধানের ব্যক্তিজীবন; দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল বায়, ববীন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রপরিমণ্ডলের কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস বায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত করুণানিধানের সম্পর্ক; সত্যীশচন্দ্র বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জগদ্বিন্দনাথ বায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত অন্তর্ভুক্ততা; কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা; কবির লিখিত ও কবিকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ; বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশিত করুণানিধানের সমগ্র কবিতাব. বর্ণানুক্রেমিক সূচী সমন্বিত করুণানিধান ও সমসাময়িক সাহিত্যজগৎ সম্পর্কিত আকব-গ্রন্থ।

“এই বইখানি বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের আলোচনা এবং যুগপৎ জীবনী-সাহিত্যের উন্নয়নে একখানি বহুমূল্যবান আকব-গ্রন্থ হইয়া থাকিবে।”

—শ্রীশ্রুতীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবির স্বাক্ষরিত অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ৪ খানি দুর্লভ হাফটোন চিত্র। সুদৃশ্য বেঙ্কিনে বাঁধাই। ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬৮০। মূল্য : ২৮.০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা।
মাঘ—চৈত্র
১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস

প্রথম পর্ব

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

[১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির গোড়াব কথা, ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পরিষৎ প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কল্পনা ও প্রয়াসের কাহিনী ; নবজাত পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রসঙ্গে জন্ম বীমস, ফ্রীড্‌বিখ্‌ মাক্স ম্যুলার, মনিয়র-উইলিয়ম্‌স, উইলিয়ম্‌ উইল্‌সন হাণ্টার, জর্জ বার্ডউড্‌ প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর অমূল্য পত্রাবলী ; তাঁহাদের সহিত লিওটার্ড, বিনয়কৃষ্ণ দেব, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের যোগাযোগ ; বঙ্কিমচন্দ্র, বমেশচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরবাব সহিত সাহিত্যপরিষদের সংযোগ ; মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের আদর্শ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীগণের সম্মিলিত প্রয়াস—বঙ্গসংস্কৃতির তথা ভারত-সংস্কৃতির এক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার ॥

“উপযুক্ত গবেষকের গভীর অধ্যয়ন এবং অভিনিবেশের কাছে এখনও ভাগ্যক্রমে কখনও-কখনও এইরূপ, মূল্যবান সামগ্রী আত্মপ্রকাশ কবিতা থাকে এবং তদ্বারা অনুসন্ধিসুখ সন্ধানকার্যের গৌরব সূচিত কবে ॥

এতাবৎ সাধারণে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়, পবিত্রম ও উৎসাহে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহাব ফলে এই সমস্ত মূল্যবান দলিল আমবা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি ।

এই কাজে যিনি নিজেরই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কাছে এমন অনেক আশ্চর্য্য এবং মনোহর তথ্য আহরণ কবিতা এই পুস্তকে পবিবেষণ করিলেন, তাঁহার কাছে সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির তথা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচকদের স্কৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার কবিতেই হয় ।”

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ।

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০ ; চারখানি ছাপ্রাপ্য হার্টটোন চিত্র, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি আলোকচিত্র । দাম পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবভীষ সংস্কৃতি স্বর্ণযুগে দেখি নাবী পুরুষের সমকক্ষরূপে স্বীকৃত। তিনি বৈদিক যুগে সংহিতাব সূক্ত বচনা কবেছেন। উপনিষদে দেখি তিনি বিতর্ক-সভায় পুরুষ দার্শনিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবেছেন। তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে দেখি নারী নিপীড়িত, নিগৃহীত এবং শৃঙ্খলিত, অন্দরমহলে অববদ্ধ জীবন তাঁর উপর কঠিন হস্তে সমাজনেতা আবোপ কবেছেন। লেখাপড়ার সহিত সংস্রব নেই। পুরুষের সেবাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দ্বাবিত হয়েছিল।

নারীর এই ঐকান্তিক অবনতা অবস্থা হতে উন্নয়নের জন্য বামমোহন যে আন্দোলন শুরু কবেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত কবাব ব্রত গ্রহণ কবেছিলেন। তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে নাবীকে জাগ্রত কবে তাঁর নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি চেয়েছিলেন নাবী নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবাব জন্য উচ্চশিক্ষা পাক। তাই বাংলার প্রথম বালিকা প্রতিষ্ঠান বেথুন বিদ্যালয়কে তাঁর প্রথম সম্পাদকরূপে গড়ে তোলেন। তাই যখন চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহিলা পরীক্ষার্থী হয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি চন্দ্রমুখীকে একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন।

চন্দ্রমুখী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছিলেন তাঁর অনুসরণ কবেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর দুই মেয়ে। উভয়েই পববর্তী জীবনে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের একজন হলেন মহর্ষির দৌহিত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সবলা দেবী। অপবজন হলেন তাঁর পৌত্রী সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী। সবলা দেবী ছিলেন ইন্দিরা দেবীর থেকে এক বছরের বড়। উভয়েই অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। সবলা দেবী পাশ করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। তিনি ঘরে পড়ে ফরাসী ভাষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। আজ ইন্দিরা দেবী আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

ইন্দিরা দেবীর জীবন যে এইভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তা অকাবণে নয়। তাঁর জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হল ভাবতের প্রথম ভাবভীষ সিভিলিয়ান মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের। সত্যেন্দ্রনাথ যেটিকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ কবেছিলেন তা হল নাবীকে শৃঙ্খলিত অবস্থা হতে মুক্ত কবে নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতের সমাজে মেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রা বীতির সহিত পরিচিত হয়ে তাঁর এই ইচ্ছা আবও বলবতী হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর বচিত ‘আমাব বাল্যকথা’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

“আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন; ‘তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?’ আমাদের অন্তঃপূবে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমাব আদবে ভাল লাগিত না।”

তাই তিনি পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তিন বছর বিলাতে বেখে দিয়েছিলেন। তাঁব ধারণা, পশ্চিমের নাবীসমাজের সহিত পরিচিত হলে এই মহিলা দেশের নাবীদের নিজেদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত কবাব প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করবেন। তাঁব সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। কাবণ, এই মহিলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাবীজাগরণের আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন বিলাতে যান তখন ইন্দিবা দেবীর বয়স চার বছর। সুতরাং বাল্যে তিনি পাশ্চাত্য সমাজের নাবীদের স্বাধীন পরিবেশের সহিত পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তিনিও স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করে চলে। তাবই সার্থক পরিণতি হিসাবে দেখি তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরিবাবেব সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিত কবেছিল। ফলে পিয়ানো এবং ববীন্দ্র সঙ্গীতে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কয়েক বছর পরে ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরীর সহিত তাঁব বিবাহ হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী ছাত্র। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এম. এ.তে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার কবে উত্তীর্ণ হন। পরে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধাব বুদ্ধি, সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুরাগ। এমন যোগ্যেব সঙ্গে যোগ্যের মিলন কচিং ঘটে। উত্তরকালে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা তাঁব গুণবতী পত্নীর সাহচর্য নিশ্চয় বিশেষ সহায়তা করেছিল। প্রাচীন বয়সে তাঁবা উভয়েই কলকাতা ত্যাগ কবে শান্তিনিকেতনে বাস কবতে আবিস্ত কবেন। সেখানে বিশ্বভাবতীর জন্য যখন প্রথম উপাচার্য পদ সৃষ্টি হয়, ইন্দিবা দেবীই সেই পদ অলঙ্কৃত কবেছিলেন। সেখানেই পরিণত বয়সে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁব জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

আমাদের পবম সৌভাগ্য ববীন্দ্রনাথ ও ইন্দিবা দেবীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। খুড়ো এবং ভাইবির মধ্যে এমন প্রীতিব বন্ধন ইতিহাসে বিবল। তাঁবা কাছাকাছি থাকেন নি, দুবে খেকেছেন; কাবণ ইন্দিবা দেবীর জীবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয়েছে পিতার সঙ্গে সুদূর বোম্বাই প্রদেশে। তবু এই আকর্ষণ। দুবত্বের ব্যবধান হেতু চিঠিপত্রেই সংযোগ বন্ধিত হয়েছে। এব সূত্রপাত হয় যখন ইন্দিবা দেবী মায়ের সঙ্গে বিলাতে ব্রাইটনে বাস কবতেন। মেজদাব সঙ্গে প্রথম বিলাতগিয়ে কিছু দিন ব্রাইটনেই ববীন্দ্রনাথকে যাপন কবতে হয়। তখন ভাইপো ও ভাইবির সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভেব সুযোগ হয়।

এই স্নেহবন্ধন পবম্পরের চিঠিব আদান-প্রদানেব মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল পুষ্টলাভ কবেছিল। আমবা ববীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি সংরক্ষিত অবস্থায় পাই; কিন্তু ইন্দিবা দেবীর লিখিত চিঠিগুলি পাই না। পেলো বোঝা যেত তিনি নিপুণতাব সহিত

প্রথিতযশা রবিকাকাব সঙ্গে ভাববিনিময় কবছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি ইন্দিরা দেবী সযত্নে রক্ষা কবেছিলেন এবং ফলে তা পর্বে ‘ছিন্নপত্রাবলী’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিগুলিতে এমন বিষয় নেই যা স্থান পাষ নি। সেগুলির রচনাকাল ১৮৮৭—১৮৯৫। ইন্দিরা দেবী তখন বাল্যজীবন শেষ কবে তারুণ্যে ধীবে ধীবে পদার্পণ করছেন। তাতে যেমন উত্তববৃদ্ধের নৈসর্গিক শোভাব বর্ণনা আছে, বিভিন্ন মানুষের ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, তেমন সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর চর্চা আছে; এমন কি বেদান্ত নিয়েও আলোচনা আছে। এটা সম্ভব হত না যদি না তিনি ইন্দিরা দেবীর মত সংবেদনশীল শ্রোতা পেতেন, যিনি পত্রলেখককে অসংকোচে প্রাণ খুলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত কবতে উৎসাহিত করতে পারতেন।

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ ভালবকম অবহিত ছিলেন। তাঁব ৭ই অক্টোবর ১৮৯৪ তাবিখে লিখিত চিঠিতে তিনি একথা স্বীকাব কবেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

“আমি তো আবও অনেক অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পাবে নি।…… তোব অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সবল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিন্দু যেন তোব ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।”

এইভাবে “ছিন্নপত্রাবলী” ইন্দিরা দেবীর জীবনে সব থেকে বড় কীর্তি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের পত্রসাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলা সাহিত্যেব এই সৌভাগ্যের পথ প্রস্তুতির জন্য ইন্দিরা দেবী চিবকাল স্মবণীয় হয়ে থাকবেন।

ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব সাহিত্য বচনাব নিদর্শন যৎসামান্য। কিন্তু তাঁব তাৎপর্য গভীর। পিতামাতাব প্রতি বিশেষ কর্তব্য হিসাবে তিনি ‘পুবা্তনী’ নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা কবেন। তাতে আছে তাঁব মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা এবং তাঁব মাকে লিখিত তাঁব পিতার পত্রাবলী। ঠাকুর পবিবাব সম্পর্কিত গবেষণাব কাজে এটি একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবাব যোগ্য। তাঁব নিজের বচিত গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে’ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অনুধাবন কবতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

‘কডি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি আশীর্বাণী জানিয়েছিলেন এমন এক সময় যখন তিনি নিতান্তই বালিকা। তাতে আছে :

সুন্দব মুখেতে তোব মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ।

দেখা যায় তাঁর ববিকাকাব এই আশীর্বাদ তাঁব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁব দীর্ঘ জীবন সুন্দব ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে সার্থকতামণ্ডিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে (২৯শে চৈত্র ১৩৮০) পঠিত।

ইন্দিবাদেবী স্মরণে

চিত্রিতা দেবী

অনেক মানুষেব জীবনেই কাব্যেৰ উপাদান থাকে সত্যি, কিন্তু কজনে আব জীবনকে কাব্যেৰ মতো কবে গড়ে তুলতে পারে? কাব্যেৰ মত ছন্দিত সুসমায় মণ্ডিত, কাব্যেৰ মত অৰ্থবহ, ব্যঞ্জনাময়; কাব্যেৰ মত দুঃখসুখেৰ কাহিনীৰ মধ্যে জন্মলাভ কবেও সেই ইতিবৃত্তকুৰ গণ্ডী পেৰিয়ে সৰ্বমানবেৰ চিত্তলোকে উত্তীৰ্ণ হবাব মতো সৌন্দৰ্য্যময় সুস্ম শরীৰ ধাবণ কবতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষভাগে এমন কয়েকজন মনস্বী ও মনস্বিনীৰ আবিৰ্ভাব হয়েছিল, যাঁরা জীবনকে অনুশীলিত পৰিশীলিত কবে কাব্যেৰ মত রসসমৃদ্ধ ও ছন্দোময় কবে তুলতে পেরেছিলেন। ইন্দিবা দেবী তাঁদেৰ মধ্যে একজন।

উনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীৰ পক্ষেই গৌৰবেৰ কাল। বাংলা তথা ভারতেৰ নবজাগরণেৰ সূত্রপাতও সুরু হয়েছিল গত শতাব্দীৰ সূৰতে, যদিও বামমোহনেৰ জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে। উনবিংশ শতাব্দীৰ ইতিহাস আলোচনা কবা অবশ্য এ প্রবন্ধেৰ উদ্দেশ্য নয়।

আমবা আজ ইন্দিবা দেবীৰ শত বৎসবেৰ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সেই স্মৰণীয়া বৰণীয়াকে স্মরণ কবতে এসেছি। বৰণীয়া অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠা। ইন্দিবা দেবীকে নিঃসন্দেহে বৰণীশ্ৰেষ্ঠা বলা চলে।

আজকেৰ যুগে বৰণীকে বিশেষ কবে বৰণীভাবে দেখবাব কথা ভাবা হয় না। নবনাবী নিৰ্বিশেষে মানুষ আজ মানুষ নামেই পৰিচিত হতে চায়। সেই জন্মেই এযুগে স্ত্রীপুরুষ (বিশেষত ইয়োৰোপে) শুধু যে তাদেৰ পোষাকেৰ তাবতম্য ঘূচিয়ে দিতে চাইছে তাই নয়, পুরুষ তাব পুরুষোচিত কীর্তিকলাপ এবং নাবী তাব বৰণীসুলভ বিশেষ গুণগুলিৰ দিকে আব মন দেবাব প্রযোজন বোধ কবছে না।

ইন্দিবাদেবী কিন্তু বিশেষভাবে বৰণী। যদিও সেযুগে যে সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে পুরুষোচিত বলে গণ্য হত ইন্দিবাদেবী সে সমস্তই অনায়াসে আয়ত্ত কবেছিলেন। যেমন সেযুগে বাঙালী পুরুষদেৰ পক্ষেও মোটামুটিভাবে B. A. পাশ করাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে কবা হোত। তাতেই মুন্সিফ, সাবজজ, এমনকি ডেপুটী হওযাও হয়ত দুৰ্লভ হোত না। ইন্দিবাদেবী ১৮১৯ বছৰ বয়সে B. A. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার কবে যুনিভার্সিটি থেকে “পদ্মাবতী মেডেল” পান। এদিকে আবাব Trinity College থেকে music-এৰ ডিপ্লোমা পাশ কবেন।

শিক্ষাব দিক থেকে তিনি কোন পুরুষেৰ চেয়ে কম ছিলেন না। আবাব বৰণীৰ বিশেষ সঙ্গুণগুলিৰ একটাও তিনি পরিত্যাগ কবেন নি। “স্নেহে মাতা, কৰ্মে সে পুরুষ”

চিত্রাঙ্গদার এই বাণী তাঁব জীবনে সত্য হয়েছিল। পবিবাবেব সকলের দেখাশোনা গৃহস্থালীর কর্তব্য, সবদিকে তাঁব নিবলস সজাগ দৃষ্টি ছিল। শুনেছি আশ্রিত পবিজনদেব খাবাব সময় তিনি একটা বেতের মোড়ায় বসে ভৃত্যদেব কাছে বাজাবেব হিসাব নিতেন। এই সুযোগে লক্ষ্য বাখতেন তাঁদেব ঠিকমত যত্ন কবে খেতে দেওয়া হচ্ছে কিনা।

এছাড়া তাঁব অসাধাবণ পাতিব্রতা ধর্ম তাঁকে চিবকালেব যশস্বিনী ভাবতীয় নাবীদেব সমগোত্রীয়া করে তুলেছে। গান্ধাবীৰ সঙ্গে তাঁব তুলনা কবলে বেমানান হয় না। যৌবনে তিনি ছিলেন সর্বকর্মে স্বামীব সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী। নিজে তিনি শুধু যে উচ্চ-শিক্ষিতাই ছিলেন তা নয়, পাবিবাবিক উত্তবাধিকাৰ সূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রেও শক্তিব স্বাক্ষব বেখেছেন। “নাবীব উক্তি”, “ববীন্দ্রসঙ্গীতেব ত্রিবেণীসঙ্গমে”, “ববীন্দ্রস্মৃতি”, “বাংলাব স্ত্রীআচার”, “হিন্দুসংগীত”, “ববীন্দ্রস্মৃতি”, প্রভৃতি কযেকটী বইএব মধ্যে তিনি তাঁব সাহিত্য-রচনার পরিচয় রেখে গেছেন। চেক্টা কবলে এবং ইচ্ছে কবলে নিশ্চয়ই আবো লিখতে পারতেন, কিন্তু স্বামী প্রমথ চৌধুরীব সাহিত্যজীবনেব সঙ্গিনী হওয়াকেই তিনি বেশী কাম্য মনে কবতেন। তিনি “বীববল”কেই বড় কবতে চেয়েছিলেন, নিজেকে নয়। শুনেছি প্রমথ চৌধুরী বা বীববলেব লেখা “চাবইযাবী কথা”ব এত চমৎকাব ইংবাজী অনুবাদ কবেছিলেন, যা পড়ে অনুবাদ না মৌলিক বচনা—বোঝা যেত না। সবুজ পত্র প্রকাশেব সময় তিনি নানা-ভাবে স্বামীকে সাহায্য কবেছেন। এদিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে যথার্থ জীবনসঙ্গিনী, আবাব তাঁব অত্যাশ্চর্য সেবাপবায়ণতা তাঁকে কবে তুলেছে ভাবতীয় নাবীব আদর্শ প্রতিমা।

দশ বাবো বৎসব ধরে অসুস্থ স্বামীকে যেভাবে শিশুব মত বক্ষণাবেক্ষণ কবতেন, তাঁব তুচ্ছতম প্রয়োজন মেটানোব জন্যে সর্বদা সচেত্ন থাকতেন, অন্তরে বাইবে প্রসন্নতাব উপরে মালিন্যেব ছায়া ফেলতে দিতেন না, তাতে তাঁকে সকল যুগেব সকল দেশেব নাবীমাত্রেব আদর্শ বলে গণ্য কবা যেতে পাবে।

আমাদেব পবম সৌভাগ্য যে আমবা ইন্দিবাদেবীকে কাছ থেকে দেখবাব সুযোগ পেয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটিব প্রতি তাঁব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এটা অবশ্য ঠাকুব পরিবারেব বৈশিষ্ট্য। ষাঁবা ববীন্দ্রনাথকে জানেন, তাঁবা নিশ্চয় মনে কবতে পাববেন, নৃত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীত পবিবেশনায় যে কোন অনুষ্ঠানেব আয়োজন নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার দিকে তাঁব কি আগ্রহ ছিল।

আমরা ইন্দিবাদেবীকে দেখেছি শেষ বয়সে, যখন তিনি অসুস্থ স্বামীকে সর্বদা আগলে বাখতেন; তাঁর পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, কীধেব ওপোব ব্রোচটা লাগানো,—কোথাও এতটুকু শৈথিল্য বা অমনোযোগেব পবিচয় নেই।

ষাঁবা তাঁকে যৌবনে দেখেছেন, তাঁদেব কাছে শুনেছি,—তিনি অসামান্য রূপসী ছিলেন। যেমন বড় তেমনি মুখশ্রী, বড় বড় উজ্জল চোখ, তুলি দিয়ে আঁকা ভুক, ঘন

কালো দীর্ঘ কেশ,—এক কথায় পবনাসুন্দরী, যেন রূপকথার রাজকন্যা। রূপে যেমন, গুণেও তেমনি অতুলনীয়। বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, মহর্ষির নাতনি, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা, বরীন্দ্রনাথের পবন স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রী, নিজেও উচ্চশিক্ষিতা, বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বধূ, সাহিত্যক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী,—এর যে কোন একটি গুণ কিছুটা পরিমাণে থাকলেও অনেক মেয়েবই গর্বে নাসিকা একটু উন্নত হোতাই। কিন্তু গুণেছি, ইন্দ্রদেবী চিরকাল একই বকম নিবহঙ্কাব! সকলের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন,—হাসি গল্লে কোথাও আভিজাত্যের আডাল টানতেন না।

বরীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে সকলেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সস্ত্রীক পাশাপাশি দুই ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে হাওয়া খাওয়ায় গল্প অনেকেই জানেন। কিন্তু পরিবারের অবরোধ প্রথায় প্রথম ভাঙন ঘটিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নবীনা বধূকে শুধু বোম্বাই-নয় বিলেত পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে। বিলেতে গিয়ে দুই শিশু সন্তান নিয়ে ববফরবা শীত অবহেলা কবে কি কবে তিনি সুযোগ্য গৃহিণীপনায় আতিথ্য সেবায় তৎপব হয়ে দুটি বছর কাটিয়েছিলেন ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

ইন্দ্রদেবীর নিজের মুখে গল্প শুনেছি,—“মা তো ছিলেন যেন ছোটো-পুতুলটীব মতো। বাবা সব কিছু শিখিয়েছিলেন মাকে। শুধু ইংরেজী বলা কওয়াই নয়, ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ কবিয়ে দিয়েছিলেন।” বিবিদি বলতেন,—“ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পেতে আমবা শিখি সেই শিশুবয়সেই, প্রথম হাতেখড়ি মায়েব কাছে।”

মায়েব কাছে বসে সাত বছর বয়সে টমাস মুরের কবিতা মুখস্থ করেছেন; বুঝতে শিখেছেন শেলীর ‘Clouds’, তখন থেকেই ছিলেন অতি সুকণ্ঠের অধিকারিণী। বিলেত থেকে ফিরতিপথে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে Irish melodies গেয়ে শোনাতে।

আজকের দিনে আমবা স্বাধীনতা আর উজ্জ্বলতা প্রায় এক অর্থেই ব্যৱহাব করি। মেয়েদেব স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন কবা আর পোষাকে-আসাকে শালীনতা বর্জন কবা যেন এক পর্য্যয়ে পড়ে। ইন্দ্রদেবী কথা বলতে গিয়ে, আজকের যুগের মেয়েদেব কথা সহজেই ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাবতীরা ভাবতকে নানা দিক দিয়ে জাগ্রত কবতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন সমাজের অধর্মে অন্ধকারে রেখে বাকি অধর্মে আলোকিত হতে পাবে না। তাই নারীজাগরণ তাঁদের অন্তরের কামনা ছিল। কিন্তু তাঁরা ভাবতের নাবীকে ভাবতের নাবীরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। ভাবতের নারী যেন আপন ঐতিহ্যের উপরে দাঁড়িয়ে জগতের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারিণী হতে পাবে। শিক্ষা যেন চবিত্রকে উন্নত কবতেই সহায় হয়—তাকে যেন স্বধর্মবিচ্যুত না কবে, এই ছিল সে-যুগের কামনা।

কলকাতায় এসে ইন্দ্রদেবী প্রথমে সিমলা কনভেন্টে ও পরে ভর্তি হলেন কলকাতায়

লরেটোয়। খাস বিলেত থেকে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলেন তাতে মর্চে ধবতে দিলেন না মা-বাবা। Cambridge পাশ কবলেন ইংবেজী ও ফরাসী সাহিত্য নিয়ে। একদিকে চলছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বাছযন্ত্র শেখা অন্যদিকে ভাবতীয় হাবভাব, বাঙলা সাহিত্য ও ভাবতীয় সংগীতের চর্চা।—একদিকে পিয়ানো, ভায়োলিন,—অন্যদিকে সেতার এস্রাজ।—কমলাব মত শ্রীময়ী ইন্দিবা সবস্বতীৰ মত ধীময়ী বীণাপাণি হলেন। এছাড়াও তাঁর অসাধাবণ কর্মদক্ষতার কথা সকলেই জানেন।

শান্তিনিকেতন থেকে যখন বাংলায় বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশ করা স্থির হল প্রমথবাবুকে সম্পাদকরূপে বরণ করা হল। কিন্তু তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তিনি নিজে প্রায় কিছুই করতে পাবতেন না। সেই সময়ে ইন্দিবাদেবী গভীর নিষ্ঠাব সঙ্গে পত্রিকা-সম্পর্কে সমস্ত কাজ করতেন। সেই সময়কাল একজন লিখেছেন,—ইন্দিবাদেবী তখন খুব যোগ্য একজন পুরুষের মত বিচক্ষণতাব সঙ্গে লেখা ও সম্পাদনাব কাজ কবেছেন।

এ সমস্ত ছাড়াও আর একটা কারণে বাংলাসাহিত্যবসিক মাত্রেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁকে উপলক্ষ্য করেই ববীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বচনাগুলি উৎসব মত করে পড়েছিল। ভাইপো-ভাইবিরদের মধ্যে ইন্দিবাই ছিলেন কবির সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী।

ব্রাইটনে গিয়ে সাতবছরের সুবন আর পাঁচবছরের বিবিকে নিয়ে কিশোর কবি নূতন সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

“ছেলে ভোলাইবাব সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবাব প্রয়োজন পবে অনেকবাব হইয়াছে। এখনো তাব প্রয়োজন ফুবায নাই, কিন্তু সে শক্তিব আর সে অজস্র প্রাচুর্য্য অনুভব কবি না। শিশুদেব কাছে হৃদয়কে দান কবিবাব সুযোগ সেই আমাব জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল। দানব আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।” আমাব কেমন মনে হয় “জগৎপাবাবাবের তীবে শিশুব মহামেলা”ব মধ্যে ব্রাইটনেব সমুদ্রতীবে সেই দুই শিশুব সঙ্গে কবিরূদয়ের আনন্দমিলনেব যোগ আছে।

ববীন্দ্রনাথের অসীম স্নেহেব সুযোগ পেয়েছিলেন ইন্দিবা দেবী। “মঙ্গলগীতি” ও “উপহাব” নামে দুটি অপূর্বসুন্দর কবিতা লিখেছিলেন ইন্দিবা দেবীকে। বাবা বলেন কাব্যের মধ্যে উপদেশ ও নীতিমূলক কথা থাকলে তা কাব্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, এতুটি কবিতা পড়লে তাঁদের ভুল ভাঙবে, তাঁরা বুঝতে পাববেন কবিতা যদি কবিতা হয় তবে উপদেশ-বিষয়ক হলেও তা কবিতাই থাকে।

ইন্দিবা দেবী এক জন্মদিনে তাঁকে পিয়ানোব গডনেব এক দোষাতদানী উপহাব দিযে “উপহাব” কবিতাব দুটি ছত্র লিখে দেন,—

“স্নেহ যদি কাছে বেথে দেওয়া যেত,

চোখে যদি দেখা যেত বে,

কতগুলো তবে জিনিষপত্র

বল্ দেখি দিত কে তোবে।”

ছিন্নপত্রের পত্রাবলী ইন্দিবাদেবীকে অবলম্বন কবে গড়ে ওঠায় তাঁরো কিছু কৃতিত্ব ছিল কিনা এটাও একটু ভেবে দেখবাব বিষয়।

এ বিষয়ে ইন্দিবা দেবী নিজে লিখেছেন “এই চিঠিগুলির উপলক্ষ্য হওয়া ছাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুকু আছে যে সেই অল্পবয়সেই আমি তার মর্যাদা-বুঝে তার সাহিত্যিক অংশগুলি সাধারণ পাণ্ডিত্যবিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে একটা খাতায় তারিখ সমেত লিখে বেখেছিলুম। পরে সেই খাতা তাঁকেই দিয়েছিলুম। সেই খাতা থেকেই “ছিন্নপত্র” বইখানি ছাপানো হয়”।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “আমিও জানি বব্, তোমাকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি, তাতে আমার মনের বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আব কোন লেখায় হয় নি।।..... তোকে আমি যখন লিখি, তখন আমার মনে হয় না, যে, তুমি আমার কোনো কথা বুঝবিনে, কিম্বা বিশ্বাস কববিনে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলিকে, তুমি কেবলমাত্র সুবচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্মে আমি যেরকম ভাবি, ঠিক সেই বকমটী অনায়াসে বলে যেতে পারি।..... আমাকে একবার তোব চিঠিগুলি দিস বব্।..... যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে একদিন নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে যাব। তখন পূর্বজীবনের এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীবে ধীবে বেড়াতে ইচ্ছে কববে।”

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে স্নেহলাভ অনেকই কবেছেন। তিনি অন্তবে স্নেহশীল, প্রেমময়। যে তাঁর কাছে গেছে সেই কিছু না কিছু স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু সকলেই তো দেখি সেই স্নেহকে তাদের গর্বের মূলধন কবে ব্যবহার কবছে। কখনো আব তাঁর আদর্শকে গ্রহণ কবতে পেবেছে কিম্বা চেয়েছে।

ইন্দিবাদেবীর জীবনে মনুষ্যত্বের আদর্শ এমন সহজে স্বীকৃত হয়েছে, যা এযুগে কচিং কখনো চোখে পড়ে। এতটুকু কৃতিত্ব দেখালেই তাঁর জয়চাক বাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠছে আজকের মানুষ। ইন্দিবা দেবীর দীর্ঘ জীবনে কত কৃতিত্ব। শেষ বয়সে শান্তিনিকেতনে এসে নানাদিক থেকে নিজেই এই বিচ্ছালয়ের মধ্যে দান কবে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের আগেকার সব গানই তাঁর কণ্ঠে ধরা ছিল। পুরোণো কালের বহু গান, যা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, সেই সবই তিনি আবার ফিরিয়ে এনে দিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে। ‘স্বলিপি সমিতি’র প্রধানা হিসাবে তাঁর দান অপবিসীম। কিছুদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের পদও তাঁকে নিতে হয়েছিল। কিন্তু যখন গিয়েছি, দেখেছি তিনি তাঁর বিবল-উপকরণ ছোটো বাড়ীটিতে অনায়াস মহিমায় মহিমায়িত হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছেন। যাব শুধু কেশ এবং বেশবিগ্যাসের জন্যে দুজন পরিচারিকা ছিল তিনি

বিভ্রহীনতাব মর্ধ্যে কি স্বাভাবিক ভাবেই না নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ হাসিটির মধ্যে মলিনতাব ছায়া পড়েনি। আনন্দের বস শুকিয়ে যায় নি, ছোটোবড় সবার সঙ্গে অজস্র গল্প কবে যাবাব মতো মানসিকতাব ক্ষয় হয় নি।

ধনীৰ ছুলালী, স্নেহেৰ পুতলী, যেদিন ধনে মানে আবেক সেবা ঘবের বধু হয়ে গেলেন, সাহিত্যজগতে ববিকা'র সঙ্গে স্বামী প্রমথ চৌধুরীৰ মিলন হল, ববীন্দ্রনাথের নাম অঙ্গীকাৰে নূতন সাহিত্য-পত্রিকা বেব কবলেন প্রমথ চৌধুরী, সেদিন সে কি জন্মজন্মট সময়। তার পবে ধীবে ধীবে সন্ধ্যা নামল জীবনে, —স্নান হয়ে এল ঐশ্বর্য্যেৰ দীপ্তি। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বছরের পব বছব নিজেব হাতে (নার্স বেথে নয়) স্বামীৰ পরিচর্যা করলেন। তাবপবে একদিন শুভ্র বসন পবে একলা দাঁড়ালেন পৃথিবীতে।

কুমারীবেলায় যখন একলা ছিলেন, তখনকাব সঙ্গে এখনকাব কত তফাৎ। এখন আব আগেব প্রিয় পবিজনবা কেউ নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন, ববিকা'ব কর্মক্ষেত্রে ববিকা-ই নেই। কিন্তু বাইবে বিভ্রতাব আববণ থাকলেও অন্তবে মহাধনী হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘ জীবন সত্যভাবে যাপন কবাব দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁকে মহীয়সী কবে তুলেছে। আব তিনি স্নেহেব ভিখাবী নন, এখন তিনিই সবাইকে স্নেহ দান কবেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর ছোটো ঘবটি দেখতে দেখতে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। যেখানে যত দলাদলি থাক, তাঁর ঘবে সকলের সমান আদব। 'বিবিদি' সকলেবই মনেব মানুষ। বিবিদিব কাছে এসে মনেব কথা বলা সবচেয়ে সহজ।

গুরুদেব যাবার পবে শান্তিনিকেতনে যাব মনে কবলে ঐ একটা নামই প্রথমে মনে পডত। ইন্দিবা দেবী এবং প্রতিমা দেবী দুজনেব কাছেই অকাবণে এত স্নেহ পেয়েছি সে ভোলবাব নয়।

সেবারে শ্রাবণ মাসে দুদিনেব জন্ম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। প্রথম দিনটা কোথা দিশে কেটে গেল জানি না। দ্বিতীয় দিনে ফেবাব আগে সকাল বেলায় ইন্দিবা দেবীৰ সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম বিবিদিব স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়ে গেছে। উজ্জল চেহারা ঝলমল কবছে। বড বড কালো চোখে একটুও নেই বার্ধক্যেব ছায়া। শুধু কপালেব দুই পাশে দুই গুচ্ছ সাদা চুল, আব বাকি মাথাটা একেবাবে নিকষকৃষ্ণ।

—“আশ্চর্যা বিবিদি, চুলগুলো এমন Jet black কবে বেখেছেন কি মস্ত্রে?” হাসতে হাসতে বললাম। বিবিদি বল্লেন—“হ্যাঁ, তাই তো ওবা বলছিল, বিবিদি, কোন্ দোকানের কলপ মাখেন, বলে দিন তো নামটা। সত্যি আজকাল তো দেখি একটু বয়স হতে না হতেই চুল পাকে। আমাদের সময়ে সেই দেখতুম—” বাস, সুরু হয়ে গেল বিবিদিব গল্প। কত কত গল্পই সেদিন কবলেন, ববিকা'ব কত গল্প। এমন কি তাঁব যে নতুন কাকিমাকে নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের মাথাব্যথাব অন্ত নেই তাঁব কথাও অনেক গল্প কবলেন। সব শুনে

মনে হল, এ গল্পগুলি যদি বিবিদি ছাপাৰ হবফে শুনিযে যেতে পাৰতেন, তাহলে অনেকৰ কোঁতুহল মিটত। শুনতে শুনতে যেন মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। - যতবাবই উঠতে যাই বিবিদি বলেন “আব একটু বোস। এতদিন পবে এলে, তাও একদিনেব জন্তো।”

“সত্যি বিবিদি, শুধু আপনাব জন্তোই আসতে ইচ্ছা হয়।”

“কোথায় যাবে এখন? তোমাদেব সেই কলকাতায়? কি যে আছে তোমাদেব কলকাতায়, জানি নে বাপু। তোমাব এই কন্তোটা বুৰি লৱেটোয় পড়ে? আমাকেও মা লবেটোয় ভৰ্তি কৰিয়ে দিলেন। মা মনে কবতেন,.....” বাস, বিবিদিব আৱ এক ঝাঁক নতুন গল্প সুরু হয়ে গেল। উঠতে ইচ্ছে কবছিল না, তবু উঠতে হল। মনে হল যেন নিজেৰে ছিঁড়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক কবলাম, সামনেব মাসেই আবাব কদিনেব জন্তো এসে বিবিদিব মুখ থেকে সেকালেব গল্প কিছু টুকে নিয়ে যাব। কে জানত এই দেখাই শেষ দেখা। সেই উজ্জ্বল সহাস্য মূৰ্তি আব মাত্ৰ দুদিনেব জন্তো বয়েছে এই পৃথিবীতে।

১২ই আগষ্ট ৮৮ বছৰ বয়সে তিনি মহাপ্ৰয়াণ কবলেন। তখনো ববীন্দ্র-সপ্তাহ চলছিল। ইন্দিবা দেবীৰ তিবোধানে সে-যুগেব শেষ যোগসূত্ৰটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দী তাব কৰ্মে ও সাধনায় ভাবতেব নাবীৰ মধ্যে যে আদৰ্শ স্থাপনেৰ চেষ্টা কবেছিল, ববীন্দ্রনাথ তাঁব ভাবে ও জীবনব্ৰতে যে সমন্বয় সৃষ্টি কবতে চেয়েছিলেন, স্বৰ্গতা ইন্দিবাদেবীৰ মধ্যে তা মূৰ্ত্ত হয়ে উঠেছিল। প্ৰাচ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাব সাব অংশটুকু গ্ৰহণ কবেছিলেন ইন্দিবা,—হংসো যথা ক্ষীৰমিবাস্থমধ্যে।

পশ্চিমের কৰ্মদক্ষতা, নিবলসতা ও তেজস্বিতাকে ভাবতেব সতী নাবীৰ আদৰ্শ সত্যনিষ্ঠা, সেবা ও কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেবেছিলেন। কৰ্তব্যেৰ প্ৰতি একান্ত নিষ্ঠা কৰ্মক্ষেত্ৰে তাঁকে সফলতা দান কবেছে। চৰিত্ৰেব দৃঢ়তা তাঁকে সমস্ত প্ৰতিকূলতাৰ বিৰুদ্ধে অনমনীয় বেখেছিল। সুখেব সময় তাঁকে আমি দেখিনি। যে সময়ে তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁব খুব সুখেব সময় নয়। কিন্তু তাঁকে দেখে কে সেকথা বলবে?—

“অন্তৰ হতে আহবি বচন,

আনন্দলোক ৰুবি বিবচন

গীতবসধাবা কবি সিঞ্চন,

সংসাৰধূলিজালে।”

আজ তাঁব কথা লিখতে বসে চোখেব সামনে ভেসে উঠছে তাঁব স্নেহময়ী মূৰ্তি।—কাণে বেজে উঠছে সেই কণ্ঠস্বৰ।—বহুকালেব সাধা গলা, সৰ্বদাই একটু উঁচু সুবে বাঁধা থাকত।

তাঁব বৰিকা’ৰ আদৰ্শ তাঁব মধ্যেও বিকশিত হয়েছিল। তিনিও অন্তৰ হতে আহবি বচন, দীৰ্ঘ আশি বছৰ ধৰে গীতবসধাবা টেলে গেছেন। এবই নাম বোধ হয় যোগযুক্ত চিন্ত,—

দুঃখেষু অনুদ্বিগমনাঃ

সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

ধনে যেমন নির্ধনেও তেমনি ।—তাঁর অন্তবেব বসধাবা, কঠেব সুবধারা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি । কাবণ ধন ও নির্ধনকে অতিক্রম কবে যে অমৃতধাবা প্রাণকে প্রতিনিয়ত আনন্দের মধ্যে বিধ্বত বাখে, সেই অমৃতধাবায় তিনি শিশুকাল থেকে সিজ ছিলেন ।

তিনি পবিণত বয়সে পৃথিবীর কাজ শেষ কবে চিব আনন্দলোকে চলে গেছেন যেখানে—মধুব বাতাস, মধুব সাগর, মধুব ধবলীধূলি,—

মধু বাতা ঋতায়তে

মধু স্ফবন্তি সিন্ধবঃ ॥

মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ

মধুমং পার্থিবং বজঃ ।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইন্দিবা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত)

ভা র ত কো ষ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা Encyclopaedia এনসাইক্লোপীডিয়া

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

সুদৃশ্য বাঁধাই

সম্পূর্ণ সেট এক শত টাকা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

মানুষ মধুসূদন

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

মানুষ-মধুসূদন কেমন ছিলেন তাহাব কিছু কিছু আভাস তাঁহার জীবনী এবং বচনা হইতে পাওয়া যায়। আভাস বলিতেছি, কাবণ সম্পূর্ণ মানুষটির পবিচয় পাওয়া শক্ত। আমবা ঐহাদেব সংস্পর্শে প্রতাহ আসি, এমন কি ঐহাদেব আমবা বন্ধু বলিয়া দাবী করি, তাঁহাদেব আমবা চিনি কি? মানুষেব সম্পূর্ণ পবিচয় জানা প্রায় অসম্ভব। সব মানুষই মনে মনে বহুরূপী। কিন্তু তাহাব সামাজিক-আচাব-ব্যবহারে স্বেকপ কচিং প্রতিফলিত হয়। সামাজিক মানুষ একটা মুখোপ-পবা-মানুষ। কবি মধুসূদনেব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহাব মুখোপ ব্যবব্যব খুলিয়া পড়িত এবং ভিতরেব মানুষটির স্বরূপ প্রকাশ কবিয়া দিত। তিনি ভণ্ডামি কবিতে পাবিতেন না। ধনী বাজনারায়ণ মুঞ্জীর একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। বড় আদবেব পুত্র, জননী জাহুবীব নবনমণি। পুত্রে তাঁহাবা শাসন কবিতে পাবিতেন না, তাহাব সম্ভবত অসম্ভব সব আবদাবই পূর্ণ কবিয়া তাঁহাবা তাঁহাকে বিলাসী ও দুর্দমনীয় কবিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সহিত মিশিয়াছিল তাঁহাব কবি-প্রতিভা, তাঁহাব বঙ্গা-বিহীন কল্লনাব আবেগ, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁহার বিদ্রোহী মন, তাঁহাব দিলদরিয়া স্বভাব এবং হিন্দু-কলেজেব শিক্ষক ডিবোজিওব প্রভাব, যে প্রভাবেব মূল সুব ছিল—শিকল ভাঙে, শিকল ভাঙে, অগ্রগতিব বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ কব। বলা বাহুল্য দেশেব এই বিদ্রোহী আবহাওয়া সেকালেব যুবকদেব কেবল সংস্কারমুক্তই কবে নাই, উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছিল। মধুসূদনও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাঁহাব পিতা বাজনাবায়ণ বসুব সম্মুখেই তিনি মণ্ডপান কবিতেন। প্রকাশে গুরু-খাওয়া, কোর্টশিপ কবিয়া বিবাহ কবা, হিন্দুধর্ম ত্যাগ কবিয়া খ্রিস্টান হওয়া তখন প্রগতিব লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। মধুসূদন এই প্রগতিব খবত্রেতে গা ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রগতিব পটভূমিকায় মধুসূদনেব যে ছবি আমবা দেখিতে পাই তাহাতে সনাতন ভাবতীয় বং এবং প্রাচীন বাঙালী আভিজাত্যেব জৌলুসই বেশী পবিস্ফুট। অত্যন্ত সৌধীন বাবু ছিলেন তিনি। যখন হিন্দু কলেজে পড়িতেন তখন এদেশে মোটব ছিল না। হম্ভ্রো হম্ভ্রো শব্দে চতুর্দিক নিনাদিত কবিয়া তিনি পাল্কি চড়িয়া কলেজে আসিতেন। সঙ্গে তিনটা বাড়তি সুট থাকিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুট বদলাইতেন তিনি। তাঁহাকে ঘিবিয়া উৎকৃষ্ট আতবেব গন্ধ সর্বদা ভূব ভূব কবিত। সে আতব তিনি নিজেই কেবল ব্যবহার কবিতেন না, বন্ধুবান্ধবদেব মধ্যে বিতরণও কবিতেন। ভালো ভালো খাবাব এবং উৎকৃষ্ট মেদেব প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সে খাবাব ও মদ তিনি একা খাইতেন না; সবাক্বে খাইতেন।

তাঁহার বাড়ীতে এবং কখনও কখনও হোটেলের তিনি প্রায়ই সকলকে নিমন্ত্রণ কবিতেন, চৰ্চা চুষা লেখা পেয়া সামগ্রীৰ অজস্রতা তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সাক্ষ্য বহন কবিত। তিনি গণিয়া, মাণিয়া বা হিসাব কবিয়া কিছু কবিতে পাবিতেন না। এমন কি কুলী বা গাড়োয়ানকে যখন ভাড়া দিতেন তখন পকেটে হাত ঢুকাইয়া একমুঠো টাকা বাহিব কবিয়া না দিতে পারিলে তাঁহার তপ্তি হইত না। এই দিলদবিয়া মেজাজেব দাবী পূর্ণ কবিতে না পারিলে তিনি ক্ষেপিয়া যাইতেন। কেহ তাঁহার আভিজাত্যে আঘাত কবিলে তিনি প্রত্যাঘাত কবিতেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনি যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কবিয়া বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা কবিতেছিলেন তখন ‘নেটিভ’দেব প্রতি সাহেবদের মনোবৃত্তিৰ তীব্র প্রতিবাদ কবিয়াছিলেন। বিশপ্‌স্‌ কলেজে নিয়ম ছিল খাওয়াব শেষে প্রত্যেককে ‘ওয়াইন’ দেওয়া। মধুসূদন দেখিলেন ‘নেটিভ’দেব বেলায় প্রায়ই ‘ওয়াইন’ দেওয়া হয় না। অজুহাত, ওয়াইন না কি ফুবাঁইয়া গিয়াছে। মধুসূদন মদেব গ্লাস টেবিলের উপর চুবমার কবিয়া উঠিয়া আসিলেন। ‘নেটিভ’ শব্দটাই তিনি অপছন্দ কবিতেন। আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছিল। বিশপ্‌স্‌ কলেজেব ছাত্রদের জন্য একটি uniform ছিল। কিন্তু মধুসূদন দেখিলেন যে ইউনিফর্ম সাহেবদের জন্য যে বকম, নেটিভদের জন্য সে বকম নয়। তিনি প্রতিবাদ কবিলেন। বলিলেন, এ বিভেদ আমি মানিব না। আমি আমাদের নিজেদের জাতীয় পোষাক পবিয়া কলেজে যাইব। সাদা সিল্কেব কাবা, তছুপবি নানা কারুকার্যমণ্ডিত বড়ী শালের ক্রমাল, মাথায় শালের বহুবর্ণবিচিত্র পাগড়ি,—এই পোষাক পবিয়া তিনি কলেজে গিয়াছিলেন। নেটিভদের জন্য নির্দিষ্ট সাদা ক্যাসক বর্জন কবিয়া জাতীয় পোষাকে মণ্ডিত হওয়াটাই সেদিন গৌববজনক মনে কবিয়াছিলেন তিনি। সত্যই মধুসূদনের আত্মসম্মানবোধ খুব তীক্ষ্ণ ছিল। পববর্তী জীবনেব আব একটি ঘটনাৰ কথা মনে পড়িতেছে। তখন তিনি ব্যাবিস্টাব হইয়া প্র্যাকটিস্‌ কবিতেছেন। মধুসূদন কোর্টে জোব গলায় বজ্রতা দিতেন। হঠাৎ একদিন জাস্টিস্‌ Jackson বলিলেন,—The Court orders you to plead slowly. The Court has ears. মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—‘But pretty too long, my lord’.

জজ সাহেবের মুখেব উপব এ উত্তর তখনকাব দিনে সাধাবণ কোনও ব্যাবিস্টাব দিতে সাহস কবিতেন না। কিন্তু মধুসূদন সব বিষয়েই অসাধাবণ ছিলেন।

মানুষ মধুসূদনের আব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম-প্রবণতা। জীবনে তিনটি নাবীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তিনি। দেবকী, বেবেকা এবং হেন্‌বিশেটা। তিনজনকে কেন্দ্র কবিয়াই তাঁহার জীবনে প্রেমের প্রবল জোয়াব আসিয়াছিল। এ সব জোয়াবেব ইতিহাস তাঁহার প্রামাণ্য জীবনীগুলিতে আছে। সে সবেব আলোচনা এ প্রবন্ধে আমি কবিতে চাই না। কোনও কোনও আধুনিক গবেষক মনে করেন যে দেবকীর

সহিত তাঁহার নাকি কোনও সম্পর্কই ছিল না। এ সব আলোচনাও এ প্রবন্ধের পক্ষে অবাস্তব। তাঁহার প্রেমের ব্যাপারে যেটুকু প্রাসঙ্গিক এবং অসাধারণ তাহা এই যে শুধু তিনি মেয়েদের সম্বন্ধেই প্রেমোচ্ছ্বসিত ছিলেন না, পুরুষদের সম্বন্ধেও ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবা—জি ডি. বাইসাক্, ভোলানাথ, বঙ্কু, ভূদেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়, Vid—(বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি Vid বলিয়া ডাকিতেন)—ইঁহাৰা সকলেই ছিলেন তাঁহার প্রেমাস্পদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তো তিনি প্রকাশ্যে দিবালোকে সকলের সামনে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেন। তাঁহার এই আবেগপূর্ণ প্রেম নিবেদনে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইয়া পড়িতেন। পিতামাতাকেও খুব ভালবাসিতেন তিনি। কিন্তু ঝোঁকেব মাথায় খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সে ভালবাসা সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তিনি যখন মাদ্রাজে তখন তাঁহার মাতা জাহ্নবী দেবী বয়স্ক হইয়া। এ খবর শুনিয়া তিনি পিতাকে মাদ্রাজে লইয়া যাইবার জন্য গীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু বাজনাওয়ায় যাইতে বাজি হইলেন না। পিতার মৃত্যুর পৰ মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে বাংলা দেশে ফিবিয়া আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন তাঁহার জাতিবা তাঁহার পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবা তাঁহাকে জোর করিয়া খিদিবপুরে পাঠাইলেন। খিদিবপুরে গিয়া কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দেখিলেন বাজনাওয়ায় তৃতীয় পক্ষের বিধবা যুবতী দ্বীকে। ইঁহাৰ পৰ বিষয় লইয়া আলোচনা করা তখন আব সম্ভব হইল না। তিনি ফিবিয়া আসিলেন।

ভাবের আবেগেই তিনি সাবা জীবন চলিয়াছেন। যখন ব্যাবিস্টাব ছিলেন তখন কোন পাবিশ্রমিক না লইয়া একটি গবীৰ ব্রাহ্মণের হইয়া তিনি মোকদ্দমা লড়িয়াছিলেন, কাবণ ব্রাহ্মণটি সুগায়ক ছিল, যাত্রায় চমৎকার ‘সখী সংবাদ’ গাহিতে পাবিত। সাধারণ সাংসাবিক হিসাবে যাহাকে আমবা ‘উন্নতি’ বলি মধুসূদনের মতো লোকের পক্ষে সে বকম উন্নতি লাভ অসম্ভব ছিল। এ ধরণের উন্নতি লাভ করিতে হইলে সব দিক বাঁচাইয়া যে দিকে ছাট সেদিকে ছাতাটি ধরিয়া নিজেব কোলের দিকে ঝোল টানিয়া অগ্রসব হইতে হয়। মধুসূদনের প্রকৃতি ঠিক ইঁহাৰ বিপরীত ছিল। তিনি খেয়াল খুশীৰ নৌকায় হৃদযাবেগের পাল তুলিয়া দিয়া বিপদসঙ্কুল সাগরেও পাড়ি দিতে ইতস্ততঃ কবেন নাই। ধনী পিতাব একমাত্র পুত্র হিসাবে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে বিলাসজীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া সে সুযোগকে তুচ্ছ করিতে তিনি ইতস্ততঃ কবেন নাই। যেখানে একটু আপোস করিলে বা রফা করিলে নিজেব সুবিধা হয়, সেখানে তিনি নিজেব মতে নিজেব পথে চলিয়াছেন। বার বাব চাকরি পাইয়াছেন, কিন্তু চাকরি বাখিতে পাবেন নাই। ব্যাবিস্টারি ব্যবসায় করিতে বসিয়াও তিনি ব্যবসায়ীসুলভ মুখোস পবিত্তে পাবেন নাই, তাই সে ব্যবসায়ের

আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু উন্নতিব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাব কম ছিল না। মনে মনে ছিলেন তিনি রাজসিক ভোগী। বাশি বাশি টাকা মুঠা মুঠা খবচ কবাব দিকে তাঁহাব প্রবল প্রবণতা ছিল। কিন্তু সে টাকা তিনি উপার্জন কবিতে পাবিতেন না। ধাব করিতেন, দিখিদিব্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাব কবিতেন। বিছাসাগব মহাশয়, উমেশ বাবু, বাণী স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁহাব বন্ধুবা, এমন কি দোকানদাববা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধাব দিতেন। সকলে ভালবাসিতেন তাঁহাকে। তাঁহাব মধ্যে এমন কি একটা ছিল—কি অদ্ভুত প্রাণ-কাডা একটা আবেদন—যে কেহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কবিতে পাবিতেন না। টাকা মাবা যাইবে জানিযাও তাঁহাকে ধাব দিতেন। বিলাতেব দোকানদাববাও ধাব দিয়াছিলেন তাঁহাকে। ধাব শোধ কবিতে পাবেন নাই বলিয়া Grey's Inn হইতে একবাব তিনি সাসপেণ্ডেড্ হন, তাঁহাব ব্যাবিস্টাবি পডা কিছুদিনেব জন্ম পিছাইয়া যায়। এই অপবিণামদর্শী কবি তবু কিন্তু কিছুতেই থামিতে পাবেন নাই, হৃদম আগ্রহে জীবনেব শেষ পর্য্যন্ত ভোগেব ভোগবতীতে অবগাহন কবিয়াছেন। তাঁহাব প্রতিভাব মধ্যেও এই উদ্দামতা ছিল বলিয়া তিনি পযাবেব শিকল ছিঁড়িয়া অমিত্রাক্ষব চন্দেব উদাত্ত মহিমায আত্মহাবা হইয়াছিলেন, এই জন্মই ‘বাম এণ্ড হিজ ব্যাবেল্‌স্’ কে তাঁহাব ভালো লাগে নাই, ভালো লাগিযাছিল ত্রিভুবনজয়ী ভোগদৃগ্ধ বাবণকে। মনে মনে নিজেই তিনি বাবণ ছিলেন। সীতা অপেক্ষা প্রমীলাকেই তিনি যেন বেশী মনোবম কবিয়া আঁকিযাছেন। ‘বাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডবাই কডু ভিখারী বাঘবে?’—এই দস্তোক্তিব সহিত মধুসূদনেব প্রাণেব সুর যেন মিলিয়া গিযাছে। অতিশয় দান্তিক ছিলেন তিনি। নিজেব প্রতিভা সম্বন্ধে, নিজেব বিছাবত্তা সম্বন্ধে তাঁহাব নিজেব মনে সংশয়েব লেশমাত্র ছিল না। তাঁহাব সমসাময়িক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুচবণ দত্ত, ও. সি. দত্ত প্রভৃতি অনেকে তখন ইংবেজি ভাষায় সাহিত্য-চর্চা কবিতেন। মধুসূদনেব বিচাবে ইঁহাবা নগণ্য ছিলেন। তাঁহাব আদর্শ ছিল হোমাব, মিল্টন্, ভার্জিল, টাসো, শেক্স-পীয়ব, তাঁহাব চবিত্রে ছাপ ছিল শেলীব এবং বায়বণেব। সে যুগেব পাশ্চাত্য আধুনিকতাব এবং প্রতিভাব প্রতীক ছিলেন তিনি। মানুষ মধুসূদনেব উপবও ইঁহাব যথেষ্ট প্রভাব পডিযাছিল। কিন্তু মধুসূদন চবিত্রেব আব একটি বিশ্বয বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে চিবকাল স্বদেশী ছিলেন, বাঙালী ছিলেন, ভাবতীয় ছিলেন। তাঁহাব বচিত কালজয়ী সাহিত্যে ইঁহাব অজস্র প্রমাণ বর্তমান। এক ‘হেক্টব বধ’ ছাডা অন্য কোনও বৈদেশিক বিষয় লইয়া গ্রন্থ বচনা কবেন নাই। ‘হেক্টব বধ’ গল্প কাব্য, এটিও তিনি সম্পূর্ণ কবিয়া যাইতে পাবেন নাই। বিদেশীদেব লইয়া তাঁহাব কিছু ছোট ছোট কবিতা আছে—যেমন কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতব থিওডোব গোল্ডস্টুকাব, কবিবব আলফ্রেড্ টেনিসন্, কবিবব ভিক্টব হিউগো প্রভৃতি। তাঁহাব বাকি সমস্ত কীর্তি ভাবতবর্ষ ও বাংলা দেশকে কেন্দ্র কবিয়া মণিমাণিকাখচিত হৃদয়মালাব ন্যায়

দেদীপ্যমান। রামায়ণ, মহাভাবত, পুৰাণই তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিত্তি। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাঁহার বাঙালী মন বঙ্গদেশকে ঘিঘিয়া ঘিঘিয়াই যেন অর্ধা-বচনা কবিয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতার শিবোনাম উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণা বঁাপি, কাশীবাম দাস, কুন্তিবাস, জয়দেব, দেব-দোল, শ্রীপঞ্চমী, বটবৃক্ষ, মহাভাবত, সবস্বতী, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, কোজাগর লক্ষ্মী-পূজা, কেউটিয়া সাপ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্যামা পক্ষী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীমন্তেব চোপব। চতুর্দশপদী কবিতাগুলি বিদেশে—ভবসেন্স শহরে লিখিত। বিদেশে বসিয়াও তিনি জন্মভূমিকে ভোলেন নাই তাহার সাক্ষী এই কবিতা-গুলি। শুধু যে ভোলেন নাই তাহা নয় বাংলাদেশকে লইয়া তাঁহার কবি-প্রাণ সৌন্দর্য্যে সৌভবে যে বাববাব উথলিয়া উঠিয়াছে এই কবিতাগুলি তাহারও সাক্ষী। না, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁহার বাঙালীত্ব লোপ কবিত্তে পাবে নাই। জানি না মানুষ মধুসূদনেব চরিত্র আঁকিতে পাবিলাম কিনা। মধুসূদনেব চবিত্র, নীতিব দিক দিয়া, আদর্শ চবিত্র ছিল না। কিন্তু তাহা মন-ভোলানো মধুব চবিত্র। সর্বোপবি মহাকবি মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে দিগ্-দিগন্ত-উদ্ভাসী সমুজ্জল মহাপ্রাবন। সে প্রাবনেব মুখে তাঁহার সমস্ত দোষ ভাসিয়া গিয়াছে, চিবজীবী হইয়া আছেন মহাবাজাব আভিজাত্যে মণ্ডিত এক মহাকবি। তাঁহাকে বাববাব প্রণাম জানাই।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, ১৩৮০ পঠিত।)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১১শ খণ্ড

সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

মূল্য : ১২৫.০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কবি মধুসূদন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অসামান্য ব্যক্তিদের জীবনে অনেক সময়ে বিপবীত ভাবের অভূত সময় হয় দেখা যায়। না হলে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত মধুসূদন দত্ত কি ক'বে হ'লেন নবযুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা? যে পশ্চিমী সভ্যতাকে আমবা ভোগবাদী আখ্যা দিয়েছি, তাব অনুরাগী হয়ে কেমন ক'বে তিনি আমাদের কাব্যকে কুকচি-মুক্ত কবলেন আব, বিলাত যাঁব শয়নে স্বপনে ছিল তীর্থস্বরূপ, তাঁবই কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'ল দেশপ্রেমের বন্দনা?

বাইবে থেকে বিচার ক'বতে গিয়ে অনেক সময়ে আমবা ভুল কবি। বিজাতীয় বেশভূষাব অন্তবালে যে দেশানুবাগ প্রচ্ছন্ন থাকতে পাবে, ভোগিকাজ্ঞাব মধ্যেও কুকচিব প্রতি তীব্র বিবাগ নিহিত থাকতে পাবে, সে-কথা প্রায়ই ভুলে যাই। কোন কোন বিষয়ে অমিতাচার সত্ত্বেও সেদিনকাব নীতিভ্রষ্ট বাবু-সমাজ থেকে মধুসূদন বহু—বহু দূববর্তী। নিন্দা প্রশংসা দুই-ই সেদিন তাঁব ভাগ্যে জুটেছিল। শক্তিমান্দেব ভাগ্যে চিবদিন তাই জোটে। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' এবং 'মেঘনাদ-বধে' তিনি যে অমিত্রাক্ষব ছন্দেব অবতাবণা করলেন, তাব কল্লোলধ্বনি এবং দৃপ্ত গতিভঙ্গী অনেককে মুগ্ধ কবল, আবাব কেউ কেউ ওব ভাষায় উৎকট অসঙ্গতি লক্ষ্য কবলেন।

অসঙ্গতি হয়তো দুই এক স্থানে ছিল, কিন্তু তাব দৃষ্টান্ত বেশী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক শিল্পী। শ্রুতি-মাধুর্যেব জন্ম কত জায়গায় যে তিনি ভাষা সংশোধন কবেছেন, তাব নিদর্শন আছে তাঁব পত্রাবলীতে।

মেঘনাদ-বধেব দ্বিতীয় সর্গে প্রথমে লিখেছিলেন “আইলা তাবা-কুন্তলা”; পবে বদলে লিখলেন, “আইলা সুচারু তাবা”; বন্ধুব কাছে কাবণ নির্দেশ কবলেন: Now you improve the music of the line, because the double syllable mars the strength of লা। Read: “আইলা সুচারু তাবা শশীসহ হাসি’ / শর্ববী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে।”

সংহত ভাষায় ভাবকে গাঢ় ক'বে তুলতে তিনি প্রায়ই যত্নবান্। একটি দৃষ্টান্ত: “কত যে ফুলেব দলে প্রমীলাব আঁখি / মুক্তিল শিশিব-নীবে, কে পাবে কহিতে।” [মে. ব.—৩য় সর্গ] অশ্রুব সঙ্গে মুক্তা ও শিশিবেব তুলনা কত সংক্ষেপে এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। ছন্দেব কলা-কৌশলে ভাবতচন্দ্রেব দক্ষতা সামান্য ছিল না। কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যবীতি অনুশীলন কবে আবও নূতন বহুস্বৈব সন্ধান পেয়েছিলেন। হ্রস্ব-দীর্ঘস্বব এবং যুক্ত অযুক্ত ব্যঞ্জনেব নিপুণ বিদ্যাসে তিনি যে ধ্বনি-তবঙ্গ সৃষ্টি ক'বেছিলেন, তাব অনুকূপ পুৰোনো বাংলা সাহিত্যে কোথাও কিছু নেই। কোমল লালিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিবল নয়, কিন্তু

গান্ধীৰ্ঘ-সৃষ্টিৰ এমন নিদৰ্শন সেখানে অনুপস্থিত। “অলঙ্ঘ্য সাগর-সম বাঘবীয় চমু / বেড়েছে তাহাবে”—এখানে অলঙ্ঘ্য শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জন, পূৰ্বস্বরের দীৰ্ঘায়ন, সাগর ও বাঘবীয়—দু’টি শব্দের আ-কাব এবং দীৰ্ঘ-ঙ্-কাব যে তবঙ্গ-সঙ্গীত ও সাগর-বিস্তারের ব্যঞ্জনা এনেছে, তা অতুলনীয়। ভাবানুসাবী ধ্বনির এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে তাঁর কাব্যে।

“তুঙ্গ শৃঙ্গধবাকাবো তবঙ্গ-আবলী / কল্লোলিল বায়ুসঙ্গে বণবঙ্গে মাতি।” [মে. ব. ২য় সর্গ]

“বাহিরিল অগ্নিবর্ণ বথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বাবণ, আশ্ফালি’
ভীষণ মুদগব শুণ্ডে ; বাহিবিল-হ্রেষে
তুবঙ্গম, চতুবঙ্গে আইলা ধাইষা
চামব অমবত্রাস , বথীরন্দসহ
উদগ্র সমবে উগ্র , গজবন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবন্দ মাঝাবে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র কবে।”

[মে. ব. ৭ম সর্গ—‘শক্তিনির্ভেদ’]

যুদ্ধযাত্রাব বিপুল সমাবোহ এবং ক্ষিপ্ৰ গতি মূর্ত হয়ে উঠেছে এ বর্ণনায়। আব, লক্ষণীয় শব্দ-সজ্জা। অন্ত্যমিলেব পবিবর্তে সুমিত অনুপ্রাস ও যমক এনেছে চমৎকাবিত্ব। ছত্রশেষে পূর্ণ যতি নেই ; ভাব প্রসারিত হয়েছে পরবর্তী পংক্তিতে, এনেছে প্রবল প্রবাহ।

সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য নিয়ে তৎকালীন সমালোচকেরা কেউ কেউ কটাক্ষ ক’রেছিলেন। কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগী বলিষ্ঠ-ভাষা সৃষ্টির জন্য এৰ প্রয়োজন ছিল। ববীন্দ্রনাথের কথায়, “সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তবঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্ববেব হ্রস্ব-দীৰ্ঘতা এবং যুক্ত অঙ্গবেব বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দেব এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাব অমিত্রাক্ষবে এমন পবিপূর্ণ ধ্বনি এবং তবঙ্গিত গতি অনুভব কবা যায়।” [আধুনিক সাহিত্য : বিহাবীলাল। পৃ. ২৯]

ভাষা ও ছন্দেব নব রূপ নির্মাণই বোধ হয় মধুসূদনেব শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁব অমিত্রাক্ষবেব অনুকরণ অনেক হয়েছে, কিন্তু কোনটিই উৎকর্ষে সম-মানেব হয়নি। তা ছাড়া ঐ অমিত্রাক্ষব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে পরবর্তী কালেব প্রবহমান পযাব, গৈবিশ ছন্দ এবং বলাকাব মুক্তক ছন্দ। ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাসেব প্রসঙ্গে নিশ্চয় আর্মবা লক্ষ্য কবব বাবণেব যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায় যুক্তাক্ষবেব বাহুল্য, আবাব অশোক বনে বন্দিনী সীতাব চিত্রে যুক্তাক্ষব-বিবল কোমল শব্দাবলীৰ প্রয়োগ।

‘বীরাঙ্গনা’ব প্রেম-পত্ন-বচনায় অমিত্রাক্ষব নূতনতব রূপ নিয়েছে। অভিমান, আৰ্তি

বা বিবহ প্রকাশেব, পক্ষে যে ভাষা স্বাভাবিক, সেখানে তারই প্রয়োগ। যেমন, ‘শকুন্তলা-পত্রিকা’—“কাপে হিয়া ছুরুছুক কবি / শুনি যদি পদশব্দ।” ‘কেকযী-পত্রিকা’ :

“বাডালে যাহাব মান, থাক তাব সাথে
তুমি। বামদেশে কোশল্যা মহিষী,
(এত যে বযেস ; তবু লজ্জাহীন তুমি),
যুববাজ পুত্র বাম, জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধু। এ সবাবে ল’য়ে
কব ঘব নববব, যাই চলি আমি।”

আবাব, ‘সূৰ্পণখা-পত্রিকা’ষ :

“লয়ে তবী সহচরী থাকিবেক তীবে,
সহজে হইবে পাব। নিবিড সে পাবে
কানন, বিজন দেশ। এস গুণনিধি,
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি’ হে দু’জনে।”

শুধু অমিত্রাক্ষব নয়, মিত্রাক্ষবেও নব নব রূপ উদ্ভাবনে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার প্রমাণ বর্তমান। তাঁর অমিত্রাক্ষব পয়াব-ভিত্তিক; চতুর্দশপদীও তাই। মিল-বন্ধনের কলা-কৌশলে তিনি সনেটেব বৈশিষ্ট্য এনেছেন চতুর্দশপদী কবিতায়। ভাবের ও ভাষার গাচতায় কোন-কোন অংশ অসাধারণ। যেমন, ‘শ্লাশান’ কবিতায় :

“জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি’।
গহন কাননে বায়ু উডায় যেমতি
পত্রপুঞ্জে, আয়ুকুঞ্জে কাল, জীববাশি
উডায়ে এ নদ-পাবে তাডায় তেমতি।”

‘নূতন বৎসবে’ :

“ডুবিবে সত্ত্ববে
তিমিবে জীবন-ববি। আসিছে বজনী
নাহি যাব মুখে কথা বায়ুরূপ স্ববে,
নাহি যাব কেশপাশে তাবা-রূপ মণি।”

প্রয়োগ-কৌশল যতই থাকুক, কেবল শব্দযোজনাতেই প্রকৃত কবিত্ব নয়, এ বিষয়ে তিনি সচেতন। কবি কে? “শব্দে শব্দে বিয়া দেয় যেই জন”—সে নয়।

“সেই কবি মোব মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যাব মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অন্তগামি-ভানুপ্রভা-সদৃশ বিতবি’

ভাবের সংসাবে তাব সুবর্ণ-কিরণ।” [‘কবি’। চ. ক.—১৬]

কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা নিবাশাব আন্তরিক প্রকাশ এই চতুর্দশদী কবিতাবলীতে। অধিকাংশের বচনাস্থল ফ্রান্সের ভেনিস, কিন্তু দেশের ছবি, দেশের স্মৃতিই কবির মন জুড়ে আছে। শৈশবে-দেখা কপোতাক্ষ নদ, শিবমন্দির, বটবৃক্ষ, বিজয়া দশমী, দেব-দোল, শ্রীপঙ্কমী, অন্নপূর্ণা বঁাপি, ঈশ্বরী পাটনী, আব তাবই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি,—এই হ'ল কবিতাগুলির বিষয়।

বিভিন্ন গীতি ও নীতি-কবিতায় তিনি ছন্দ-বচনায় যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তা অবধান-যোগ্য। ‘ব্রজাঙ্গনা’র ললিতভঙ্গী কখনও কখনও জয়দেব ও ভাবতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চব্বাশ্বে পঞ্চমাত্রিক পর্বের দোলা মধ্যযুগীয় কাব্যে বিবল। ভাবতচন্দ্রে পাই : “কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে, / বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।” ‘ব্রজাঙ্গনা’য় আছে ঈষৎ অন্যূপ, কিন্তু অমনি দোল-লাগানো ছন্দ :

“কেন এত ফুল তুলিলি স্বপ্ননি, ভবিষ্য ডালা,
মেঘারত হ’লে পবে কি বজ্রনী তাবাব মালা ?
আব কি যতনে কুসুম-বতনে ব্রজেব বালা ?” [ব্র. ৮। ‘কুসুম’।]

আধুনিক পাঠকের হয়তো মনে পড়বে ববীন্দ্রনাথের

“বুঝেছি আমার নিশাব স্বপন হয়েছে ভোব,
মালা ছিল, তাব ফুলগুলি গেছে, বয়েছে ডোর।”

মধুসূদনের কবিতাটিতে আব একটু নূতনত্ব আছে, পব পব তিন চরণে অন্ত্যমিল। সাধাবণতঃ দুই চরণের অন্ত্যমিলে আমবা অভ্যস্ত।

লঘু লালিত্যের দৃষ্টান্ত আবও আছে ‘ব্রজাঙ্গনা’য়। “পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, উছলে সুরবে জল, চল লো বনে। / চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজ-বমণে।” [ব্র. ১৮। ‘বসন্তে’।]

অবশ্য, এ জাতীয় ছন্দ-হিলোল বৈয়াকব পদাবলীতে অপবিচিত নয়।

‘আত্মবিলাপ’ এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবির অকৃত্রিম মর্মবাণী, সে-যুগের দু’টি উল্লেখ-যোগ্য গীতি-কবিতা।

নীতিমূলক কবিতাগুলি নিয়ে বেশী আলোচনা হয়নি। কিন্তু ছন্দঃ ও প্রকাশ-বীতির দিক্ থেকে এদের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। ‘বলাকা’য় যে মুক্তক বা অসমমাত্রিক চব্বাশ্বে ব্যবহাব লক্ষ্য করি, তার পূর্বাভাস হয়তো এইখানে।

“ঘুচাও কলঙ্ক, শুভঙ্কবি,
পুত্রের কিস্কব আমি, এ মিনতি কবি
পা দু’খানি ধবি।” [ময়ূব ও গৌরী]

অথবা,

“একটি সন্দেশ চুবি কবি,
উঠিয়া বসিলা ব্রহ্মোপবি
কাক হৃষ্ট মনে।

সুখাভেব বাস পেয়ে
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে ছুঁটা মধুব বচনে।” [কাক ও শৃগালী]

কিংবা,

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুইজন।
দূব দেশে যাইতে হইল,
দু'জনে চলিল।
ভয়ানক পথ, পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শাদুল তাহে গর্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিববে,
তদ্বব লুকায়ে থাকে গিবিব গহ্বরে,
পথিকেব অর্থ অপহবে,
কখন বা প্রাণনাশ কবে। [গদা ও সদা]

পংক্তিগঠনের বৈচিত্র্যে এসকল স্তবক স্পষ্টতঃ মনে কবিষে দেয় ববীন্দ্রনাথের—
“কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমস্থনে
উঠেছিল দুই নাবী” [দুই নাবী। বলাকা।]

অথবা,

“হে বিবাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল,
অবিচ্ছিন্ন অবিবল
চলে নিববধি।” [চঞ্চলা। বলাকা।]

‘মেঘনাদ-বধ’ তাঁর সর্বপ্রধান বচনা ব’লে প্রসিদ্ধ, এবং এ কাব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম হয়নি। তাঁর সময়ে অভিযোগ ছিল, তিনি পৌরাণিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ কবেছেন, বাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদকে বড়ো কবেছেন। ববীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের সমালোচনাযও সেই ভ্রুটিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল : “মেঘনাদ-বধ কাব্যে ঘটনাব মহত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।” এ কালে বুদ্ধদেব বসুও মেঘনাদ-বধ কাব্যের মহত্বকে একটা ‘হ্রস্বতম কুসংস্কার’ বলে কটাক্ষ কবেছেন। অথচ এ কাব্য আজও তাব গৌরবের স্থানে ‘অচলপ্রতিষ্ঠ’। তাব মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে প্রকাশ কবতে চেয়েছে। ববীন্দ্রনাথের পববর্তী রচনায় সে সত্যের স্বীকৃতি আছে।

“মেঘনাদ-বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও বচনা-প্রণালীতে নহে, তাহাব ভিতবকার ভাব ও বসেব মধ্যে একটা অপূর্ব পবিবর্তন দেখিতে পাই। এ পবিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। কবি পয়ারেব বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং বাম-বাবণেব সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি-ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহাবও শাসন ভাঙিয়াছেন।...যে ধর্মভীকতা সর্বদা কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন কবিয়া চলে, তাহাব ত্যাগ, দৈন্ত্য, আত্মনিগ্রহ—আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ কবিতো পাবে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিব প্রচণ্ড লীলাব মধ্যে আনন্দবোধ কবিয়াছেন। এই শক্তিব চাবিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহাব হর্যাক্ষুড়া মেঘেব পথ বোধ কবিয়াছে; ইহাব বধ-বখি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান।... অল্পভেদী ঐশ্বর্য চাবিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিশাং হইয়া যাইতেছে, ...তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর ধ্বন্যশেব মাঝখানে বসিয়াও কোনমতে হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভেব পরাভবে সমুদ্রতীব্রব শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যেব উপসংহাব কবিয়াছেন।”

কবিবা পাবিপাশ্বিক জীবন ও সমাজ থেকে বস আহবণ করেন এবং নিজেদের মনঃপ্রকৃতিব অনুসরণ কবেন। যে-যুগে ত্যাগ তিতিক্ষা বৈবাগ্যেব আদর্শকে সমস্তমে দুবে সবিয়ে আমবা পৃথিবীকে ভোগ কববার মস্তে দীক্ষা নিষেছি, সেই যুগে আমাদের কবি,—বিশেষ ক’বে যে-কবি শক্তি ও ঐশ্বর্য়েব স্বপ্নে বিভোব,—যদি প্রাচীন ত্যাগমস্ত্র শোনাতে চাইতেন, তবে তা আন্তরিক হ’তনা এবং সম্ভবতঃ আমাদের তেমন আকৃষ্ট ক’রত না। মধুসূদন সত্যকাব কবি ব’লেই মনেব সঙ্গে ছলনা কবেননি। আব, বাবণ ও মেঘনাদ-চবিত্রেব মহিমাও সম্পূর্ণ পুবাণ-বিবোধী নয়। তাঁদেব আদর্শকে শ্রেয়ঃ বলে স্বীকাব না কবলেও তাঁদেব শৌর্য বীর্য জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পবিচয় স্বয়ং বাঙ্গালীকিই দিখে গেছেন।

দোষ-ত্রুটি বিচাব ক’রতে বসে যা-ই বলিনা কেন, বর্তমান যুগেব তিনিই যে পুবাধা এবং তাঁর প্রতিভা যে একই সঙ্গে যুগন্ধব এবং যুগাতিশাষী, একথা অস্বীকাব কববার উপায় নেই। আবও বিস্ময়েব বিষয় এই যে, মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, নাটকে নূতন নূতন সৃষ্টিব ঐশ্বর্য়ে তিনি সকলকে চমকিত ক’বে দিয়েছিলেন প্রধানতঃ তিনটি বছরেব মধ্যে। ১৮৫৯—৬২ ব মধ্যেই প্রকাশিত হযেছিল ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘পদ্মাবতী’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’, ‘বুড়োশালিকেব ঘাডে বোঁ’, ‘তিলোত্তমা-সম্ভব’, ‘মেঘনাদ-বধ’, ‘ব্রজাঙ্গনা’, ‘বীরাঙ্গনা’ এবং ‘কৃষ্ণকুমাৰী’। পববর্তী বাবো বছরেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য বচনা ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’, গল্পে বচিত অসম্পূর্ণ ইলিয়াড-কাহিনী ‘হেষ্টিব-বধ’ এবং একখানি নাটক ‘মাল্লা-কানন’। আব দু’একটি অসম্পূর্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু বোঝা যায়, ইউরোপ থেকে ফিবে আসার পব তাঁব জীবন থেকে জোয়ারের জল সবে গেছে।

স্বাধী সাহিত্যরূপে গণনীয় না হ'লেও ইংবেজী কাব্যে এবং অনুবাদে তাঁব প্রতিভাব আব-একটি দিক্ উন্মোচিত। ভাষা আয়ত্ত কববাব ক্ষমতা যে তাঁব কত আশ্চর্যজনক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে চিঠিপত্রে। ২৪ বছৰ বয়সে যখন বাতী ছেড়ে মাদ্রাজে গিয়ে কোনমতে নিজের পায়ে দাঁড়াবাব চেষ্টা কবেছেন, তখনও ফুলের কাজ, সাময়িক পত্রের লেখা ইত্যাদিৰ সঙ্গে বোজ কাটিন ক'বে পড়েছন হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংবেজী, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত। আবাব যখন ফ্রান্সে জ্বী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বিব্রত, ঋণেব দায়ে কাবা-বাসেব আশঙ্কা, তখন বন্ধুকে জানাচ্ছেন: “ফবাসী আয়ত্ত কবেছি, ভালোই বলতে পাৰি, লিখতে পাৰি আবও ভালো। ইটালিয়ান এবং জার্মানও শিখছি। ইউৰোপ ছেড়ে যাবাব আগে স্প্যানিশ এবং পৰ্তুগীজও শেখবাব ইচ্ছে আছে।”

কবি-মন নিয়ে তিনি সংসাবে এসেছিলেন, কাব্যস্বপ্নই তাঁকে আমবণ আকুল ক'বেছে; ক্লট বাস্তব পৰিবেশেব সঙ্গে কোনদিন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পাবেননি। শেলিব বেদনা বেজেছিল তাঁব কবিতায়—“I fall upon the thorns of life, I bleed.” মধুসূদনেবও হৃদয়েব অন্তস্তল থেকে উঠেছিল হাহাকাব: “আশাব ছলনে ভুলি” কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।”

তাঁব জন্মদিন থেকে দেডশ' বছৰ আজ অতিক্রান্ত। দুঃখক্লিষ্ট অভিমানী কবিকে তাঁর দেশ ভোলেনি। গঙ্গাতীবে আমবা তাঁকে স্মরণ কবছি, পদ্মাতীবে, কপোতাক্ষ-তীবেও তাঁব স্মৃতি আজও অম্লান। একটি বাসনা তাঁব পূর্ণ হয়েছে, বঙ্গভূমিৰ ‘মনঃ কোকনদ মধুহীন’ হয়নি, কোনদিনই হবেনা।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ্ মন্দিবে মাইকেল মধুসূদন দত্তেব সার্বশত জন্মবার্ষিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, ১৩৮০ পঠিত।)

স্মারক গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেব ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরেব সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালাব চিবস্মরণীয় মনীষী ও লেখকদেব নির্বাচিত দুস্ত্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন।

বাঙ্গালাব “ইতিহাস, পুৰাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া পৰিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলিৰ পরিচয় কোঁতুহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক গ্রন্থে এই পাইবেন।

মূল্য পনেব টাকা।।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটে বাঙলাৰ অলঙ্কাৰ শিল্পৰ ভূমিকা

শ্ৰীভোলানাথ ভট্টাচাৰ্য

(পূৰ্বানুৱৰ্ত্তি)

॥ সাত ॥

মধ্যযুগ বলতে আমবা চতুৰ্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকেৰ মধ্যভাগ পৰ্যন্ত বোঝাতে চেমেছি। যদিও এই কালবিভাজন-অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক ও বাৰ্জনৈতিক ইতিহাস-নিৰ্ভৰ, অলঙ্কাৰেৰ ক্ষেত্ৰে এবকম কোন সন্ধিপৰ্ব লক্ষ্যগোচৰ নহ, তবু সাধাৰণভাবে একথা হয়ত বলা চলে যে বাঙলাৰ বাৰ্জনৈতিক যুগপৰিবৰ্তন ক্ৰমশঃ সামাজিক পৰিবৰ্তনেৰ প্ৰবৰ্তক হয়েছিল এবং সকলেই জানেন যে শিল্প ও কাককলাৰ পৰিবৰ্তন সমাজ বিবৰ্তনেৰ সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বহুদিন পৰ্যন্ত এই মধ্যযুগ প্ৰাচীন ঐতিহ্যকেই বহন কৰে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুন্তবে মুঘলদৰবাৰ থেকে আগত বিবিধ প্ৰভাবকে আত্মসাৎ কৰে সেই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতিও চলেছে তলায় তলায়। এই বিস্তীৰ্ণ কালৰ মध्ये আবাব প্ৰাক্চৈতন্যযুগকে অলঙ্কাৰযুগ বলা চলে, প্ৰধানতঃ বাৰ্জনৈতিক অস্থিৰতা ও সামাজিক বন্ধাত্বেৰ জন্ম। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্য-পৰবৰ্তী যুগে বাঙলাৰ যে নবজাগৰণ দেখা দেয়, সমসাময়িক সাহিত্যে অলঙ্কাৰেৰ বহুল বৰ্ণনায় মনে হয় মানুহেৰ সৌন্দৰ্যসাধনাৰ অঙ্গস্বৰূপ প্ৰসাধনচৰ্চাৰ এই শাখাটি তা থেকে বাদ পড়েনি।

এই যুগেৰ অলঙ্কাৰ সম্পৰ্কিত উল্লেখৰ উৎস মুখ্যতঃ দুটি—মঙ্গলকাব্য সমেত সাহিত্য এবং বৈদেশিক বিবৰণ। এ-ছাড়া বাদশাহী দলিল ও ইতিহাস আছে। প্ৰধান প্ৰধান সাহিত্যকৰ্মে সনাতন অলঙ্কাৰেৰ পুনৰানুৱৰ্ত্তিই যেন শুনতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্ৰেৰ গীত, ময়নামতীৰ গান, মনসামঙ্গল (যথাক্ৰমে পুৰুষোত্তম, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, গঙ্গাদাস সেন, কেতকাদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজবসিক প্ৰণীত), দ্বিজ কালিদাসেৰ কালিকামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য (যথাক্ৰমে মাধবাচাৰ্য, কবিকঙ্কণ ও ভবানীশঙ্কৰ দাস প্ৰণীত); বামাষণ (কৃত্তিবাস ও অভুতাচাৰ্য প্ৰণীত), কাশীবাম দাসেৰ মহাভাবত ও শঙ্কৰ দাসেৰ ভাগবত ইত্যাদি গ্ৰন্থে যেসব অলঙ্কাৰেৰ বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় তাৰ একটা তালিকা এইভাবে দেওয়া যেতে পাৰে : ১) শিবোভূষণ—সিঁথি, (বত্ত) মুকুট, সোনাৰ চিকনী, কনকফুল, কনকচাঁপা, ঝাঁপ ও পঞ্চফুল। ২) কৰ্ণাভবণ—কুণ্ডল, কৰ্ণফুল, কানবালা চাকা ও বলি বা চাকি বোলি, হীৰাধৰ কড়ি, বীৰ বোলি, মাকড়ি। ৩) নাসিকান্তবণ—বেসব বা বেশব। ৪) কণ্ঠাভবণ—হাব, গ্ৰীবাপত্ৰ, সাতেসবি বা সতেশ্ববি বা সাতলহব হাৰ, মুকুতাৰ বলী, কণ্ঠমাল, সূতলি হাব, গজমুজাব হাৰ, সুবৰ্ণেৰ পাঁতিহাৰ ও সব্বভী

হাব। ৫) বাহুভূষণ—অঙ্গদ, কেয়ূব, বাজু বা বাজুবন্ধ, -মাছলি ও তাদ। ৬) নিম্নবাহু-ভূষণ—বল্লচূড় (ওপবেব অংশেব নাম সবল, মধ্যাংশ চূড় এবং সামনেব দিকেব নাম কঙ্কণ), বালা, বলয় ও চুড়ি, কনক বাহুটি, শঙ্খ (বিভিন্ন রূপান্তবেব নাম লক্ষ্মীবিলাস, বামলক্ষণ, গজদন্ত ইত্যাদি)। ৭) অঙ্গুষ্ঠাভরণ—আঙ্গুঠী, বামুদডী, বহু-অঙ্গুঠী ও সুবর্ণ অঙ্গুঠী। ৮) পৃষ্ঠভূষণ—থোপনা। ৯) কটিভূষণ—কিঙ্কিণী, বাঘাঘব, নীবিবন্ধ ও রশনা। ১০) পদাভরণ—খাড়ু, মগব বা মকবখাড়ু, মল্ল-তোডব, বাঁকপাতা মল, উঁচুট বা উজ্জটিকা বা পাগুলি, নুপুব ও ঘুঘুব।

কিছু কিছু বৃদ্ধিমূলক অলঙ্কারেব উল্লেখ মধ্যযুগেব সাহিত্যে মেলে। যেমন, যোদ্ধার অঙ্গে থাকত বগটোপ, টোপব বা হেলমেট, তাড-বা আর্মলেট, বালা বা ব্রেসলেট, নুপুব ও কিঙ্কিণী। ব্যাধেব গলায় ঝুলন্ত লোহাব কাঠিব মালা, তাতে থাকত বাঘনখেব পেণ্ডেণ্ট আব কানে থাকত স্ফটিকেব কানফুল। বাখাল ছেলেবা পরত তাড, বালা ও কুণ্ডল, বনফুলেব মালা, বিশেষ কবে গুণ্ডাব মালা ছিল তাদেব খুব প্রিয়। চন্দনেব অলঙ্কার তিলকা কাটতেও তাবা খুব উৎসাহী ছিল। যোগী কিংবা যোগিনীকে চেনাব সব চাইতে সহজ উপায় ছিল এই যে এঁবা তামাব তৈবী কুণ্ডল পবতেন কানে। চাঁদ সদাগবেব মত বিলাসী বণিকেবা বজ্রত-পাছুকা ব্যবহার কবতেন। মুসলমান বাজপুরুষেবা বাঙালী ও অবাঙালী উভয় প্রকাবেব নর্তকী ও গায়িকাদেব সমাদব কবতেন, তাব মধ্যে আবাব এঁদেব বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন লুলিযানী ও কলাবন্তবা। পৃথক পল্লীতে বাস কবলেও বাববনিতাকুলও এই শ্রেণীব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। নটী ও নর্তকীকুল বঙবেবঙেব পোষাক পবে ফুলসাজে সেজে নানাবিধ অতিমূল্যবান অলঙ্কার পবত। অনুমান কবা অসম্ভব নয যে সেই সেনযুগেব বাববামা ও দেবদাসী জাতীয় বাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সভা-কামিনীদেব সময় খেদে মধ্যযুগেব নর্তকী, বাঙ্গী ও নটীদেব মধ্য দিষে সবশেষে ভাঙ্গা নবাবী আমলেব শহবেব বাববনিতাবা অলঙ্কার, প্রসাধন ও সাজসজ্জাব ব্যাপাবে সমাজে রুচি পত্তনেব নেতৃত্ব দিষে এসেছে।

কৃষ্ণকীর্তনে সোনা, হীবে এবং অন্যান্য বস্ত্রপ্রস্তুবেব যে উল্লেখ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে সবিশেষ সামাজিক সমৃদ্ধিব পবিচায়ক। ‘দই চাই’ বলে হৈকে যায যে গোয়ালিনী বাধা, তাবও হাতে সোনাব চুবড়ী, রূপোব ঘড়ী। খাট-পালঙ্ক তাও সুবর্ণমণ্ডিত। তবে সাধাবণভাবে মধ্যযুগে বিত্তশালী ব্যক্তিবা দরিদ্রদেব তুলনায় অলঙ্কারেব পেছনে ঢেব অর্থব্যয় কবতেন, প্রভূত পবিমাণে সোনাব গহনা ও হীবা-জহব ব্যবহার কবতেন। ধনীব ছালাল মাট্রেই মূল্যবান গহনা পবত, পায়ে মগব-খাড়ু ছাড়াও পবত বস্ত্রখচিত হাব, বালা, তাড ও কর্ণাঙ্গুঠী। সাধাবণ গৃহস্থকে অবশ্য কম দামেব এমনকি শাঁখেব গহনা পবে সাধ মেটাতে হত। কাঁসা ও কলাইকবা গহনা, রূপোব বলি, তামাব মল এবং হাতীব দাঁতেব আংটিতে সাধাবণ মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হযেছে।

এ সময়কাল বিদেশী পর্যটকের বিবরণীর মধ্যে ইবন বতুতাব কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর বিবরণীর আবেক জায়গায় দেখা যায়, এদেশ থেকে তখন সোনা, রূপো ও লোহা বণ্টানী হত। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত ভেনিসীয় বণিক নিকলো কন্স্টিজানাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপো, মূল্যবান বস্ত্রপ্রস্তুত ও মুক্তা প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ বণিক দুয়ার্তে বাববোসা বলেছেন যে সম্রাস্ত মুর বা মুসলমানবা কোমবে বাথে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত ছোবা ও আঙ্গুলে পবে বস্ত্রখচিত আংটি। এঁদের অন্তঃপুরিকাবা বস্ত্রখচিত স্বর্ণালঙ্কার পবেন। পঞ্চদশ শতকের চীনা পর্যটক শিঙ চা শেঙ লান্ দেখেছিলেন যে মুসলমান বমণী প্রস্তুতখচিত স্বর্ণনির্মিত মাকড়ি কানে পড়ত, গলায় ঝুলত পেণ্ডেন্ট। কজী ও গোড়ালিতে থাকত সোনা ব্রেসলেট, হাতে ও পায়ের আঙ্গুলে আংটি। ষোড়শ শতকের আর এক চীনা পর্যটক শি ইয়াঙ চাও কুঙ্ তিয়েন্ লু একই বকম বর্ণনা বেখে গেছেন। ঐ সময়কাল ব্রিটিশ পরিব্রাজক র্যালফ্ ফিচ্ বাকুলা অঞ্চলে মেয়েদের রূপোর বলি এবং রূপো, তামা ও হাতিব দাঁতের অগ্ন্যান্ত্র অলঙ্কার পবতে দেখেছেন। প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে টমাস বাউবে যে বর্ণনা বেখে গেছেন তাতে হীবা ও মুক্তাখচিত সোনা ও রূপোর অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। ফরাসি পরিব্রাজক জে. বি. ট্যাভার্নিয়েব ঢাকা ও পাটনায় দেখেছিলেন দু' হাজারের বেশি কাবিগব পাথরের জিনিস বানাচ্ছে, তাব মধ্যে কচ্ছপের হাড় ও সামুদ্রিক প্রাণীব হাড় দিয়ে তৈরি ব্রেসলেট ও প্রবালের মালাদানা আছে। শেখোক্ত বস্তুগুলি ত্রিপুরা ও আসামে বণ্টানী হত তাব বিনিময়ে ত্রিপুরা থেকে আসত নিকট মানের সোনা। ত্রিপুরা আবাব চীনে সোনা বণ্টানী কবে রূপো নিয়ে আসত। বিষাদ-আল-সলাতিন এবং তাবিখ-ই-ফিবিশ্ তাহ্ অনুসাবে, বাঙলাব সম্রাস্ত ব্যক্তিব সোনাব খালাষ খেতেন, এক সময়ে উৎসব-পার্বণে কে কতগুলো সোনাব খালা বাব করতে পাবেন তাই দিয়ে সামাজিক মর্যাদাব বিচার হত। এইভাবে পূর্বনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিছিন্ন না হয়েই বাঙলাব মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার ধীবে ধীবে তৎকালীন সর্বভাবতীয় ফ্যাশনের অগ্র-গতিব তাল মেলাতে চেষ্টা কবেছে। এ ব্যাপাবে দেশীয় ভূস্বামী, বিদেশী শাসককুল, বাদ্দি ও নর্তকীবৃন্দ এবং বণিক-সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন।

॥ আট ॥

আধুনিক যুগ ও উপসংহার

সর্বভাবতীয় অলঙ্কারশিল্পের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আলঙ্কারিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক আমাদের আলোচ্য ছিল। বাঙালীর চিত্ত ববাববই সনাতন ভাবতীয় ধাবানুযায়ী স্বভাবতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। তবে এখানকাল আর্দ্রোষ্ণ জল-হাওয়া,

নবম মাটি, সুকুমার কচি, সংবেদনশীল শিল্পানুভূতি' ও সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে অলঙ্কারশিল্পের বিকাশ কালক্রমে সর্বভাবতীয় বীতি থেকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এমনটি কল্পনা করা সম্ভব নয় যে, অলঙ্কারশিল্পের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপ্রায়ী দ্বয় স্বতন্ত্র বিবর্তনের ধারাটি মূল সর্বভাবতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙলাব ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতর বাক নিয়ে সর্বদা দ্রুতগতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে প্রবলতর স্বাতন্ত্র্যযুক্ত চেহারা নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠাব প্রবণতা দেখিয়েছে। ইতিহাসে সাধারণ ও স্বতন্ত্র এই দুটি রূপই পাশাপাশি ও পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময় দেখা যায়, তদুপরি সেই স্বাতন্ত্র্যও কদাচ মুখ্যস্বরূপে পবিণত হয়েছে। অর্থাৎ বাঙলাব অলঙ্কারের প্রকৃত রূপ হল, সর্বভাবতীয় ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর পাঁচটি অনুরূপ জনপদের সাহচর্যে বিলীন একীভূত একটি মূর্তি যাব গায়ে মাখানো আছে এক অনিবার্য, অনির্দেশ্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রলেপ। অলঙ্কারের জগতে প্রকৃত যুগান্তর এক লহমায় ঘটে না, তার অন্তর্ভালে একযোগে যদিচ ভিন্নগতিতে কাজ করে চলে দিক পবিবর্তনের প্রবণতাসম্পন্ন কার্যকাবণসমূহের বিচিত্র ও জটিল সমাবেশ। সামাজিক, আর্থনীতিক, শৈল্পিক, নান্দনিক, ধর্মীয় বা আচাৰগত পবিবর্তনের নানাবিধ গূঢ়সংঘাতী যৌথ বাসায়নিক চাপে সমাজের অলঙ্কারভাবনায় ধীর, অলঙ্কারগতিতে যুগপবিবর্তনের আয়োজন চলতে থাকে। অন্যান্য কাকশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমন পুৰাতনকে কদাচিৎ নিঃশেষে বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত করে দিয়ে নবীনের আবির্ভাব ঘটে। অলঙ্কারকচিব ক্রান্তিপূর্বে বহিবাগত বা অন্তঃপবিণত নবীন প্রভাবকে স্থান করে দিতে গিয়ে সনাতনকে অল্পবিস্তর ভাঙতে হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সুকৌশলে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনের অভিষেক হয়। বিবর্তনের ধারায় নব নব উন্মেষ সত্ত্বেও ঐতিহ্যের এই নীবন্ধ নিববচ্ছিন্নতা শুধু বাঙলা নয় সাবা ভাবতের অলঙ্কারশিল্পের চবিত্রে নানা বহিবদ্ধ পবিবর্তনের সাময়িক চাঞ্চল্যকে অতিক্রম করে এক উত্তুঙ্গ সনাতন স্বৈর্য, ঐক্য ও সমতা আৰোপ করেছে। বাঙলাসমেত ভাবতের সর্বত্র আকবস্থানীয় অলঙ্কারগুলির মৌলরূপ প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি একই বয়ে গেছে, যা কিছু পবিবর্তন ঘটেছে তা মুখ্যতঃ ঐ আকবসম্ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিদেশাগত নব নব বীতিপদ্ধতির সূষ্ঠ সমন্বয়ে মিশ্রবীতির উদ্ভব, দেশী বিদেশী বিবিধ নকশা ও মোটিফের পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা নতুন সংযোজনের সাহায্যে সামান্য বকমফের এবং সর্বোপরি পুৰাতন অলঙ্কারের নতুন নতুন নামকবণ।

বাঙলাব আলঙ্কারিক স্বাতন্ত্র্যের এবস্থিধ লক্ষণ স্রবণে রেখে বাঙলাব নিজস্ব অলঙ্কার বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীব গহনাকে বোঝায় কিনা, বোঝালে তা কোন্গুলি, বিবর্তনের ধারায় ঠিক কোন্ পূর্বে এসে এবং কেন এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধেছে এবং কতিপয়

অলঙ্কাৰকে একটি স্বতন্ত্ৰ আঞ্চলিক মৰ্যাদায় চিহ্নিত কৰেছে—এই ধৰণেৰে প্ৰশস্তিৰ প্ৰাসংগিক উত্তৰ পাওয়া যায় কিনা খতিয়ে দেখা দবকাব। বস্তুতঃ যে অৰ্থে আমাদেৱ আৰো কয়েকটি মুখ্য চাক ও কাৰুশিল্প সৰ্বভাবতীয়-পটভূমিকায় নিবন্ধুশ স্বাতন্ত্ৰ্য ও আঞ্চলিক খ্যাতি অৰ্জন কৰেছে, সে অৰ্থে অলঙ্কাৰেৰ ক্ষেত্ৰে কোন বাঙালীমানাব সন্ধান বাতুলতা। কাৰণ এক্ষেত্ৰে বাঙালীৰ নিজস্ব প্ৰতিভা ও কল্পনা কাজ কৰেছে অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্বাধীন প্ৰেৰণাৰ সজ্জে। পটচিত্ৰেৰ ক্ষেত্ৰে যেমন সৰ্বভাবতীয় উৎকৰ্ষেৰ নিৰ্বাচনাত্মক স্বীকৰণ সত্ত্বেও এক আশ্চৰ্য স্বতন্ত্ৰ নৈপুণ্য, মেজাজ ও শিল্পবোধ বাঙলাৰ এই চিৰন্তন লোকশিল্পকে কালক্ৰমে ভাবতেৰ অন্যতম বিশিষ্ট ঘৰানায় পৰিণত কৰেছে, অলঙ্কাৰশিল্প কিত্ত সেবকম কোন সুনিৰ্দিষ্ট ও পবাক্ৰান্ত স্বকীয়তা কোন পৰ্বেই অৰ্জন কৰেনি। মুংশিল্পে বিশেষ কৰে পোডামাটিব অলঙ্কাৰণে, সূচী ও বয়নশিল্পে, তক্ষণে বাঙলাৰ যে অসামান্য ৰূপদক্ষতাৰ পৰিচয় পাওয়া যায়, ধাতু ও মণিবজ্জখচিত বঙ্গীয় অলঙ্কাৰেৰ ক্ষেত্ৰে অমুকপ আঞ্চলিক আভিজাত্য আমাদেব নেই। এব অৰ্থ হয়ত এই নয় যে, ভাবতেৰ অন্যান্য বাজোৰ তুলনায় বাঙালী স্বৰ্ণকাববা কম দক্ষ বা কুশলী। বৰং অনুমান কবা সজ্জত যে, প্ৰথমতঃ অনিৰ্দেশ্য কাবণে বাঙালীৰ মেধা, দক্ষতা ও কচি উল্লিখিত শিল্পে অধিকতৰ অভিনিবেশ কৰে; দ্বিতীয়তঃ প্ৰথাবদ্ধ অলঙ্কাৰেৰ সজ্জে যে বাজকীয় বৈভব ও সম্পন্ন কচি অজ্ঞানী জড়িত বাঙলাদেশেৰ ক্ষেত্ৰে চিবকাল তাৰ প্ৰকাষ্ঠা ছিল উত্তৰাপথেব নাগবসমাজ এবং বিশেষ কৰে দিল্লীৰ বাজদববাৰ। বাঙালী প্ৰতিভা অলঙ্কাৰে তাই স্বতন্ত্ৰ হবাব চেষ্ঠা যতটা না কৰেছে তাব চাইতে বেশি চেযেছে উত্তৰভাবতীয় নাগৰিক আদৰ্শকে নিখুঁতভাবে অনুকৰণ কৰতে।

কথাটি অপ্ৰিয় হলেও সত্য, বাঙালী অলঙ্কাৰশিল্পী বিপ্লববীতিতে তেমন স্বস্তিবোধ কৰেননি যেমনটি কৰেছেন মিশ্ৰিতবীতিব ক্ষেত্ৰে। মুঘল-পৰবৰ্তী ভঙ্গ নবাবী ও ব্ৰটিশপৰ্বেৰ প্ৰাক্কাৰে যে ব্যাপক সংমিশ্ৰণ ও সমন্বয়েৰ চেষ্ঠা দেখা যায় তাকে উপলক্ষ কৰেই বাঙলাৰ নিজস্ব অভিজাত গহনা তাব স্বকীয় ৰূপটি থুঁজে পায়। প্ৰথমতঃ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা নতুন সহবে সংস্কৃতি ও কচি বহুলাংশে স্থানীয় বণিক ও মুৎসুদ্দি শ্ৰেণীৰ বাবুসম্প্ৰদায়েব নিজস্ব মৰ্জি দ্বাবা-নিয়ন্ত্ৰিত হত, যেমন পুতুলশিল্পে বণিক বোঁ-ঝিব-মুখ আৰোপ কবাটী বেওয়াজ হয়েছিল তেমন গহনাৰ ব্যাপাবেও বণিক-গৃহিণীৰ অলঙ্কাৰাভাস ও কচি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ কলকাতা সহবে যে উঠতি বাবুকালচাব আসব জুঁকিয়ে বসেছিল, তা প্ৰকৃতপক্ষে নবাব-বাদশাহব ভোগবিলাস ও ঐশ্বৰ্য্যভৰবকে অনুকৰণ কবাব দুৰ্বল ও অসফল প্ৰয়াস মাত্ৰ। অতএব উত্তৰভাবতেৰ মুসলিম বাবুসমাজ বিশেষতঃ মুঘল দববাবেব বিলাস প্ৰকৰণ ও সৌন্দৰ্য্যসম্ভোগেৰ আয়োজন ছিল এই অপকৃষ্ট সংস্কৃতিব একটি বিশেষ আকাজ্জিত লক্ষ্য। এই উত্তৰভাবতীয় মণ্ডন ও বিলাসসজ্জাব আদৰ্শ আগেকাৰ

মত এই পর্বেও প্রভাব বিস্তারি কবেছিল প্রধানতঃ বাঙ্গালী ও বাববনিতা মাঝে। এই উচ্চকোটিব বাবাননা ও পেশাদার নর্তকীদের অনেকেই ছিল হয় উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম বমণী অথবা উত্তরভারতের প্রচলিত জমকালো সাজসজ্জার মুঘলধারা আদর্শে দীক্ষিত। অতএব ক্রমে এই কচি কলকাতা শহর বাবসমাজে সঞ্চারিত হয়েছে। শহর কলকাতার অলঙ্কার কচিতে তৃতীয় সংযোজন হল বিদেশী প্রভাবের আওতায় দেশী কাবিগবদের নিয়মভাঙ্গা সংমিশ্রণের সাধনা। ইওরোপীয় ধারায় শিক্ষিত কাবিগবদের হাতে বিমিশ্র পদ্ধতিতে বচিত অলঙ্কার বিশেষতঃ খাদযুক্ত ধাতুবা গায়ে হাঁবেকাটা পালিশের জেঙ্কায় হাল্কা আঁপাতঃ মনোহর গহনা মধ্যবিত্তজনের প্রিয় হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল অলঙ্কারশিল্পে নবাগত অন্যান্য কারুশিল্পীবা পাঁচমিশেলী সংস্কার, কচি ও অভিজ্ঞতা।

এইসব ভিন্নধর্মী বিচিত্র প্রভাবসমূহের পাবস্পর্ষিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে কলকাতা হাওড়া, বিষ্ণুপুৰ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যত্র যে বিশিষ্ট ঘবনা জন্ম নিল, তাদের তৈরি কোন কোন গহনাকেই আমবা বাঙালীবা নিজস্ব প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার আখ্যা দিতে পারি। কাবিগবীবা দিক থেকে ঠোকাই, ছেলা ও দানাব কাজে বাঙালী কাবিগব স্বাতন্ত্র্য বজায় বেখেছেন। এছাড়া সোনা ও রূপোবা জালি কাজে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকাবা শিল্পীবা অসাধারণ উৎকর্ষ ও দক্ষতাবা পরিচয় বেখেছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতানুসাবে প্রাদেশিক গহনাবা তালিকা কবতে হয় বলে মতভেদের অবকাশ এখানে যথেষ্ট। প্রায় একশো বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙালীবা নিজস্ব অলঙ্কার বলতে চাবটি শিবোভূষণ, পাঁচটি নাসিকাভূষণ, তেবোটি কর্ণভূষণ, বাবোটি কর্ণভূষণ, চবিশটি বাহুভূষণ, দশটি কটিভূষণ, ও পাঁচটি চবণভূষণ—এই মোট বাহাত্তবটি অলঙ্কার পেখেছিলেন। তাঁব মতে আমাদেব বাকি গহনা উত্তরভারতের অনুরূপ। বর্তমানে, এই শিল্পেব সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাঙালীবা নিজস্ব গহনাবা এক তালিকা সংগৃহীত হয়েছে। এই সূত্রে বলে রাখা ভালো, এই তালিকা অনুসাবে বোঝা যায় গহনাবা অভিজ্ঞা এখানে পুরনো আছে, পরিবর্তন ঘটেছে মোটিফে, মূল কাবিগবীতে এবং অন্তিমস্পর্ষ পর্বে। (১) নকাশী চুড়া (২) মাথাবা ফুল (৩) মাথার বাগান (৪) মাথাবা কাঁটা (৫) চিকণি (৬) কানঝাপটা (৭) বাঁক (৮) ঠোকাই হাব (৯) হাঁসলি হাব (১০) কাঁটাই আর্মলেট (১১) জডোয়া চুড়া (বাঙলা চুড়) (১২) কাঁটাই চেনহাব (১৩) চিক ও বিস্ফলেট (১৪) কানপাশা (১৫) মিনা টাব (১৬) কাণবালা (১৭) টিকুলী (১৮) মাকডি (বাঙলা) (১৯) বাঙলা ইয়ারিং (২০) টেঁড়ি কুমকো (বাঙলা) (২১) কান কুমকো (২২) মণিপূবী মাকডি (২৩) কাঁটাই মাকডি (২৪) চুড় (২৫) বাঙলা চুড়ি (২৬) নকাশীবালা (২৭) মণিপূবী বালা (২৮) শীল ও ডাঁটি আংটি (২৯) মানতাসা (৩০) জডোয়া ব্রেসলেট (৩১) তাগা ও জসম (৩২) বাঙলা

পেণ্ডেণ্ট—এই বত্ৰিশটি গহনায় এখনকাৰ বাঙালী কাবিগৰেব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নজৰে পড়ে।

লোকায়াত অলঙ্কাৰেব ক্ষেত্ৰে বাঙলাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য অপেক্ষা বাধে। কিন্তু পূৰ্ণাঙ্গ তালিকা এক বিবাট ব্যাপাবে দাঁড়িয়ে যাবে তাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অলঙ্কাৰ যেমন শাঁখা, বলি ও কলি দিয়ে সুক কৰা যেতে পাৰে। সোনাৰ ধাতুক্ষয় বন্ধ কৰতে এবং বিবাহিতা হিন্দুনাবীৰ হাতে বিচিত্ৰ বৰ্ণ সৃষ্টি কৰতে শাঁখা ও কলি একসময়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় শঙ্খশিল্পেব আঞ্চলিক ঘৰানাও সৃষ্টি হয়েছিল। বাশাবেখি, কাৰ্ণিশদাব, জলতবন্ধ, হীৰেকাটা এবং মকব্ চেহারা শাঁখা তখন বঙ্গললনাৰ দৈনন্দিন ব্যবহাৰেব সামগ্ৰী ছিল। এছাডা নানাবকম গাছ ও লতা-পাতাব বীজ, নিৰ্যাস, কাণ্ড, বাদাম ইত্যাদি দিয়েও লৌকিক শিল্পীবা বিচিত্ৰ অলঙ্কাৰ তৈৰী কৰে নেন। এই জাতীয় লোকায়াত অলঙ্কাৰেব কোন কোনটি অবশ্য ভাবতেব অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰচলিত। তবু বাঙালীযানাৰ দাবি অনুসাবে, গাছেব বীজ তক্ষণেব সাহায্যে সুন্দৰ কপ দেওয়াৰ বিবৰণ আমাদেব সাহিত্যে চিবকাল আছে। সেই কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত উজ্জ্বল বক্তবৰ্ণ গুঞ্জা বা কুঁচ লাল সৰ্বজয়াৰ কালো বীজেব সঙ্গে মিলিয়ে জপেব মালা আজও গাঁথা হয়। গুঞ্জাব মতই দেখতে হল বক্তবৰ্ণ বক্তকাঞ্চনেব বীজ, যদিও ঈষৎ বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা ও কৃষ্ণবিন্দুবহিত। তবে বক্তকাঞ্চনেব মালা ভাবতেব অন্তৰ্ভুক্ত চলে। সুগন্ধি তুলসীৰ বীজ ও কাঠ খোদাই কৰে যে কণ্ঠি বানানো হয় তা শুধু বৈষ্ণবেব সাধন সহায়ক নয়, এক আশ্চৰ্য লোকশিল্পেব নমুনাও বটে। তিসি বা মসিনা গাছেব কাণ্ডেব টুকৰো দিয়ে বচিত নেকলেস একসময় কলকাতা থেকে বস্তানী হত। শ্ৰীহট্ট অঞ্চলেব 'বুড়ি' নামে পৰিচিত ক্ষুদ্ৰ কলসাকৃতি মটৰ দানা আকাৰেব অতিকঠিন বীজকে সুকৌশলে সচ্ছিন্ন কৰে মালা পবানো হয় ছোটদেব গলায়, এতে নাকি সাৰ্বিক অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পদ্মবীজেব মালা শুধু শিবেব নয় সাধাৰণেবও কণ্ঠাভৰণ। পুত্ৰজীব গাছেব কালো বীচিব মালা দীৰ্ঘজীবন কামনাৰ পুত্ৰদেব গলায় পবানো হয়, ব্ৰাহ্মণেবও পবেন। কাঠ ও আঠা দিয়ে নানাবকম গহনা তৈৰী হয়। বাসক গাছেব কাঠ থেকেও সুন্দৰ মালাদানা তৈৰী হয়। নিজেদেব চিহ্নিত কৰাব জন্ম বেলগাছেব ছাল ও কাঠ থেকে মালাদানা বানিয়ে স্নাতকুমাবীৰ আশেব সুতো পৰিয়ে মালা পবেন কেউ কেউ। শোলাৰ টুকৰা দিয়ে অঙ্গুষ্ঠ গহনা তৈৰি হয়। অবশ্য এ বস্তুৰ সৰ্বাধিক প্ৰয়োগ প্ৰতিমাৰ ডাকেব সাজে, কিন্তু মানুষেব অঙ্গসজ্জাতে, জীবনেব বিশেষ কোন মুহূৰ্তে কাবো কাবো কাছে এ বস্তু কম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কৰে না। সব শেষে সেই বিশ্বয়কৰ গহনাৰ কথা উল্লেখ কৰতে হয়। এককালে বাঙলাৰ ধান্যসমৃদ্ধিৰ চিহ্ন স্বৰূপ ধানেব ছড়া দিয়ে মালা তৈৰিব বেওয়াজ আজও বৰ্তমান। প্ৰায় শতবৰ্ষ আগে কলকাতায় আয়োজিত এক আন্তৰ্জাতিক প্ৰদৰ্শনীতে বৰ্ষমানেব গুৰুত্বা অঞ্চল থেকে এ বস্তু একছড়া ধানেব চেন

পাঠানো হয়েছিল, তাই দেখে শহরের দেশী-বিদেশী মহল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

সাম্প্রতিক কালে স্মৃতিজ্ঞাত এবং লোকায়ত উভয় অলঙ্কার ক্ষেত্রেই অভাবনীয় পরিস্থিতি কিছু দেখা দিয়েছে। বস্ত্রপ্রস্তুত ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক এবং গহনা-দোকানে জ্যোতিষীৰ অবস্থান আর এক দিকেই ছবি তুলে ধরেছে। তবু বলা যায়, কৃতী শিল্পীর অভাব আজও এই শিল্পে দেখা দেয়নি। বাঙলাব অলঙ্কার শিল্প এখনো সমাজের বিকাশের ধারা ধরেই বয়ে চলেছে।

- সূত্রগ্রন্থ : (ক) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ডঃ নীহারবঙ্গন বায় ১৯৪৯
 (খ) Art Manufacturers of India by T. N. Mukharji 1888.
 (গ) Census of India 1951.
 (ঘ) Early Travels in India 1583—1619 by William Foster 1921.
 (ঙ) Indian Jewellery by Col. T. H. Hendley 1909.
 (চ) Indian Jewellery, Ornaments and Decorative designs by J. B. Bhushan 2nd ed. 1964.
 (ছ) Industrial Arts of India by Sir George Birdwood 1810.

পরিষদ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ

বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের পদাবলী, বামমোহন-গ্রন্থাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, নবীনচন্দ্র-বচনাবলী, ভাবতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী, বামেন্দ্রসুন্দর-বচনাবলী, বামেশ্বর-বচনাবলী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচনাবলী, শবৎকুমারী চৌধুরাণী বচনাবলী

প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয় ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গোবিন্দচন্দ্র দাস [১২৬১-১৩২৫]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

“এই ছনিষাব একটি কোণে কাঁটাব বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেশাফুল সাপেব ডেবায় কাঁটাব মালা গলে,
পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন পূবে হওয়ায় বেরুলো নীড তোজে,
পাখব-চাপা বইলো কপাল, বাদলা ক’রে বইলো চোখেব জলে।”

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁব এই শ্রদ্ধাজলিতে গোবিন্দচন্দ্রের দুঃখময় জীবনের আভাস দিয়েছেন।
সত্যি তাঁব ‘পাখব-চাপা বইলো কপাল’ আব সাবা জীবন ‘বাদলা ক’বে বইলো চোখেব
জলে’। সংসাব তাঁকে দিয়েছে তীব্র গবল, আব তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন অনন্ত
অমৃত।

১২৬১ সনের ৪ঠা মাঘ, ঢাকা—ভাওয়াল—জয়দেবপূবে কবিব জন্ম। ‘জননী আনন্দ-
ময়ী, পিতা বামনাথ।’

পাঁচ বৎসব বয়সে তাঁব পিতৃ-বিয়োগ হয়। স্কুলে পাঠাবাব সঙ্গতি দবিদ্র। মায়ের
ছিল না। বাজা কালীনাবাষণ এই দুঃস্থ পবিবাবকে কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্য দিতে
লাগলেন আব বাগী সত্যভীমা বালকের শিক্ষাব ভাব নিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাশ ক’বে গোবিন্দচন্দ্র ছ’বছব নর্মাল স্কুলে পড়েন, পরে ব্রাহ্মণগ্রামে নব-
প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হ’ন। সে-কাজ ছেড়ে ঢাকা মেডিকাল স্কুলে
চিকিৎসা-বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকাব শিক্ষা সম্পূর্ণ কবতে পাবেননি।
বাজা-কালীনাবাষণেব অনুগ্রহে সংসাবেব যেটুকু সুবাহা হয়েছিল, তাও শেষ হতে চল্লো।
রাজা বুদ্ধ হয়েছেন, বাজ্যেব এবং নাবালক পুত্রেব ভাব একজন উপযুক্ত অভিভাবকের
উপব সমর্পণ ক’বে তিনি তীর্থযাত্রাব সংকল্প কবলেন। কুমাব বাজেন্দ্রনাবাষণেব শিক্ষক
ও অভিভাবক-রূপে মনোনীত হ’লেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। গোবিন্দচন্দ্র
তখন বাজসবকাবে সামান্য কর্মচাবী।

একে দবিদ্র, তা’তে অন্যায়েব চিবশত্রু, কাজেই কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে তাঁব বনিবনাও হ’ল
না। দু’জন পদস্থ ব্যক্তি একটি অসহায় কুলবধূব সর্বনাশ করতে গিয়েছিল, বধূর স্বামী
বাজাব কাছে নালিশ ক’বেও উপযুক্ত প্রতিকাব পেলো না। গোবিন্দচন্দ্র তখন গ্রামবাসী
ইতব-ভদ্র সকলকে সংঘবদ্ধ ক’বে বললেন, বাজা কিছু না কবলে বিচাবেব ভাব নিজেদেব
হাতে নিতে হবে। তাঁব নেতৃত্বে বিপুল জনতা বিচাবেব দাবি নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে
উপস্থিত হ’লে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ অপবাদীদের যথাযোগ্য শাস্তি দেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র
তাঁদেব বিষ-নজবে পড়েন।

ইতিমধ্যে রাজা কালীনাবায়ণেব মৃত্যু হইয়াছে। যুববাজ বাজত্ব পেয়েছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁব ম্যানেজার। প্রজার পক্ষ নিয়ে বাজাব বিকল্পে ল'ভতে যাবাব স্পর্ধা তাঁবা সহিবেন না। কবিও অপমান স্বীকার কববাব লোক ন'ন। তিনি জমিদারিব কাজে ইস্তফা দিলেন।

সংসাবেব দায আছে। পনেবো বছব বয়সে তাঁব বিবাহ হ'যেছিল সাবদাসুন্দবীর সহিত। ছ'টি কন্যাও সংসাবে এসেছে, প্রমদা ও মণিকুন্তলা। পত্নীগতপ্রাণ সংসাব-প্রেমিক কবিকে এখন থেকে অনেক দিন জীবিকাব সন্ধানে বাইবে বাইবেই কাটাতে হইছে—ঢাকা, সেবপুক, ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপু—নানা স্থানে। অনেক দিন ছ'বেলা আহার জোটেনি, দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রম কবতে হইছে। মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর এবং সুসঙ্গ দুর্গাপুবেব বাজা কমলকৃষ্ণ তাঁব কবিতাব অনুবাগী ছিলেন, মধ্যে মধ্যে কবি তাঁদেব আনুকূল্য পেয়েছেন, কিন্তু বেশী দিন এক জায়গায় টিকে থাকা তাঁব কোণ্ঠীতে ছিল না।

পত্নী সাবদাব কঠিন অসুখেব সংবাদ পেয়ে তিনি সেবপূব থেকে জয়দেবপুর রওনা হ'ন। অস্তিম কালে ক্ষণেকেব জন্য ছ'জনেব দেখা হ'ল (ইং ১৮৮৫)। এই সাবদাকে নিয়ে তাঁর কত স্বপ্ন, কত মান অভিমান অজস্র কবিতায় স্মরণীয় হইয়া আছে।

বিদেশে বিদেশে ঘূবে দৈন্য ঘূচাবাব কত চেষ্টা কবেছেন কবি, পারেননি, তাই কি দুঃখিনী বাগ কবে চলে গেল? অভিমানিনী সে, মুখ ফুটে কাবও কাছে কোনদিন কিছু চায়নি।

“যাও না পবেব কাছে, যাহা আপনাব আছে—

কভু কব উপবাস, কভু একাহাব,

অভাগিনী অশ্রুমুখী দুঃখিনী আমাব।”

৩

বাজপুরুষদেব চক্রান্তে একদিন গভীর বাত্রে তাঁব ঘব বাতী, পুড়ে ছাই হ'যে গেলি, তিনি নির্বাসিত হ'লেন, গভীর বাত্রে কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আত্মবক্ষা কবলেন। তখনকার মত বাঁচলেন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে গুপ্তঘাতকের হাত থেকে সতর্ক এবং সন্ত্রস্ত থাকতে হইছে।

এদিকে, সাবদাব মৃত্যুব পবেই তাঁব একমাত্র সহোদব জগন্নাথ লোকান্তরিত হ'লেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আগেই মাবা গিয়েছিলেন। শোকে তাপে জর্জরিত কবি একদিন কলকাতায় বাজাব সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁব ভুল শোধবাব চেষ্টা ক'বে বিফল হ'লেন। তখন তাঁব লেখনী অগ্নিবর্ণ কবতে ছাড়লো না। ‘মগেব মুলুক’ কাব্যে তিনি ভাওয়ালবাজ এবং তাঁব সাক্ষোপাঙ্গদেব কীর্তিকাহিনী অনারতভাবে বর্ণনা কবলেন। বাজপুরুষেবা আইনের সাহায্য নিয়ে বইখানি বাজেয়াপ্ত কবেন। যেকবি বলেছিলেন “ভাওয়াল আমাব

অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ”, তাঁকে ভাওয়াল থেকে চিববিদায় নিতে হ’ল। দেশ-বাসীর ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে দুঃখতাপজর্জরিত কবি অভিমানভাবে সেদিন বলেছিলেন,
“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মবলে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ?”

৪

সারদার মৃত্যুর সাত বছর পূর্বে তিনি ব্রাহ্মণগ্রামেব মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা প্রেমদাকে বিবাহ করেন। প্রেমদাকে পেয়েও সারদাকে তিনি ভুলতে পারেননি। ‘দু’জনার প্রেমের যুগ্ম আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে ‘সারদা ও প্রেমদা’ কবিতায়।

“প্রেমদা পদ্মাব কূলে কোমল শেফালি-ফুলে
কবিতা বাসবশয্যা ডাকিছে আমার,
সারদা ‘চিলাই’-তীবে আমকাঠ দিয়ে শিবে
আঁচলি বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।
নাহি নিশি নাহি দিন দু’জনেই নিদ্রাহীন।
দুই-দিকে দুই সিঁগু গর্জিছে সমানে,
পাষণ-হৃদয় স্বামী পানামা-যোজক আমি,
ধীবে ধীবে ভেঙে নামি দু’জনার বানে।” (কল্পবীঃ)

৫

এই প্রেমদাবই ছোট ভাই অতুলের মৃত্যু নিয়ে একটি অসাধারণ মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন গোবিন্দচন্দ্র। তার মৃত্যুর তারিখ ২৫শে আশ্বিন, ১৩০০ সাল। কবিতাটি পড়তে পড়তে দু’এক জায়গায় হয়তো ববীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’-এর কথা মনে পড়বে পাঠকের, তবে, সম্ভবতঃ সেটি এম পবে লেখা। দু’টি বচনায় দুই কবির স্বাতন্ত্র্য পবিষ্ফুট। ববীন্দ্রনাথের ভাষা শানিত মার্জিত, গোবিন্দচন্দ্রের যেন স্বভাব-নিঃসৃত, অভিজাত কাক-কলা হয়তো এখানে নেই, কিন্তু আছে এক ধবণের স্বতঃস্ফূর্ত আদিম শক্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত অনুভূতি, যার প্রভাব অমোঘ।

দশ বছরের বালক অতুল—অভাগিনী মায়েব ‘চিবদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা’—টাঁকাষ মামাদের কাছে থেকে পড়ে, ছুটিব পবে ফিবে যেতে হবে সেখানে; মায়েব আঁচল ধরে কেবলই বলতে লাগলো—“যাবো না মা, যাবো না।” মামাবা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৌকোয় তুলে নিলেন।

“ভাদব—তেবো শ’ সন,—চাৰি দিকে জল,
বিশাল বকণবাজ্য হাসিছে কেবল
বিবাট্ তবঙ্গভঞ্জে।”

যাত্রার সময় এলো। অপবাহুকাল। আকাশে গাচ মেঘেব সঞ্চাব।

“কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে কবে খেলা।

ববিব পবিধি লাল মাংসপিণ্ডপ্রায়
এ উহাব মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।”
“কি বিশাল লক্ষবান্ধ, বিশাল গর্জন,
বিকট ভ্রুকুটিভঞ্জে কবে আক্রমণ,
পড়ি’ তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে।”

অদ্ভুত বলিষ্ঠ এ বর্ণনা—অপ্রত্যাশিত উপমা সমগ্র চেতনাকে চমকিত ক’বে তোলে।

“একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীব্র।
স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়,
দাঁডেব আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
মমতার পুকভুজ, সে কি কভু মবে ?
একভুজ কাটো যদি, শতভুজ ধবে।”

“দাঁডেব আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়”—এই পংক্তিটির মত এমন মর্মান্তিক সত্য
চিত্র সাহিত্যে বেশী আছে কিনা জানি না।

মাতা পুত্র দু’জনেবই চোখ জলে বাপ্‌সা হয়ে গেছে।

“উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকেব ভিতবে অন্ধ তমস কেবল।
এত অন্ধকাবে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু’জনে তফাত।”

এই তাদের শেষ বিদায়।

পূজাব দিনে অতুল আসবে, মা আশা কবে বসে আছেন। শুক্লা ষষ্ঠী। ‘শিশু
শশধর’কে কোলে নিয়ে সূতিকাগাব থেকে বেবিয়ে এলেন সুন্দরী বাত্ৰি। পাড়ার মেয়ে
‘তাবাসমুদয়’ নবজাতককে দেখতে এলো। ঘবে ঘবে উৎসব।

“বাপিয়া বিশাল বঙ্গ, কেবল মিলন,
জননী স্নেহেব আজ মহা-উদ্বোধন।”

কিন্তু কোথায় অতুল ?

“একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা মৃত্তিকাবকুঁড়োটা সাগর-ললাটে,
একখানি বাড়ী তায জাঁধাব কেবল।”

মায়েব মনে আশঙ্কাব অন্ত নেই।

“ডাকিছে নিশাব কাক, সে-ও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে, নীচে কাঁপে জল।”

দেখতে দেখতে পূজার তিন দিন কেটে গেল।

“বিজ্ঞানব বিসর্জন উৎসব নীবব।

কোলে নিয়ে জননীবা আপন সন্তান,

কপোলে দিষেছে চুম্ব, শিবে দুর্বাধান।

সকলে পেয়েছে বৃকে বৃক-ভবা ধন,

আমাব অতুল দেবি কবে কি কাবণ ?”

পৃথিবীর চোখে ঘুম। “একটি মাষেব চোখে শুধু ঘুম নাই।”

“চিবদাহ জাগবণ তাব বৃকে দিষা,

ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিষা নিবিষা।”

* *

ভোব হয়ে এলো। মাষেব মনে হ’ল, অতুল এসেছে, তাঁকে মা বলে ডাকছে।

“অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিষা

তুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিষা।

চীৎকাবে, অতুল মোর আসিতেছে অই।

খুঁজিতে উডিল কাক, কই কই কই ?

মুৰছিয়া ধবাতলে পডিল জননী,

তুলিতে সহস্র কব মেলে দিনমণি।” [কল্পরী : ‘অতুল’।]

নির্মম নিযতিব এ আঘাত আমাদের মর্মে মর্মে বাজে। অকৃত্রিম আবেগ ভাষায় অলঙ্কারে কি অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চাব ক’বতে পাবে, তাব বিশ্বয়কব দৃষ্টান্ত পাই এ কবিতায়।

৬

আর একটি অসামান্য কবিতা ‘শ্মশানে নিশান’—মহাকাব্যেব মহিমাদীপ্ত অপূর্ব গীতি কবিতা।—ক্লাসিক কল্পনায় বোমাণ্টিক সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

“শ্রাবণেব শেষ দিন—মেঘে অন্ধকাব।”

“নযনে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশানকালী

ধাইছে বান্ধসী সন্ধ্যা মূর্তি তাডকাব।

উডিছে মেঘেব কোলে বলাকা উজালা

ভৈববীব কালকণ্ঠে মহাশঙ্খমালা।”

ব্রহ্মপুত্র ভষে মসীবর্ণ। আকাশে চাঁদ নেই, তাবা নেই। এহেন সময়—“উডিছে আকাশে এক ধবল নিশান।”

“শ্মশানে নিশান কেন ? হাসে খলখল

মডাব মাথাব খুলি বিকাশিষা দস্তগুলি

বিকট বিস্কন্ধ শুভ্র দীঘল দীঘল। •

সবে কবে উপহাস ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলসী দড়ি মিলিয়া সকল।
কি যে সে বিকট হাসি হাসে থলথল।”

ঝঙ্জাঝেগ শাস্ত হ'য়ে এলো। নামলো স্তব্ধতা। মেঘাববণ ছিন্ন ক'বে দেখা দিলো
চাঁদের আলো।

“অকস্মাৎ বজ্রত-জ্যোৎস্নাষ
উজলি' উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায।”

শ্মশানবক্ষে এ কাব মূর্তি ?

রজত-ধূতুবা কর্ণে বিমল বজ্রত বর্ণে
বজ্রত-বিভূতি মাখা তুষাবেব প্রাষ।
বজ্রত গিবির শিবে বজ্রত জাহ্নবী-নীবে
বজ্রত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়।

* *

ধবল বৃষভ' পব বিবাজিত বিশ্বস্তব,

আপনি ধবিয়া সেই কেতু সমুজ্জল,

ভৈরবে গাহিছে গীত মবণ-মঙ্গল। [প্রেম ও ফুল : ‘শ্মশানে নিশান’]

‘অর্ধদম্ব বংশখণ্ড ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড’—তাবই মধ্যে শ্মশানেশ্ববেব এমন মহান্ আবির্ভাব
যিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন, তিনি তৃতীয় নেত্রের অধিকারী, সন্দেহ নেই।

এ-সব কবিতা পড়বার সময়ে কতকগুলি কথা মনে পড়ে। আধুনিক কবিরা
অনেকে নাকি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূর সবে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তা ‘বেজলুশন’
করে হয় না। ‘যে পারে সে আপ্নি পাবে।’ গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমকালীন
হয়েও কত স্ব-তন্ত্র। সত্যকাব অনুভূতি নিয়ে নিজের মনের মতন ক'বে যিনি লিখবেন,
তাঁরই লেখায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাবে। বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তাব কপ এবং বস।
আপন আপন প্রণেতা অনুসাবে কবিরা তাব সন্ধান দেন।

রুক্ষতার মধ্যেও সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছেন ভবভূতি, ভীষণ ও বীভৎসের মধ্যেও বসের
স্বাদ আছে বোদেলেয়বেব কাব্যে। গোবিন্দচন্দ্র কোন্ স্তরের কবি, সে বিচার
নিম্প্রয়োজন। তাঁর ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য, সেইটাই বড় কথা।

৭

কোনো কবিবই সকল বচনা বসোত্তীর্ণ নয়, গোবিন্দচন্দ্রেরও নয়। অসামান্য ভালো
কবিতার পাশে অনেক তুচ্ছ কবিতাও স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। তবে একটি কথা এ
প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঋগ্বেদ কাব্য শুধুই শিল্প-বিলাস গোবিন্দচন্দ্র তাঁদের দলে ন'ন।
তাঁর জীবন থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন ক'বা অসম্ভব। বস্তুতঃ কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর
সমগ্র জীবন ধবা দিয়েছে। প্রেমের উচ্ছলতা, তীব্র কামনা, মান অভিমান, অত্যাচারের

বিকল্পে বিদ্রোহ, কাপুকষ্যতাৰ প্ৰতি ঘৃণা, দেশেৰ প্ৰতি অলস প্ৰেম—হৃদয়েৰ প্ৰতিটি তৰঙ্গ চিহ্ন বেখে গেছে তাঁৰ লেখায়। বাস্তব জীবনেৰ দুঃখ-গ্লানিৰ মধ্য অলেছে তাঁৰ অন্তৰেৰে উৰ্ব্বগামী শিখা।

৮

প্ৰেমৰে কবিতাগুলিৰ বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্ৰেম কতটুকু দেহেৰ কতটুকু আত্মাৰ, সে বিশ্লেষণে তাঁৰ আগ্ৰহ নেই। তিনি জানেন, ও দুটিকে পৃথক কৰে দেখা যায় না।

“কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্ৰেম পদ্মফুল ?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।”

তাই তাঁৰ কথা :

“আমি তাৰ ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।”

তবে সে প্ৰেম কি শুধুই দেহ-লালসা ? না,—কৰ্ণনও নয়।

“আমি মহাকাম পতি
সবলা সে মহা-বতি,
মবিলে মৰণ নাই, নাহিক বিবহ।*
ইহকালে পবকালে
জীবনেৰ অন্তবালে
প্ৰীতিৰ প্ৰসন্নমূৰ্তি জাগে অহবহ।”

অনন্ত সৃষ্টিবহস্যেৰ সঙ্গ যুক্ত হ'বোঁ তাঁৰ এ প্ৰেম এক অনিৰ্বচনীয়া মহিমা লাভ কৰেছে। এতে ক্লীবতা নেই, লোলতা নেই, পঙ্কিলতা নেই, আছে সবল নিৰ্মল বলিষ্ঠ পৌৰুষ। দেহ-মিলনেৰ বিপুল আনন্দকেও কবি এমনি সহজ অকুণ্ঠ আবেগভবে বৰ্ণনা কৰে গেছেন যে স্থূল অগ্নীলতা তাকে বিন্দুমাত্র স্পৰ্শ কৰতে পাবেনি।

এ প্ৰসঙ্গে হয়তো মোহিতলালেৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ কথা আমাদেৰ মনে পড়তে পাবে।

অগ্নীলতা যে বিষয়েৰ উপবে নিৰ্ভৰ কৰে না, কৰে দৃষ্টি ও প্ৰকাশভঙ্গীৰ উপবে, তাৰ প্ৰমাণ সাহিত্যে প্ৰচুব। ববীন্দ্রনাথেৰ মত কবিও লিখেছেন ‘বিবসনা’, ‘বিজয়িনী’। তাতে কোথাও অশুচি মনেৰ ছায়া পড়েনি। গোবিন্দচন্দ্ৰেৰ ‘উলঙ্গ বমণী’-ও একটা আশ্চৰ্য কবিতা।

“বড় ভালোবাসি তোবে উলঙ্গ বমণী,

অতি জ্যোতিৰ্ময় দীপ্ত দেব-দেহখানি।” [কল্পবী : ‘উলঙ্গ বমণী’]

তিনি স্মৰণ কৰেছেন “কালিন্দীৰ কালো জলে” কৃষ্ণ-সমৰ্পিত-প্ৰাণ গোপিনীদেব, “অসুৰ-শোণিত-নদে” নৃত্যপৰা শ্যামাকে, এবং সব-শেষে শ্মশান-শায়িতা সৰ্ব-আবরণমুক্ত তাঁৰ প্ৰাণেৰ ‘সায়দা’কে।

“নাহি হিংসা, নাহি ঘেৰ, নাহি সুখ দুঃখক্ৰেশ

নিৰ্বাপিত প্রযত্তির প্রতিমা যেমনি।”

“চিলাই”—যেব তীবে সে দেহ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু কবির প্রাণে তাব অগ্নিশিখা আজও অনিৰ্বাণ।

যে সাবদাব অঙ্গে অঙ্গে তিনি একদিন অনঙ্গের পুষ্পশোভা দেখেছেন, আজ দৃষ্টি-অন্তবালে গিষেও সে তাঁব মন-প্রাণ অধিকার ক’বে আছে।

“পাঁচটি বছর আজ, আজো দেখি তাবে,

অবিকৃত সেই মূর্তি, সেই রূপ-বাশি,

অথব ছ’খানি ঢেউ লোহিত-সাগবে

সুধার জোয়াবে তাব প্রাণ যাব ভাসি।”

[ফুলবেণু : ‘প্রেতযোনি’]

স্বপ্নেব মত সে এসেছিল, স্বপ্নেব মতই চলে গেছে।

“তুমি আব আমি দেবি, তুমি আব আমি

প্রবল পদ্মাব স্রোতে ভাসি ছ’টি ফুল,

তুমি আব আমি দেবি, তুমি আব আমি

মুহূর্ত মিশিয়াছি—বিধাতাব ভুল।”

[ফুলবেণু : ‘তুমি আব আমি’ ।]

কৈশোর-প্রেমেব একটি কোঁতুক-মধুব চিত্র আছে—“এই এক নূতন খেলা”য। মনে পডতে পাবে, পনেরো বছর বয়সে কবির বিবাহ হয়েছিল।

“আব বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।”

বিত্রত বালিকাব সলজ্জ তিবস্কাব :

“না ভাই তুমি দুই বড

একটি বলে আবটি কব;

কাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে গেলা।”

[কস্তুরী : “এই এক নূতন খেলা।”]

তাঁর প্রধান কাব্য সাতখানি : প্রেম ও ফুল, কুসুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুলবেণু, বৈজয়ন্তী, মগেব মুলুক। অপ্রধান তিনখানি : প্রসূন, শোক ও সান্ত্বনা, শোকোচ্ছ্বাস। তা ছাড়া তাঁব বহু কবিতা সাময়িক-পত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে, গ্রন্থাকাবে সঙ্কলিত হয়নি। এই সকল কাব্যেব আব একটি আকর্ষণ আছে। কবিতাগুলি পডতে পডতে মনে হয়, আমবা যেন তাঁব সঙ্গে ভাওয়াল, জয়দেবপুর, ব্রাহ্মণগ্রাম, সেবপুর, মৈমনসিংহ, সুসঙ্গ জুর্গাপুৰ পূর্ববঙ্গের নানাস্থান ঘুরে আসছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যে, ঘবোয়া ছবিতে, সবল গ্রাম্য শব্দে একটি চমৎকাব আঞ্চলিক পবিবেশ বচিত হয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) বৰষাৰ বিল—প্ৰকাণ্ড বিল, চাৰুদিক জলে জলময়। কত বকমেব পাখী উড়ে
উড়ে এসে জলে পড়ছে, আৰাব উড়ে চলে যাচ্ছে। —তাবই ছবি।

এখানে ওখানে সবে, মধুব মধুব ববে

সবালী, কালেম, পিপী কত নাচে গায়।

চপল ও কড়গাই ওদের তুলনা নাই

উড়িতেছে পড়িতেছে জোড়ায় জোড়ায়। [প্ৰেম ও ফুল]

(২) এ-ও কি স্বপন?—পূৰ্বব্ৰহ্ম আৰু একটি গ্ৰাম্যচিত্ৰ।

দষেল বসিয়া আছে

পশ্চিমে ‘কাফিলা’ গাছে,

ঝুলিছে বাঁশেৰ আগে মুমূৰু কিবণ। * *

আমতলে ডাকে গাই,

নিকটে বাছুব নাই,

বুড়ী কবে ড’ড’ কবি’ বৎস-অন্বেষণ।

একাকী কপসী বাল

কুটীৰ কবিয়া’আলা

‘ওশোবা’য় মাছ কুটে সুন্দৰ কেমন।

বাঁটিৰ উপৰে বসা,

বাতাসে আঁচল ধসা,

চেউষে চেউষে, চেউষে চেউষে হৰ উদ্ঘাটন,

অৰ্ধ নিশি, অৰ্ধ দিবা

একত্ৰে সে দেশে কিবা,

একত্ৰে উদয় অন্ত—লাবণ্য নূতন। [কুঙ্কুম : ‘এও কি স্বপন’ ?]

‘আম-মাথা’, ‘চুল-শুকানো’, ‘কাঁথা সেলাই’ প্ৰভৃতি অনেকগুলি সুন্দৰ চতুৰ্দশপদী
কবিতায় নানাবিধ কত পৰিচিত মনোবম ভঙ্গী, দৈনন্দিন জীৱনৰ কত সরস চিত্ৰ অনতিব্যক্ত
বঙে ও বেখায় অপকল্প মাধুৰ্য্যে ফুটে উঠেছে।

আজ আমবা অনেক সময়ে চতুৰ কবিদেৰ আবেগহীন উত্তাপহীন, কখনও বা অৰ্থহীন
হেঁয়ালি ৰচনাৰ কোঁশলেৰ তাৰিফ কবি। যে-কবিতা প্ৰাণেৰ বন্ধ্যাৰ জ্বৰাব বেগে আপন
পথ কেটে চলে, তাৰ সৌন্দৰ্য্য অন্তৰ্ভবেৰ ক্ষমতাও বুঝিবা বহুলাংশে হাবিয়ে ফেলেছি।
তবু খাঁটি ও ভেজালেৰ, আসল ও নকলেৰ পাৰ্থক্য বসন্তেৰ কাছে ধৰা পড়বেই। কাজেই
গোবিন্দচন্দ্ৰেৰ কবিতাৰ উপযুক্ত সমাদৰেৰ কোঁনদিন অভাব হ’বেনা।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ কবিতাৰ চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে পুঠিত)

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ববীন্দ্র-পববর্তী বাংলা কাব্যক্ষেত্র প্রাক্-ববীন্দ্র কাব্যক্ষেত্র থেকে বহু দূরবর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ নেই। অথচ একথাও ঠিক যে আধুনিক বাংলা কাব্য স্বয়ম্ভু নয়, অমূলতরু নয়। পূর্বেকার কাব্যঐতিহ্য মেনে নিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হয়। ববীন্দ্রকল্পনাব গভীরতা ও বিস্তার, ববীন্দ্রমননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও সর্বগামিত্ব, ববীন্দ্রশিল্পের অনবদ্য চাকতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরী একালের কাব্যসাধনাব অবশ্য স্বীকার্য প্রেক্ষাপট। কিন্তু ববীন্দ্রসবণি বাংলা গীতিকাব্যের একমাত্র পথ ছিল না। গত শতকে আব বর্তমান শতকের সব গীতিকবিই ববীন্দ্র-প্রদক্ষিণেই কাব্যসাধনাব সার্থকতা মেনেছিলেন এমন নয়। গত শতকে গোবিন্দচন্দ্র দাস আব বর্তমান শতকে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল বায়, প্রমথ চৌধুরী ববীন্দ্রসবণি পবিত্যাগ কবে অন্য পথে যেতে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস অন্য পথের কবি। তিনি নাগবিক কবি নন, ববীন্দ্রশিল্পলোকের কবি নন, বোমাণ্টিক সৌন্দর্যের কবি নন। তিনি গ্রামের কবি, স্বভাবের কবি, অসংযত প্রসাধনহীন ইন্দ্রিয়ান্বিত প্রেমের কবি।

কঠোর দাবিদ্র্য, যন্ত্রণাকর ব্যাধি, শোকের আঘাত, জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন, জমিদারের শত্রুতা, প্রাণহানির আশংকা : এসবেই তাঁর জীবন পূর্ণ ছিল। সে কারণে তাঁর পক্ষে নিশ্চিত হয়ে কাব্যসাধনা কবা সম্ভব হয় নি। তিনি যা লিখেছেন তাতেই বাইবেব জগতের এইসব ঘটনাব ছায়া পড়েছে। গোবিন্দদাস কেবল প্রেমের কবি নন, তাৎক্ষণিক উপলব্ধির কবি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি বিষয় তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়। বাল্যপ্রেম, পত্নীপ্রেম, জন্মভূমিপ্রেম তাঁর কবিসত্তাকে বাববার আলোড়িত করেছে। ‘প্রেম ও ফুল’ (১৮৮৮), কুসুম (১৮৯২), কল্পবী (১৮৯৬) কাব্যের কবিতাগুলো প্রতিক্ষিত হয়েছ কবিচিত্তের অসংযত সাবল্য, দুর্মব হৃদয়াবেগ, নাবীব প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ।

গত শতকের বাঙালি কবিদের প্রেমকবিতায় অল্লাধিক পবিমাণে ইংবেজী প্রেমকবিতার প্রভাব মুদ্রিত হয়েছ। ইন্দ্রিয়ান্বিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক ইংবেজী প্রভাবমুক্ত বাংলা কাব্যে ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর প্রেমকবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপস্থিত। সেই জন্য রূপকর্মের প্রতি অমনোযোগ, শব্দায়নে শৈথিল্য। আবেগের অসংযত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা অনায়াসলক্ষণীয়। তথাপি ইন্দ্রিয় ও আবেগের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের স্বাভাবিক অধিকার ছিল, যাব ফলে তিনি সফল ইন্দ্রিয়ান্বিত প্রেমকবিতা রচনা কবতে পেবেছিলেন।

আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মানবিক আবেগ আর বলিষ্ঠ দেহানুগত্য গোবিন্দদাসের প্রেমকবিতার দুটি প্রধান লক্ষণ। দেহ মনেব আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশে সংকোচহীন কবি বলতে পেরেছিলেন :

আমি তাবে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,

অমৃত সকলি তাব—মিলন বিবহ।

বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,

দেহছাড়া প্রেমকথা,

কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। দেহাত্মীয় হয়েও এইসব কবিতা দেহসর্বস্ব নয়; তাব প্রমাণ :

আমি তাবে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ

আজো তাঁর ভস্ম ছাই, বুকে মেখে চুমা খাই

আজো সে গায়েব গন্ধ বহে গন্ধবহ।

আনন্দ উল্লাসে ছুলি আজো তাব চুলগুলি

গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিবহ।

এইভাবে কবি দেহকে আশ্রয় কবেই এক নববসেব চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

‘প্রেম ও ফুল’ (১৮৮৮) আর ‘কুঙ্কুম’ (১৮৯২) কাব্যের প্রেমকবিতায় যে অনবধানতা ও অপরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তা পববর্তী ‘কমলবী’ (১৮৯৬) ও ‘চন্দন’ (১৮৯৬) কাব্যে নেই। ‘বমণীব মন’ (প্রেম ও ফুল) কবিতায় কবি নারীমনের বহুস্ত উদ্ঘাটনে প্রয়াসী :

বমণীব মন,

কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা,

কি যে-ইন্দ্রধনু ঢাকা,

কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ আবরণ,

কি যে সে মোহিনী মন্ত্র বহেছে গোপন !

কি যে সে অক্ষর দুটি

নীল নেত্রে আছে ফুটি,

ত্রিভুবনে কাব সাধ্য কবে অধ্যয়ন ?

বাল্যসখীর প্রতি কবির মোহ কয়েকটি কবিতার উৎস। ‘পবনাবী’ (কুঙ্কুম) কবিতায় এই বাল্যপ্রেমেব পববর্তী মূল্যায়নে প্রকাশিত হয়েছে কবিস্বদয়ের অন্তর্জালা আর অসহায়তা :

আজ, সে যে পবনাবী !

কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,

সে নবলাবণ্য আভা—সুষমা তাহাবি ?

কেন নিতি নিতি আসি, দেখায় তাহাবি হাসি

হৃদয়সমুদ্রে সে কি সামালিতে পাবি ?

সে যে পবনাবী...

সে যে পবনাবী !

তাবি আলিঙ্গন দিয়া, ধবিও না জড়াইয়া,
 যদিও—যদিও ‘কুসু’ আছিল আমাবি,
 ছুঁযো না লতিকা কেহ, আমাব এ’পাপ-দেহ
 জনমেব মত আজ দৌহে ছাড়াছাড়ি ।
 সে যে পবনাবী ।

এপবপক্ষে, ‘সাবদা ও প্রেমদা’ (কস্তুরী) কবিতাটি পবিত্র পত্নী-প্রেমেব উপব স্থাপিত ।
 । স্ত্রী গত হলে কবি দ্বিতীয়বার দাবপবিগ্রহ কবেন । প্রথমা সাবদা ও দ্বিতীয়া
 গাব আকর্ষণ-বিকর্ষণে কবিচিত্তেব যে দ্বন্দ্ব তা এখানে নিপুণভাবে কপাযিত :

সাবদা পশ্চিমে ডুবে প্রেমদা উঠিছে পূবে
 জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া
 অপূর্ব সুন্দরী উষা অপূর্ব সন্ধ্যাব ভূষা
 পৃথিবীৰ দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া ।

চন্দ্র কবি দুই পত্নীৰ এই দ্বন্দ্ব শেষ বক্ষা কবিত্তে পাবেন নি :

কিবা ঘুম কিবা জাগা, তুজনে পিছনে লাগা,
 পাবি না তিষ্ঠিতে বড, পড়েছি ফাঁপবে
 একটু নাহিক স্বস্তি, জালায়ে ফেলিল অস্থি,
 হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া কবে ?

এই সব কবিতায় উপলক্ষ্যেব ছাপ বয়ে গেছে, তা উত্তীর্ণ হবাব শিল্পসামর্থ্য কবির
 ল না ।

চন্দন আব কস্তুরী কাব্যেব অন্যান্য প্রেমকবিতায় পুরুষচিত্তেব উপব নাবীৰ প্রবল
 কাব কবি কখনো পূর্ণ আত্মনিবেদন, কখনো বা প্রবল অস্বীকৃতিব মধ্য দিয়ে স্বীকাব
 নিযেছেন । এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতিব বিচিত্র টানা পোডেনেব মধ্য দিয়ে কবি
 যান্ত্রিত প্রেমবই জয় ঘোষণা কবেছেন । ‘দিনান্তে’ (কস্তুরী) কবিতায় কবির
 কল প্রার্থনা :

দিনান্তে দেখিতে দিও চাক চন্দ্রানন,
 ভবিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণমন !
 আবো যে বাসনা আছে,
 বলিব আসিলে কাছে,
 কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
 না, না, না, ও তীক্ষ্ণধাব,
 বৃকে ঢাকা তববাব
 পাবি না যে না বলিয়া কেটে যায় মন ।
 প্রাণেব লুকানো কথা—‘একটি চুষন’ ।

ন্যদিকে ‘শক্ৰ’ (চন্দন) কবিতায় নাবীৰ প্রতি কবির অভিযোগ ও প্রবল অস্বীকৃতি
 । :

পুরুষেব তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবাব
 অমৃত মরণে কবে যাতনা উদ্ধাব ।
 নাবী কবে গুপ্তহত্যা আঁখিব আঘাতে,
 অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে ।
 জীবনেব দিন দণ্ড পল অনুপল,
 মবণ মবণ মম মবণ কেবল,
 মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পাবি,
 বমণী আমাব শত্রু, আমি শত্রু তাবি ।

বাহ্যত অস্বীকৃতি ও বিবোধাতাসেব মধ্য দিয়ে নাবীপ্রেমেব কাছে আত্মনিবেদনেব
 বিশেষ ভঙ্গিমা গোবিন্দচন্দ্র দাসেব ইন্দ্রিয়ান্বিত প্রেমকবিতাকে একটি স্বাতন্ত্র্য
 করেছে ।

গোবিন্দদাস ছিলেন প্রবল অভিমানী কবি । সংসারেব হাতে তাঁকে এতো অ-
 লাঞ্ছনা সহ্য কবতে হয়েছিল যে অভিমানে তাঁব হৃদয় ভবে উঠেছিল । কবিব.সে আ-
 কাব্যসাধনাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল । ১৮৮৮তে বচিত ‘কোথায় যাই’ কবি-
 (প্রেম ও ফুল) তা ব্যক্ত হয়েছে :

আব ত পারি না আমি নিতে !
 করুণাব মমতাব, এ বোঝা—এত ভাব,
 আব আমি পাবি না বহিতে ।
 এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ
 আব না কুলায় শকতিতে ।
 হৃদয় গিয়েছে ভবে নয়ন উছলে পড়ে
 ধবে না ধবে না অঞ্জলিতে,
 ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
 অলস অবশ সঁতাবিতে ।

কবি-জীবনে প্রিয়া-বিচ্ছেদে যে শূন্যতা তা নূতন কবে—করুণা মমতায় ভবে
 কবি-হৃদয়েব আত্মক্লেশন থামে নি :

আমাবে দিও না কেহ, আব এ মমতা স্নেহ,
 আব অশ্রু পাবি না মুছিতে !
 এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
 যে না পায়, পাবে না বুঝিতে ।

কবিব এই প্রবল অভিমান তাঁব জীবন-সাযাছে ১৯১১ সালে নূতন কা-
 হয়েছে ‘আমাব চিতায় দিবে মঠ’ কবিতায়—

ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে
 তোমবা আমাব চিতায় দিবে মঠ !

গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ আমাদের কাছে দূর্বতব দ্বীপ; তবু সেই প্রবল আ-
 কবির প্রতি থাকুক আমাদের শ্রদ্ধা-আব সমবেদনা ॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত)

পৰিষৎ সংবাদ

১৩৮০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ চিত্ৰশালায় বঙ্গৰ তিনজন মনীষী ও কবিৰ চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠা যথাযোগ্য মৰ্যাদা ও সমাবোহ সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮ই অগ্ৰহাষণ ১৩৮০ আচাৰ্য্য শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়েৰ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি অতুলপ্ৰসাদ সেনেৰ চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হয়। আচাৰ্য্য ৰমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ, কবি-চট্টোকাৰ-কথাসিল্পী 'বনফুল' ও শ্ৰীৰাজেশ্বৰ মিত্ৰ অতুলপ্ৰসাদ সঙ্ক্ৰে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্ৰীৰাজেশ্বৰ মিত্ৰ সঙ্গীত সহযোগে তাঁহাৰ বক্তৃতায় অতুলপ্ৰসাদেৰ গানেৰ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰেন। শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ পৰিষদেৰ প্ৰথম যুগে চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিকল্পনাৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ দেন এবং সাধাৰণ ব্ৰাহ্মসমাজেৰ কৰ্তৃপক্ষ অতুলপ্ৰসাদেৰ চিত্ৰখানি পৰিষদ্‌মন্দিৰে তাঁহাৰ দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰেন। পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰেৰ লোকবঞ্জন খা অতুলপ্ৰসাদেৰ অনেকগুলি গান পৰিবেশন কৰেন। সভাপতি আচাৰ্য্য সুনীতিকুমাৰ অতুলপ্ৰসাদ সঙ্ক্ৰে তথ্যপূৰ্ণ মনোহৰ স্মৃতিচাৰণ কৰেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ পৰিষদ্‌ মন্দিৰে বসন্তবঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভেৰ চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠা উৎসব হয়। বসন্তবঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভেৰ যে সকল ফোটোগ্ৰাফ শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ সংগ্ৰহ কৰি আনিয়াছেন সেগুলিৰ মধ্য হইতে পৰিষদেৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যগণ কৰ্তৃক নিৰ্বাচিত কথানি ফোটোগ্ৰাফ হইতে তাঁহাৰ একখানি বড় ছবি প্ৰস্তুত কৰাইয়া পৰিষদ্‌ মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এতদ্ব্যতীত, প্ৰখ্যাত শিল্পী যামিনী বায়-অঙ্কিত অগ্ৰজ বসন্তবঞ্জনেৰ একখানি পুৰাতন তৈলচিত্ৰ শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ অনুষ্ঠানেৰ পূৰ্বে সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিয়া ঐ তৈলচিত্ৰখানি বসন্তবঞ্জনেৰ অন্যান্য ফোটোগ্ৰাফেৰ সহিত সভায় প্ৰদৰ্শিত হয়। বসন্তবঞ্জনেৰ বিভিন্ন বচনাৰ পাণ্ডুলিপি, তাঁহাৰ স্বহস্তলিখিত কডচা, তাঁহাৰ বহু চিঠিপত্ৰ, তাঁহাৰ স্বহস্তে সংশোধিত 'শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে'ৰ প্ৰথম চাবটি সংস্কৰণেৰ পাঠেৰ ও টীকাটিপ্পনীৰ স্মিণ', তাঁহাৰ সংগৃহীত বহু প্ৰাচীন পুথি, তাঁহাৰ ব্যবহৃত দ্ৰব্যাদি—তাঁহাৰ চশমা, দোষাত বস্ত্ৰ, বুকস্ট্যাণ্ড, কাগজকাটা ছুৰি, জলপানেৰ ঘটি, পান ছেঁচিবাৰ হামানদিস্তা, তাঁহাকে দত্ত মানপত্ৰ ইত্যাদি, বালক বসন্তবঞ্জনেৰ শিক্ষা সম্বন্ধে বসন্তবঞ্জনেৰ পিতা ও পিতৃব্যেৰ লিখিত কয়েকখানি পত্ৰ, বসন্তবঞ্জনেৰ স্ত্ৰীৰ পত্ৰ ও স্ত্ৰীকে লিখিত বসন্তবঞ্জনেৰ পত্ৰ, তাঁহাৰ ইন্টাৰল পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড, ক্যান্সেল মেডিক্যাল স্কুলে তাঁহাৰ ভৰ্তি ও মাহিনাৰ বসিদ্‌ গ্যাদি যেগুলি শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ তাঁহাৰ জীবনীৰচনাৰ উপকৰণ সংগ্ৰহকালে বিভিন্ন স্থান হইতে আহৰণ কৰিয়াছেন সেগুলি সপ্তাহব্যাপী প্ৰদৰ্শনীতে সকলেৰ কোতূহল সৃষ্টি ও আকৰ্ষণ কৰে। আচাৰ্য্য শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্ৰীসুকুমাৰ সেন সভায় বসন্তবঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা কৰেন। বসন্তবঞ্জনেৰ জীবন ও শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন সম্বন্ধে যে বস্তু নুতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ সভায় সেগুলিৰ বিবৰণ দেন।

এই উপলক্ষে পৰিষৎ সভাপতি আচাৰ্য্য শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় বহু অজ্ঞাতপূৰ্ব নতন তথ্য-সম্বলিত, শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ-সম্পাদিত “শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন” নবম সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্ৰ হইতে অনুষ্ঠানৰ বিবৰণী প্ৰচাৰিত হয়।

এই সভায় বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ কতকগুলি পুৰাতন কাগজপত্ৰ ও পাণ্ডুলিপি বাবে সুন্দৰেব প্ৰদোহিত্ৰ শ্ৰীঅমিতাভ বায় ও শ্ৰীসমিতাভ বায় পৰিষদে দান কৰেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ আৰু একোটি সভায় ঐতিহাসিক বমাপ্ৰসাদ চন্দেৰ চিত্ৰপ্ৰদৰ্শন হয়। তাঁহাৰ পুত্ৰ বৰজিৎপ্ৰসাদ চন্দ এই চিত্ৰখানি পৰিষদে উপহাৰ দেন। এই উপলক্ষে বমাপ্ৰসাদেৰ চিঠিপত্ৰ, তাঁহাৰ বিভিন্ন বচনাৰ পাণ্ডুলিপি, গ্ৰন্থ ও প্ৰবন্ধাবলীৰ একত্ৰ সপ্তাহব্যাপী প্ৰদৰ্শনী আয়োজিত হয়। প্ৰখ্যাত ঐতিহাসিক শ্ৰীদীনেশচন্দ্ৰ সৰকাৰ ‘প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিদ্যুৎ বমাপ্ৰসাদ চন্দ’ ও ‘পালবংশীয় বাজগণেৰ ধৰ্মমত’ বিষয়ে দুইটি প্ৰবন্ধ পাঠ কৰেন। বমাপ্ৰসাদেৰ অন্তৰঙ্গ সুহৃৎ বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ পুত্ৰ শ্ৰীঅদ্বীশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্ৰত্নতাত্ত্বিক বমাপ্ৰসাদ চন্দ’ প্ৰবন্ধ পাঠ কৰেন। আচাৰ্য্য সুনীতিকুমাৰ ‘বমাপ্ৰসাদ চন্দ’ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আচাৰ্য্য বমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ অসুস্থ হইয়া পড়ায় সভা যোগদান কৰিতে না পাৰায় ‘ঐতিহাসিক বমাপ্ৰসাদ চন্দ’ নামক একোটি নিবন্ধ প্ৰকাশ কৰিয়া প্ৰেৰণ কৰেন। সব কয়টি নিবন্ধই পৰিষৎ-পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে।

১৩৮০ বঙ্গাব্দেৰ ১লা মাঘ পৰিষদেৰ চিত্ৰশালায় বন্ধিত বাজা বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰেৰ পোষাক-পৰিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্ৰব্যাদি, তাঁহাৰ ডায়েৰী, তাঁহাৰ বচিত প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থাবলী, তাঁহাৰ সংগৃহীত প্ৰাচীন মুদ্ৰাদিৰ সপ্তাহব্যাপী একোটি প্ৰদৰ্শনী বাজেন্দ্ৰলালেৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণী উপলক্ষে আচাৰ্য্য শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন কৰেন। এই সমুদায় দ্ৰব্যাদি পৰিষদে কিতাবে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰেৰ সহধৰ্মিণী ৰাজলক্ষ্মী ভূবনমোহিনী পৰিষদে এই সমস্ত তুৰ্লভ চিত্ৰসম্বলিত দ্ৰব্যাদি দান কৰিয়া পৰিষদকে কিতাবে ঐশ্বৰ্য্যবান কৰিয়াছেন তাহাৰ ইতিহাস বৰ্ণনা কৰিয়া পৰিষৎ সম্পাদক শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ পৰিষদেৰ পক্ষ হইতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি ও বিডলা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মেৰ উদ্যোগে ৫ই মাঘ ১৩৮০ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ মন্দিৰে বাজেন্দ্ৰলালেৰ স্মৰণসভায় অধ্যাপক শ্ৰীসুকুমাৰ সেন “ভাষা ও সাহিত্যে বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰেৰ দান” বিষয়ে একোটি সুচিন্তিত প্ৰবন্ধ পাঠ কৰেন। সভায় এসিয়াটিক সোসাইটিৰ সভাপতি শ্ৰীবি. মিত্ৰ, শ্ৰীশিশিৰকুমাৰ মিত্ৰ, শ্ৰীদিলীপকুমাৰ মিত্ৰ ও শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ ভাষণ দেন। সভাপতি আচাৰ্য্য শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় বাজেন্দ্ৰলালেৰ বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও মনীষা সম্বন্ধে সভাপতিৰ ভাষণে আলোচনা কৰেন।

৫ই ফাল্গুন ১৩৮০ পৰিষৎ মন্দিৰে বিজ্ঞানচাৰ্য্য সত্যেন্দ্ৰনাথ বসুৰ স্মৃতি-তৰ্পণ সভা

— অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালাৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ—সৰ্বশ্ৰী পৰিমল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্ৰলাল ভট্টাচাৰ্য্য

সুন্দর দত্ত, মৃণালকুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্ত বসু, সমবেদ্য নাথ ঘোষাল—বিজ্ঞানসাধক
সত্যেন্দ্রনাথ ও মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। শ্রীবমেশচন্দ্র ঘোষ
সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করেন। সাহিত্য পবিষদের সহিত
সত্যেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ও অনুবাদের কথা নিবেদন করিয়া পবিষৎ সম্পাদক
নমোহন কুমার পবিষদের পক্ষ হইতে পবিষদের বিশিষ্ট সদস্য, পবিষদের বিজ্ঞান
সম্মেলন সভাপতি, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানসাধনার অগ্রদূত সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-
সংকেত অর্পণ করেন। সভাপতি অচার্য্য সুনীতিকুমার তাঁহার ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র-
জীবন, শিক্ষকজীবন, গবেষকজীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অগ্নিযুগের স্বাধীনতা-
গবেষকের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের যোগ এবং তাঁহার উভয়ের অন্তর্বহন প্রীতিসম্পর্ক
বর্ণনা করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়।
চলিছে চৈত্র ১৩৮০ বনফুলের সভাপতিত্বে পবিষৎ মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ফেডাবেল
কনসাল্টেবল অফ জার্মানীর কনসাল জেনারেল মাননীয় হাল ফের্ডিনান্দ লিন্সেব ২৩০ খানি
প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্ম পবিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন
তাঁহাতে অর্পণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বঞ্চিত ২৩০ খানি দুর্লভ মূল্যবান
প্রাচীন কালগ্রাস হইতে বক্ষা কবিবাব ও ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের হাতে তুলিয়া দেওয়ার
প্রয়োজনীয় প্রস্তুত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের বর্তমান
কালব্যয়সাধ্য কার্য্য করা সম্ভব না হওয়ায় ডাচ এসোসিয়েশন
Dutch Association Of Pure Research (ZWO), ডাচ
গবেষণা বোর্ড (Deutsche Forschungsgemein-
schaft) ও বিশ্ববিদ্যালয় (University of Utrecht,
Netherlands) সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন। নেদারল্যান্ডের
ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর পি.
জি. চেম্পারথি (Dr. G. Chemparathi) এই সব
মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করায় পবিষৎ হ্যাণ্ড ও
ক্যাফ্‌কের নিকট চিবঞ্চনী। পবিষদের
সমস্ত বিবরণ সভায় বর্ণনা করিয়া তাঁহারে
করেন। 'বনফুল' সংস্কৃত ভাষা ও
প্রাচীন ও জার্মানীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের ও
সম্প্রদায় জ্ঞান। কনসাল জেনারেল
ও জার্মানীর মধ্যে অতীতকাল হইতে

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস ও পারস্পরিক সহযোগিতা বর্ণনা কবিতা বলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত সুপ্রাচীন সাবস্ক্রিপ্ট মন্দিরে আসিয়া, তিনি আজ আনন্দ পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীকালীকঙ্কব সেনগুপ্ত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে কনসাল জেনারেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে কনসাল জেনারেল পরিষদের চিত্র ও পুথিশালা পরিদর্শন কবিতা বাঙ্গালাব প্রাচীন ভাস্কর্য ও শিল্পকলাব নিদর্শন, বাঙ্গালী মনীষীদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি আগ্রহসহকারে দেখেন। বাঙ্গালা, ফারসী ও তিব্বতী পুথি কিভাবে পরিষদের পুথিশালায় বক্ষিত হইতেছে দেখিয়া সম্পাদকের নিকট হইতে একখানি পুস্তান বাঙ্গালা পুথি চাহিয়া লইয়া উহাব কিয় পাঠ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দুস্তানী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সভাস্থল ত্যাগ পূর্বে তিনি পরিষৎ সম্পাদকের নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুথিখানি দেখিবার প্রকাশ করেন। পরিষদে বক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুথি, তাহাব আলোক বসন্তবঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণ এবং আচার্য্য সুনীতিকুমারের ভূমিকা সম্বলিত শ্রীমদনমোহন কুমার-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের গ্রন্থ কনসাল জেনারেল বিশেষ আনন্দ প্রদর্শন করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়।

২২শে চৈত্র ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের দেবী চৌধুরাণী ও হেমলতা ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব বন্দোপাধ্যায়ের প্রেবিত 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী' প্রবন্ধ শ্রীসমীবেন্দ্রনাথ সিংহ বায় পাঠ করেন। শ্রীমতী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় বিশ্বাস ভাষণ দেন।

৩০শে চৈত্র ১৩৮০ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মধুসূদন দত্তের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রবন্ধ, শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "কালীমধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা" প্রবন্ধ পাঠ করেন। মধুসূদনের দুইখানি প্রাচীন চিত্রের ইতিহাস তথ্য পরিবেশন করেন। তন্মধ্যে একখানি সংগৃহীত অর্থে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অঙ্কিত। এই চিত্রখানি ব্যাবিস্টাবেব হাইকোর্টে মধুসূদনের কোনও চিত্র কবিতা আসাব পব কলিকাতা হাইকোর্টে

তিরা অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ("the general bad reputation of Datta" ছিল অন্যতম কাৰণ)। বিচাৰপতি শঙ্কুনাথ পণ্ডিতৰ সহায়তায় এবং বিচাৰ, দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, যতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুৰ, ৰাজা কালীকৃষ্ণ, বাৰ্জেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, ঠাকুৰ, দ্বাৰকা নাথ মিত্ৰ, প্যাৰীচাঁদ মিত্ৰ, বাৰ্জেন্দ্ৰ মল্লিক, দেবেন্দ্ৰ মল্লিক, বৰ্জাধিকাৰী, বাৰ্জকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৰ্মানাথ ঠাকুৰ প্রমুখৰ প্রশংসাপত্ৰ (eulogistic Certificate) দাখিল কৰিয়া মধুসূদন কিতাবে শেষ পৰ্য্যন্ত লড়াই কৰি বিচাৰপতি হাইকোৰ্টে প্ৰবেশ কৰেন শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰৰ প্ৰতি হাইকোৰ্টে প্ৰস্তাব হইলে এবং বার এসোসিয়েশনেৰ সম্পাদক শ্ৰীবিদ্যনাথ বৰ্মা সম্পাদকেৰ সহিত হাইকোৰ্টে মধুসূদনেৰ চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ হাইকোৰ্টে সাহিত্য-পৰিষদে বৰ্জিত মধুসূদনেৰ ব্যাবিষ্কাৰবোৰেৰ একমাত্ৰ হাইকোৰ্টে প্ৰতিষ্ঠাৰ যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা কৰেন। বিচাৰপতি প্ৰধান বিচাৰপতি মাননীয় শ্ৰীশঙ্কৰপ্ৰসাদ মিত্ৰেৰ সভাপতিত্বে হাইকোৰ্টে বিচাৰগম্ভীৰ অনুষ্ঠানে, পৰিষদে বৰ্জিত ব্যাবিষ্কাৰেৰ পোষাকে মধুসূদনৰ একখানি নূতন তৈলচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাইয়া কলিকাতাৰ 'বৰ্ণনফুল' ও শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰেন, শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰ হাইকোৰ্টে বৰ্জিত ইতিহাস ঐ অনুষ্ঠানে বৰ্ণনা কৰেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্ৰধান বিচাৰপতি হাইকোৰ্টেৰ সভাপতি হৈ আছিল।

১৯৩৫ চনত পুণ্যলোক বমেশচন্দ্ৰ দত্তেৰ, ১৯৫৩ চনত বমেশচন্দ্ৰ দত্ত স্মাৰক ডাক টিকিটৰ প্ৰকাশৰ পৰা পৰ্য্যন্ত ১০ই আশ্বিন ১৩৮০ (২৭শে অক্টোবৰ) তাৰিখে কলিকাতা জি. পি. ও. প্ৰাঙ্গণে বমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰেৰ সভাপতিত্বে একটা অনুষ্ঠানে মজুমদাৰ তাঁহাৰ ভাষণে বমেশচন্দ্ৰেৰ জীৱন আৰু তাঁহাৰ কীৰ্ত্তিৰ কথা আলোচনা কৰি বমেশচন্দ্ৰ-সম্পাদক শ্ৰীমদনমোহন কুমাৰৰ প্ৰতি এবং বেঙ্গল একাডেমি অফ লিট্ৰেচাৰেৰ প্ৰতি ৩ উল্লংঘনে বমেশচন্দ্ৰেৰ দান এবং তাঁহাৰ কৰ্ম্মৰ আলোচনা কৰেন। ভাৰতীয় ডাক ও তাৰিফ বোৰ্ডৰ General of Posts & Telegraphs

India-র) পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদারকে ও শ্রীমদনমোহন কুমার সুদৃশ্য গ্রন্থ ‘বমেশচন্দ্র দত্ত স্মারক টিকিট সংগ্রহ’ (‘Romesh Chunder Commemoration Stamp’) ও ‘প্রসিদ্ধ ব্যক্তি টিকিটমালা’ (‘Personal Stamp Series’) উপহাব দেওয়া হয়। স্মারক টিকিটে মুদ্রিত বমেশচন্দ্রের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিবে বমেশ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত বমেশচন্দ্রের তৈলচিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৮০ বঙ্গাব্দেব তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা নান জন্ম আমবা যথাসময়ে প্রকাশ কবিতো-পারি নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি বিলম্বের জন্ম কার্যনির্বাহক সমিতি বিশেষ চুক্তিত। কাগজের দুর্ভিক্ষ মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-বিভাট ও মুদ্রণ-সঙ্কট এবং প্রকাশনার গুরুত্ব ব্যয় বৃদ্ধি পরিষৎ-পত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশের ন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সর্ব অনুদানের স্থিতিবস্থা ও বারংবার আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও প সবকাবের সহায়তার দ্বি বিষয়ে ঐদাদীনা—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশনার জন্ম আমরা ১৩৭৯ টাকা অনুদান পাইয়াছিলাম। ১৩৮০ ও ১৩৮১ সর্বকাবের কোনও অনুদান এখনও পর্যন্ত আমবা দীর্ঘ রচনা কাগজের অভাবে এবং প্রকাশনা পাবিতেছি না। শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট সহায়তায় আমরা কিছু কাগজ সংগ্রহ সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারিলাম। ১৩ মধ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া পরিষৎ সদস্য, অনুগ্রাহক, বঙ্গভাষাপ্রেমী সর্বকাবের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করি

প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার,
প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬। মুদ্রক—
লিমিটেড, ৮০ আচার্য্য জগদীশ বসু রোড,